অনিয়মই-নিয়ম

সাঈদ-উর-রব

সাঈদ-উর-রব

জন্ম মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার আমতৈল গ্রামে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে কুলাউড়ায়। তারুণ্যেই চলে আসেন ঢাকায়। উচ্চ মাধ্যমিক আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিভাগে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। জাতীয় খেলাধুলায় বিশেষ অবদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলার সর্বোচ্চ পুরস্কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ব্লু' অর্জন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে (সাহিত্য, সাংবাদিকতা, কম্যুনিটি ইত্যাদি) অবদানের জন্য নানা পুরস্কার পেয়েছেন। থামেননি এখানেই। ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে সম্পন্ন করেন বিপিএড। যোগ দেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অফিসার হিসেবে। আশৈশব ক্রীড়া চর্চার দিকে প্রবল ঝোঁক। দিনে দিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন দেশসেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে।

এ্যাথলেটিক্সে অসংখ্য জাতীয় পুরস্কার তার ঝুলিতে। শটপুট আর ডিসকাস থ্রো'তে শুধু রেকর্ড করেই ক্ষান্ত হননি। নিজেই নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন আটবার। সফল কুস্তিগীর হিসেবেও জাতীয় পর্যায়ে দুবার হেভীওয়েট ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হন। দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন অনেকবার। আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক্স ও কুস্তি প্রতিযোগিতা থেকে ছিনিয়ে আনেন পদক। এরপর দেশের সীমানা ছাড়িয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং জীবন ও জীবিকার তাগিদে পাড়ি জমান আমেরিকায়। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ফিটনেস ম্যানেজমেন্টের উপর পড়াশোনা করেন। ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে দেশে-বিদেশে খেলাধুলার উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছেন। এখন স্থায়ীভাবে থাকেন নিউইয়র্কে। পেশায় সাংবাদিক। ঠিকানার প্রেসিডেন্ট/সিওও। লেখা লেখির পাশাপাশি ছবি তোলা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অটোগ্রাফ সংগ্রহ, ঐতিহাসিক স্থান দর্শন আর ঘুরে বেড়ানো তার নেশা।

ISBN # 9847024300027

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনিয়মই-নিয়ম

সাঈদ-উর-রব

UnFair is Fair

Sayeed-ur-Rabb

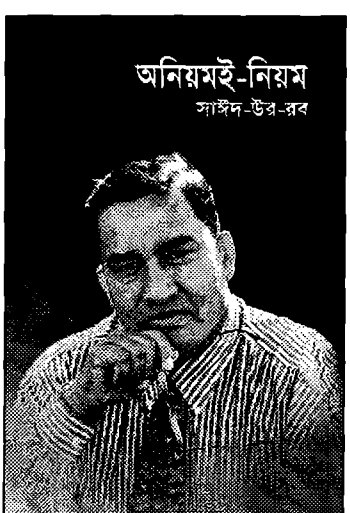

www.pathagar.com

"আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না,
আড়ম্বর করি কাজ করি না
যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না,
যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না।
ভুঁরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি
তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।
আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি,
যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না।
আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি,
অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করি"

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯১৩ সালে বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী)

www.pathagar.com

উৎসর্গ

খালিদ-উর-রব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে বড় ভাই **খালিদ-উর-রব** ও চাচা **আব্দুর রহিম** যে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তারাসহ অন্যান্য সকল মুক্তিযুদ্ধাদের প্রতি অজস্র শ্রদ্ধা ও সম্মান।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- ঠিকানা এলবাম
- জীবন যেখানে যেমন
- সাঈদ-উর-রব এর বক্তৃতা
- ঠিকানা সম্পাদকের এলোমেলো ভাবনা
- মিডিয়ায় সাঈদ-উর-রব
- সফল ব্যক্তিত্ব

Also by Sayeed-ur-Rabb

- Thikana Album.
- Jibon Jekhane Jamon.
- Sayeed-ur-Rabb Speach.
- Thikana Editors Alomalo Vabna.
- Sayeed-ur-Rabb in Media.
- Successful Personalites.

www.pathagar.com

অনিয়মই-নিয়ম ❑ Unfair is Fair

গ্রন্থ স্বত্ব (C)	:	সাঈদ-উর-বর
প্রথম প্রকাশ	:	মে, ২০০৮
প্রকাশক	:	জাবেদ খসরু ঠিকানা গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এন্ড মিডিয়া ৭০/বি গ্রীণরোড, পান্থপথ, ঢাকা।
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	মাঝহারুল আলম কিসলু
মুদ্রন	:	জেনারেশন পিপিএ, বাংলাদেশ
মূল্য	:	বাংলাদেশ ১,০০০ টাকা আমেরিকা-যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ অন্যান্য ইউএসএ ২৫ ডলার

(C) Text copy rights 2008 by Sayeed-ur-Rabb
(All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recordings or any information storage & retrieval system, without permission in writing from the publisher)
Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to the following address : Permission dept, 11-35-45th Ane, LIC, NY 11101, USA.
Ph : 646-3215067.

First Edition	:	May, 2008
Publisher	:	Javed Khasroo Thikana Group of Publications & Midia
Printed	:	Generation PPA, Bangladesh.
Price	:	Bangladesh Taka 1,000 USA, UK, Canada & others USD 25
ISBN	:	984-70243-0002-7

www.pathagar.com

আত্মকথন

চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, পছন্দ-অপছন্দ ও রুচিবোধের বিচারে প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাই নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে গ্রন্থাকারে বাণীবদ্ধ করার পর প্রচলিত নিয়মে অনেকেই গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। তাদের এই সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শ গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনে অর্থবহ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি গ্রন্থকারকে নিত্য-নতুন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকে। প্রচলিত নিয়ম-রীতির প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা রেখেই আমি সীমিত জ্ঞানভান্ডার ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে 'অনিয়মই-নিয়ম" শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। বর্তমান বিশ্বে বা সমাজে যে অনৈতিক কাজ চলছে চারদিকে ক্ষমতার দাপট ও অপব্যবহার তা থেকে সাধারণ মানুষ উত্তরণ চায়। তারই আলোকে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে আমি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছি ও প্রয়োজনে কিছু কিছু পূর্বাভাসও দিয়েছিলেম এবং কমিউনিটির বৃহত্তর স্বার্থে সেগুলো দেশে-বিদেশে ঠিকানাসহ বিভিন্ন জাতীয় ও সাপ্তাহিকীগুলো যথারীতি প্রকাশও করেছিল। তার মধ্য থেকে কয়েকটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। তাই কিছু কিছু প্রবন্ধে স্বাভাবিকভাবেই পুনরাবৃত্তির নিদর্শন মিলবে। মূলত সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাকে ক্ষেত্র বিশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনরাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। এদিকে গ্রন্থ প্রকাশের

Introductory Statement

Considering differences in thinking-sensibility , perception -conception, liking -disliking and taste every individual is different from one another. This is why when a writer write's a book reflecting his own thoughts and perception many people intend to express his opinion about the writer and his writing. Their well-thought opinion and advice not only contributes towards the improvement of the book but also inspires the writer to venture upon writing and publishing new books. Respecting the conventional rules and regulations and with the little knowledge of mine I have dared to write the book entitled " Unfair is Fair". Common people want to see the elimination of immoral activities of the society and the world where people always struggle for power and strive for wrongdoing. In light of that some of the selected writings of mine have been compiled in this book which is a reflection of my personal evaluation and in some cases my prediction of the happenings that takes place in the society and its surroundings. In the greater interest of the community those writings have been published in some of the national dailies and weeklies at home and abroad as well as in Thikana too. For this reason there will be evidence of repetiation in the book. Basically due to time constrain and need I had no alternative but go for repetition. On the other hand the uphill

www.pathagar.com

বিষয়টি আমার নিকট ঝিনুক দিয়ে সাগর সেচার দুরূহ প্রয়াস মনে হলেও কিছু সংখ্যক হিতৈষী ও শুভাকাঙ্খী বিশেষত ঠিকানা পরিবারের সকল সদস্য ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে একাজে অনন্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সাংবাদিক মুহম্মদ সামছুল হক, নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন মিজানুর রহমান ও দিলীপ কে সমদ্দার, এনাম, সেলিম এবং গ্রন্থটির ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিকানা সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান । তাদের অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাহোক, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা পৃথিবীতে ব্যাপক ছন্দ পতন ঘটিয়েছে। এরই জের ধরে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের উছিলায় জাতিসংঘকে পাশ কেটে বুশ প্রশাসন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আফাগানিস্তান ও ইরাকে যথাক্রমে মোল্লা ওমর এবং সাদ্দাম শাসনের অবসান ঘটালেও প্রকারান্তরে সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে বলে বিশ্ববাসীর ধারণা। অকারণে লাখ লাখ প্রাণহানী এবং রাশি রাশি সম্পদ ধ্বংস ও হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা গুঁড়িয়ে দিয়ে বুশ প্রশাসন সন্ত্রাস নির্মূলের স্থলে বিশ্ববাসীকে সন্ত্রাস নামক নাগ-নাগিনীর সাত প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীসহ সারা বিশ্বের জনগণ সর্বদা সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। তাছাড়া সংঘাতমুখর বিশ্ব চরাচরে হ্যাভ এবং হ্যাভ নটের মধ্যকার গগনচুম্বী ব্যবধান, জুরা-ব্যাধির শিকার অনটনক্লিষ্ট কোটি কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে ঐশ্বর্যশালী দেশগুলোর সজ্ঞান উপেক্ষা

task of publishing a book to me is like bailing water from an ocean with a shell had not some well wishers and specially all the members of Thikana came forward to help me out. Personally journalist Muhammed Shamsul haque inspired me and I was assisted in many ways by Mizanur Rahman and Dillip K. Samaddar, Enam, Salim. The introduction/foreword of the book has been written by the editor of Thikana. I am indebted to them and recall with gratitude their contributions.

However, the terrorist attack of 11 September has shattered United States as well as the whole world. In order to eradicate terrorism from the world, Bush administration ignoring United Nations carried out military interventions against Afghanistan and Iraq. Though they became successful in stripping power of Mollaa Omar and Saddam Hussain on the contrary they have globolized terrorism. By killing thousands of innocent people without any reason and destroying properties and demolishing antiquity of ancient civilization, Bush administration has in fact unleashed a reign of terror instead of eradicating terrorism. As a result the peace loving people of the United States and the world are always under threat and live in constant fear. I have tried my level best to stir world's consciousness against unevenness of wealth between have's and have's not, the indifference of the rich countries in saving millions of

www.pathagar.com

এবং এইডসহ মরণব্যাধিতে আক্রান্তদের চিকিৎসা ও সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ক্ষমতা জাহিরের নিমিত্তে অকারণ যুদ্ধে রাশি রাশি অর্থের ব্যয়, নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রের বিপুল মজুদ অক্ষুণ্ন রেখে অন্যের নিরাপত্তার স্বার্থে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথে অযাথিত হস্তক্ষেপ সর্বোপরি জাতিসংঘকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করে পরাশক্তিগুলোর নিজেদের স্বার্থে একে ব্যবহারের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন ইত্যাদি অসঙ্গতিগুলেজাও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তুলে ধরে বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিতে।

বাংলাদেশের পরিবেশ- পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হলেও মূলত প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিক, স্বার্থান্বেষী সামরিক-বেসামরিক আমলাদের খপ্পরে পড়ে বাংলাদেশের অল্পে পরিতুষ্ট সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের বুকভরা আশা নিয়ে একাত্তর সালে সর্বস্তর ও পেশার বাঙালিরা বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ দুর্নীতিপরায়ণ , অদক্ষ ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তিদের কারণে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের যাবতীয় আশা–ভরসা কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিশে গেলো। দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে নেতৃবর্গের ব্যর্থতা, স্বাধীনতার দাবিদার হিসেবে বিশেষ দলের বাড়াবাড়ি, একে অপরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না রাখতে পেরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে ভোগাস একটি সিস্টেম চালু। জাতীয় সরকারের স্থলে দলীয় সরকার গঠন, নেতৃবৃন্দের অতৃপ্ত অর্থলিপ্সা, আত্মীয়করণের মহড়া, সরকারি ভান্ডার লুণ্ঠন, সরকারি বেসরকারি ভূমি

famine and Aids affected people, unwillingness towards spread of education, instead the powerful countries showing their might and spending millions of dollars in arms and wars, while keeping intact their nuclear capabilities are always finding reason to intervene into the nuclear research facilities of other countries, and above all making ineffective the United Nations and when necessary using it for serving their own purposes.

Though, the situation of Bangladesh is different even then the miseries of the common people has worsen due to politics off vengeance and coterie interest of military and civil bureaucracy. To fulfill their basic needs and with full of hope people of all strata of the society went to War of Liberation. But after Independence within no time their all hopes and aspiration despaired in air due to some corrupt,, incompetent and greedy people. The leaders at that time failed utterly in reconstructing the war ravaged economy. One particular party's claim of being the sole agency of achieving independence also brought strife among the people and then on later stage the political parties failing to take each other into confidence paved the way for the introduction of a bogus system of Caretaker government. Formation of partisan government instead of national government, the greed and lust of political leaders, misuse of government treasury, grabbing of government and private

www.pathagar.com

দখলের ঘৃণ্য প্রবণতা ও দেশী-বিদেশী চক্রের ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে দেশবাসীকে ঠেলে দেয় বর্ণনাতীত চরম বিপর্যয়ের মুখে। এরই জের হিসেবে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় জীবনে ঘটে রাহুর পদচারণা, যার ধারাবাহিকতায় সপরিজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, জেলে ৪ জাতীয় নেতা ও চট্টগ্রামে স্বাধীনতার ঘোষককে হত্যা করা হয়। সেনাপ্রধান এরশাদের অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণ ও দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণ এবং পরবর্তীতে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাগ্রহণ ও ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুরারোগ্য ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল অনৈতিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাচারিতা গোটা দেশ ও জাতির বেলায় উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত অগ্নিতে উত্তরণ ঘটিয়েছে।
অবশেষে ১/১১ -এ ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূতদের মুখরোচক সস্তা বুলির আড়ালে ক্ষমতা কুক্ষিগতের অপচেষ্টার স্বরূপ উন্মোচনেও আমার চেষ্টার ইয়ত্তা ছিল না। এ সকল ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না থাকলেও মোটা দাগের কিছু কিছু ঘটনার সুস্পষ্ট আভাষ-ইঙ্গিত পাওয়া যাবে লেখাগুলোতে– এ কথা অনেকটা হলফ করতে পারি।
কাহিনীর বর্ণনায় মুন্সিয়ানার ছোঁয়া এবং সব কিছু সুখপাঠ্য ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি-না তার সার্বিক বিচারের ভার বোদ্ধা পাঠকসমাজের উপর ন্যস্ত করা গেলো। যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামতকে সুস্বাগত জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধান্তে-

সাঈদ-উর-রব
মে, ২০০৮

lands and conspiracy at home and abroad all contributed towards the untold misery of the common people. As a result of this misfortune befall on this nation as a consequence of which we see the brutal killing of the father of the nation along with the most of the member of his family, the murder of four national leaders in Jail and assassination of the procliamer of Independence Shaheed president Zia-ur-Rahman in Chittagong. The illegal assumption of power by army chief Ershad and his subsequent indulgence in corruption, and nepotism created havoc and ruined the economy of the country. All these illegal activities and tyrannical rule took the country from bad to worse. I also tried to unmask the guise of the saviours of 1/11 who with their sweet coated words had the intention of taking absolute power.

Though my writing may lack in-depth analysis of those events even then readers will find some hints and indication of the future happenings if read in a simple and broader sense.

Readers will judge whether I have shown efficiency in writing and in making the writing interesting and readable. I welcome any kind of opinion and suggestions.

Respectably

Sayeed-ur-Rabb
May, 2008

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা সবাই দেখি, বলি এবং অনেকেই লিখি। কিন্তু সবাই সবকিছু দেখি না, সবকিছু বলি না, সবকিছু লিখিও না। সমাজে বাস করি আমরা। অনেক কিছু বিবেচনা করে আমাদের চলতে হয়। আমাদের ভেতর স্বার্থ, লোভ, ভয়, প্রত্যাশা কাজ করে। বলা বা লেখার অক্ষমতার কারণে নয়, ঐ সব সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকে বলেও অনেকে অনেক কিছু দেখেও সব কিছু প্রকাশ করতে চান না। ক্ষমতাবানদের আক্রোশে যেমন অনেকে পড়তে চান না, তেমনি তাদের কৃপা থেকেও বঞ্চিত হতে চান না অনেকে। সাঈদ-উর-রব তাঁর চারপাশে, সমাজ-রাষ্ট্রে এবং বিশ্বের এ কোণে সে কোণে কী ঘটছে তা গভীরভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার এবং লেখার মাধ্যমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে সবার যেমন নিজস্ব একটি স্টাইল থাকে, তাঁরও আছে। তিনি দেখেন এবং নির্ভয়ে সরাসরি বলেন কাউকেই তোয়াক্কা না করে, প্রাপ্তি-বঞ্চনার ধার না ধারে। তিনি যেহেতু সাহিত্য রচনা করেননি, তাই তাঁর অলংকরণের দায়ও নেই। যেখানে অসংগতি, যেখানে অন্যায়-অবিচার, যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলাটাই তিনি তাঁর দায়িত্ব বলে জ্ঞান করেছেন একজন সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে। তিনি যে একজন সাংবাদিক, বস্তুনিষ্ঠতা যে তাঁর পেশার অলঙ্ঘনীয় শর্ত তা তার লেখাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। সত্যকে কঠিন জেনেই তিনি চোখ-কান এবং কলম খোলা রাখেন, সেভাবেই প্রকাশ করেন। অংক কষে কতোটা পাবেন, কতোটা হারাবেন, সেকথা ভেবে তিনি যে চলেন না, মানুষের পক্ষে, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে, বিশ্বমানবতা, সভ্যতা ও শান্তির পক্ষে মুক্তবুদ্ধি ও গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি যে

Foreword

We all see, say and some of us even write. But all can't see everything nor say everything and cannot write everything. As we live in a society we have to take into consideration whatever comes in our way. Interest, greed, fear, and hopes all encompasses a human being. As we have these and other limitations we cannot express everything whatever we see. As nobody intends to call for wrath of the powerful of the society, similarly they don't even want to deprive themselves of their blessings. Mr. Sayeed-ur-Rabb with his inner sight has observed what is happening in the society, states and many parts of the world and accordingly has endeavored to write about them. In doing this like other's Sayeed-ur-Rabb has his own style. He writes without fear whatever he see's and does not aspire for any rewards. As his writing is not a thing of literature, so he cares less about it's ornamentation. Being a conscious citizen of the society he felt as it is his duty to shed some light on wherever there is wrongdoing, illegality and unlawfulness. Being a journalist, whose prime duty is to bring out the whole truth, is very much evident in the writing of Mr. Rabb. Knowing very well that truth is harsh he keeps open his ears, eyes and his pen and writes accordingly. While writing he never thinks of what he will gain or loose. He never compromises while writing in favor of common people, society, world humanity, civilization, world peace, freedom of writing and democracy. His pen is like an open sword which does not suffer from any kind of fear or doubt. As he talks

www.pathagar.com

কতোটা অনাপসী তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর কলম খাপখোলা তরবারীর মতো। ভয় দ্বিধা জড়তায় ভোগে না তাঁর কলম। এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তাঁকে দাঁড়াতে হয় সমাজের গরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে যারা নিয়ত দুর্বৃত্ত কবলিত, রাষ্ট্র কাঠামো এবং সমাজের বিভিন্নস্তরের দুর্বৃত্তজালে যারা আবদ্ধ।
সাঈদ-উর-রব জনগণের কথা ভেবেছেন তাদের দুর্দশা-বঞ্চনার আলোকে, আর শাসকদের আচরণ দেখেছেন তাদের স্খলন অবক্ষয় দুর্নীতি দুঃশাসন অঙ্গীকার বিস্মৃত হওয়া, জনগণকে নিপীড়ণ করা এবং বিদেশীদের পূজা দেয়ার আলোকে। সে কারণেই তিনি হয়তো সাদাকে সরাসরি সাদা এবং কালোকে সরাসরি কালো বলতে পারেন। তিনি সত্যকে পাশ কাটিয়ে আকারে ইংগিতে কিছু বলে ভবিষ্যতে ভিন্নতর ব্যাখ্যার সুযোগ রেখে কিছু অর্জনের প্রত্যাশা করেন না। মানুষের পক্ষে জনাব রবের যেমন দরদ দেখা যায়, তেমনি অমানুষের বিরুদ্ধে যে একটি ক্রোধ এবং বিদ্রোহ আছে তাও ধরা যায় তাঁর বক্তব্যে ও সব লেখাতে। তিনি কষ্ট পান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নভঙ্গের কথা ভেবে এবং করুণা বোধ করেন তাদের প্রতি যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্ন লোপাট করেছেন। ক্ষোভে রাগে ফেটে পড়েন ভন্ড, প্রতারক, মুনাফেকদের বিরুদ্ধে।
জনাব রবের ভাবনা কেবল রাজনীতি জুড়ে তা বলা যাবে না। সবকিছুর মূলে রাজনীতি হলেও রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কম্যুনিটি, খেলার মাঠ-সবকিছু নিয়েই তিনি ভাবেন। যেখানে অন্ধকার দেখেন সেখানেই আলো ফেলেন তিনি। এমনকি তার নিজ পেশা সাংবাদিকতার ভেতরেও তিনি যখন যেখানে কালিমা দেখেছেন, অসংগতি লক্ষ করেছেন, তা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন সাহসের সঙ্গে।

in favor of truthfulness and rightfulness he always takes side with the majority people of the society who are always exploited by the minority people belonging to the upper strata of the society.

Sayeed-ur-Rabb contemplates on the misery and deprivation of the common people, he has seen the behavior of the Ruling class and how their corruption, mismanagement and unlawfulness has brought decadence to the society and the state. The ruling class in one hand exploit's the common people and on the other hand has does whatever possible to please their foreign lords. Being witness to all these it has been possible for him to say white as white and black as black. He never evaded the path of righteousness and not by fabricating stories aspired for any rewards. Mr. Rabb sympathizes with the true human being and wages war against inhuman and corrupt people and this is also reflected in his writing. We find a revolutionary being in Mr. Rabb who pains to see how our dream has been shattered even long after gaining independence. He hates those people who still try to stigmatize our war of liberation and it's image. Becomes outrageous at the hypocrisy and cheating of the war collaborators.

Mr. Rabb is not obsessed with politics only. Though politics is the root of all even then he contemplates on economy, culture,, history, tradition and community. Wherever he sees darkness he sheds light on it. Even in his own profession whenever he come across any kind of irregularities and unfairness he protest them vehe-

www.pathagar.com

এই যে আজকের যুগে বিপরীত স্রোতে চলার শক্তি, তার লেখা থেকে জানা যায়, এই শক্তি তিনি আহরণ করেন গণমানুষের কাছ থেকে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল যে কথা 'জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিভূ'- এ দর্শন তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছেন বলেই এমন শক্তি তিনি অর্জন করেছেন। সাঈদ-উর-রবের প্রাণ কেঁদে ওঠে মানুষের বিপন্নতায়। মহামারি, খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যায় যখন মানুষ মরে, ইরাক-আফগানিস্তান-ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে যখন পুঁজিবাদী বোমায় নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের প্রাণ যায়, তখন তাঁর কলম থেকে মনে হয় কালি ঝরে না, রক্ত ঝরে। এক সময় আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশকে দেখেছি ভিন্নরূপে। এখন চেহারা পাল্টেছে। পরাশক্তির যেমন, তেমনি পাল্টেছে তাদের একালের উপনিবেশ এবং উপনিবেশ রক্ষার বরকান্দাজদেরও। চেহারা ভদ্রস্ত হয়েছে। গণতন্ত্রের শতনামও উচ্চারিত হয় তাদের মুখে। কিন্তু ভেতরের রূপ আরো নির্মম, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর, হৃদয়হীন হয়েছে। এখন বাজার দখল সরাসরি হয় না, হয় বিশ্বায়নের কাঠামোয় মিত্রতার ফ্রেমে। তাই আগের মতো তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাটা বিশেষ করে বিশ্বায়নের যাঁতাকলে যারা পিষ্ট তাদের একাট্টা করে নামানোটা কঠিন হয়ে পড়েছে। মাইক্রো, ম্যাক্রো, ক্রেডিট রাইট, সোস্যাল বিজনেসের নামে এমন মোহ তৈরি করা হয় যে শোষিতরা তাদের এই আধুনিক বিশ্বপল্লীর পোষাকে ভয়ংকর শত্রুদের অনেক সময় চিনতেই পারেন না। অনেকে এমন বিভ্রান্ত হন যে, বুঝি মিত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে। সাঈদ-উর-রবের মধ্যে এই বিভ্রান্তি এবং মোহ লক্ষ করা যায় না। যার আড়ালেই সমাজ এবং গণশত্রুরা তাদের চেহারা লুকিয়ে রাখুক, সাঈদ-উর রব তাদের ঠিকই চিনতে পারেন। তাই

mently. In today's world the energy in him of treading against the opposite wave has been imbued in him by the belief and faith he has on the common people. He beliefs in his heart the popular ethic of political science which says "People are the sovereign power of the nation". His heart pains to see the distress of the people. When people die due to natural calamities such as famine or flood or when innocent people of Afghanistan and Palestine become the victims of the capitalist bomb attack in such situation his pen seems to shred blood not ink.

Once we saw the imperialist power and their tactics of colonization. Now this has changed. Changes have also occurred in the tactics of superpower and in their making of colony. Democracy has also changed. Democracy is merely a term now because in the name of democracy corruption,exploitation, and terrorism takes place randomly. Now the capitalist monopolize the market in the name of globolization. It has become enormous task for the victim of the globolization to stand for their own right. They are being exploited by new terms as micro, macro credit system and always intend to fall prey to this vicious cycle. It is hard for them to discern who are their friend and who are their foe. But nothing has derailed Mr. Sayeed-ur-Rabb from bringing out the whole truth in whatever shape or guise they may try to deceive. He through his writing can make it possible for the common people to differentiate between the right and wrong. Many people say that talking against the corporate world of 21st century is kind of fool-

www.pathagar.com

তাদের চেনাতেও পারেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। অনেকেই মনে করেন, একবিংশ শতাব্দীর এ যুগে কর্পোরেট দুনিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলাটা বোকামী। সাঈদ-উর- রবকে বিনা দ্বিধায় এ বোকামিটা করতে দেখা যায়।

সাঈদ-উর-রব বলেছেন, 'সত্য কথা বলতে গেলে আজকাল দ্বিধা জাগে। এখন সত্য ও আলোরও শত্রু দেখা যায়'। ('১/১১ আশীর্বাদ না অভিশাপ/কোনদিকে যাচ্ছে দেশঃ উত্তরণে না আরো সংকটে')। কিন্তু তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যা বলেছেন সেখানে দ্বিধার কণামাত্রও দেখা যায় না। বরং দেখা যায় আলো ও সত্যের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সামনাসামনি লড়াই। তিনি দু'হাত দিয়ে অন্ধকার সরাতে চান। কম্যুনিটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক, নতুন প্রজন্ম আমাদের ভবিষ্যত আলোকিত করুক, প্রবাসের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কর্মকান্ড প্রবাসীদের প্রত্যাশা পূরণের সহায়ক হোক, সবাই মিলিতভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলার সঠিক নির্দেশনা পাক- এমন একটা কাতরতা যে তাঁকে সব সময় তাড়িত করে, তা অনুভব করা যায়। তাঁর লেখনী অন্ধকারে তীর্যক আলোর কষাঘাত। একেবারে শংকাহীন। জনাব রব তাঁর লেখায় রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা, অরাজনীতিকদের উৎকট উচ্চাভিলাষ ও শক্তি প্রদর্শনের ভয়ংকর অসভ্যতা এবং মানুষের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার ছবি আঁকতে একটুও শংকায় ভোগেননি। শুধু সেখানেই তিনি থামেননি। খুব সরল ও স্বচ্ছভাবে সমাজ সংকট এবং তার মিমাংসার পথ দেখানোর পাশাপাশি এ ভরসার কথাও শুনিয়েছেন যেনো, সংকটেই মানুষ জোট বাঁধতে শেখে। এবং সেই জোটই কেবল পারে মানুষকে, সমাজকে সকল দুঃশাসন, দুঃসময় থেকে মুক্তি দিতে।

আজকের দুনিয়ায় আমাদের সম্মিলিত

ishness. Mr. Rabb commits this foolishness very gladly.

Sayeed-ur-Rabb says that people hesitate to talk about the truth, truth and light confronts enemy today (Is 1/11 a curse or boon, in which way is the country running). But in the writing of Mr. Rabb their is no place for hesitation. Rather he discerns and draws a clear picture between light and darkness, truth and untruth. He wants to remove darkness with his two hands. Through his writing we see the urge in him to build a beautiful community where the next generation will be more enlightened, the activities of the social and cultural organization will fulfill their hopes and aspiration and all will move together towards peace and prosperity.

Mr. Rabb through his writing and without being hesitant has depicted the failure of politicians, greed and ambition of the civil and military administration, unhealthy competition of showing might by the political parties and also clearly draws a picture of the distress people. He did not stop there by showing this picture only rather he has ventured upon showing the right path for the people through which he will find solutions to his problems. He has infused in people to believe in unity and through unity people will overcome all sorts of unfairness, irregularity and wrongdoing.

In today's world what is our collective urge? for us who claim to be in favor of truth, beauty, civilization, peace and democracy our demand today is nothing but a beautiful coun-

www.pathagar.com

প্রার্থনাটা কী? আমরা যারা নিজেদের দাবি করছি সত্য ও সুন্দর, সভ্যতা ও শান্তি এবং গণতন্ত্র ও গণমানুষের পক্ষে, তাদের চাওয়াটা সম্ভবতঃ একটি সুন্দর দেশ, সুন্দর রাজনীতি, বিবেক সম্মত আচরণ। স্বৈরশক্তি, নিপীড়কশক্তি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ চাই। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত চাই। একটি শান্তিময় বিশ্ব চাই। সাঈদ-উর রব সকলের এই প্রার্থনাকে স্পষ্ট করেছেন পক্ষে দাঁড়িয়ে। সকলের দায় নিজের বিবেকের উপর চাপিয়ে কলম ধরেছেন সাহসের সঙ্গে যা আশপাশের আরো অনেকে যারা জড়তা-ভীরুতায় ভুগছেন, তাদের জড় বিবেককে টোকা মেরে জাগাবে এবং ভীরু মনে যোগাবে সাহস।

শুরুতেই কথাটা বলে নেয়া যেতো। তবে শুরুর কথাটাই এখানে বলছি যে, সাঈদ-উর-রবের লেখার বেশির ভাগটাই প্রকাশিত হয়েছে প্রবাস কম্যুনিটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পত্রিকা ঠিকানায়, যেখানে আমি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। একারণে বিশেষ কিছু সুযোগ পেয়েছি যা এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখার সহায়ক হয়েছে। লেখাগুলো পাঠকের হাতে যাওয়ার পূর্বেই গভীর অভিনিবেশে আমাকে পড়তে হয়েছে। প্রমান পেয়েছি তিনি একজন অত্যন্ত আন্তরিক ও পরিশ্রমী লেখক। এটাও সেই সুযোগে লক্ষ করা গেছে যে, একটা লেখাকে পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর এবং যা বলতে চান তা স্পষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি কতোটা সচেতন এবং সাহসী।

এ গ্রন্থ মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা আরো বাড়িয়ে দেবে। সবাই তাঁর কাছ থেকে এমন ভরসা জাগানো, আঁধার তাড়ানো লেখা ভবিষ্যতে আরো প্রত্যাশা করবে সংগত কারণেই।

আমি তাঁর দীর্ঘ লেখক জীবন এবং সাফল্য কামনা করি।

মুহম্মদ ফজলুর রহমান
সম্পাদক, ঠিকানা।
২০ এপ্রিল, ২০০৮।

ty, healthy politics and considerate behavior of the people. We want and demand the downfall of all kinds of tyrannical rule, corruption, terrorism and communalism. We pledge for a better future for our next generation. We want a peaceful world. Mr. Sayeed-ur- Rabb seems to have heard the urge of the common people and has taken the initiative to make it sound louder by writing on this hot topic without any fear or favor and with a view to awaken the consciousness of the people to join him in this noble task.

This could have been said in the beginning, so let me say what was to be said in the beginning. Majority of the writing of Mr. Sayeed-ur-Rabb had been published in 'Thikana' the most reliable and widely circulated news paper of North America, where I discharge my duty as the Editor. Because of this I had the privilege of writing the introduction of the book. Before giving it a final touch and sending it for publication I had a thorough reading of all the writings and I have found Mr. Rabb to be very dedicated and sincere in writing the book. It has been observed that in making his writing complete, meaningful and clear he showed courage and sensibility. This book will make him more responsible towards people. It is natural that all will expect this kind of encouraging and constructive writing from him in the near future.

I wish success of this book and long life of the writer.

Muhammed F. Rahman
Editor, Thikana
20 April, 2008

www.pathagar.com

সূচিপত্র ❑ Contents

❑	আত্মকথন ❑ Introductory statement	vi
❑	ভূমিকা ❑ Foreword	x
❑	কতিপয় স্বার্থপর রাজনীতিবিদের কারণেই ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ	১
❑	কিংবদন্তী ড: ইউনূসকে অভিনন্দন ও দেশবিরোধী ফেরিওয়ালাদের প্রতি নিন্দা	২১
❑	রাজনীতির দুষ্ট বলয় থেকে খেলাধুলাকে মুক্ত করতে হবে	২৯
❑	ইরাক ধ্বংসের দায়িত্ব কে নেবে? দোষীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কি আদৌ সম্ভব?	৩৫
❑	প্রধানমন্ত্রী খালেদ জিয়া সমীপে	৫৩
❑	প্রবাসের সাংবাদিকতার অতীত এবং বর্তমান	৬৩
❑	প্রবাসে সংবাদপত্রের ভবিষ্যত ও আমাদের করণীয়	৭৫
❑	একুশ-বিপণনের নেপথ্যে	৮৭
❑	তোরা যে যাই বলিস ভাই আমার সোনার চেয়ারটি চাই	৯৩
❑	ফোবানা : দিনের আলোর মুখোশ পরা নেতাদের রাতের খেলা	১০৯
❑	ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সমস্যা কি মোড়লদের দাবার গুটি	১২৭
❑	শাসক বদলালেও শোষণ বদলায়নি	১৩৯
❑	কোন দিকে যাচ্ছে দেশ : উত্তরণে না আরো সংকটে	১৪৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংবিধান নয় এখন অনিয়মই নিয়ম

কতিপয় স্বার্থপর রাজনীতিবিদের কারণেই ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে আসলে হচ্ছেটা কী? অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একের পর এক কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নানা কারণে বিশেষ জরুরী অবস্থা ঘোষণায় বাধ্য হয়েছেন। মূলত আওয়ামী লীগসহ আন্দোলনকারী দলসমূহের আত্মঘাতী, ধ্বংসাত্মক এবং নৈরাজ্যকর কর্মসূচি ও বিদেশীদের চাপ রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করেছে এ বিশেষ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পর এটা কোনভাবেই কাংখিত ছিলো না। এই কৃত্রিম সংকট বাংলাদেশের শিশু গণতন্ত্র

www.pathagar.com

ও উন্নয়নের পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক দিনে সৃষ্টি হয়নি বা বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ সৃষ্টি করেনি। কিছু লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু তথাকথিত রাজনীতিবিদের অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং দলীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চার তীব্র অভাবের কারণেই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সিংহভাগের মধ্যে দেশপ্রেমের খুব অভাব। তারা দেশ এবং জনগণ নিয়ে কখনও চিন্তা করেন না– শুধু চিন্তা করেন জনগণকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা যাবে কিংবা কিভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে। তাদের দিন-রাত্রির স্বপ্নে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ কিংবা ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা এবং জনগণের দোহাই দিয়ে নিজে বড় হওয়ার হীনমানসিকতা। অন্যদিকে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে রাজনৈতিক আদর্শচ্যুত কিছু কিছু চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ এবং দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়েছে দেশের গণতন্ত্র। রাজনৈতিক কিছু নেতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করে প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে এক এক করে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এবং জনগণের কাছে বিতর্কিত করে তুলছেন। তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু নিজেদের জীবনাচরণ ও কাজে-কর্মে তা প্রমাণ করেন না। তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এবং নিজেদের পছন্দের দলীয় লোকজনকে বসানোর জন্য কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে দেশ, জাতি, প্রশাসন সর্বোপরি দেশের মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে মহান জাতীয় সংসদ সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেও গরীবের টাকায় সকল-সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেও ব্যক্তিস্বার্থে তারা সংসদে যান না; সংসদকে অকার্যকর করে, রাজপথে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে জিম্মি করে দাবি আদায়ের মধ্যযুগীয় পন্থা অবলম্বন করছেন। তারা মহান জাতীয় সংসদ মানেন না, সংবিধান মানেন না, রাষ্ট্রপতি মানেন না, প্রধান উপদেষ্টা মানেন না, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মানেন না, হাইকোর্ট মানেন না– নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে সব কিছু করার চেষ্টা করেন।

অনেকেই মনে করেন তত্ত্বাধায়ক সরকার সিস্টেম একটি বোগাস সিস্টেম। অনেকেই কথা প্রসঙ্গে বলে থাকেন- একটা ইউনিক সিস্টেম। এমনই ইউনিক যে পৃথিবীর আর কোথাও এই সিস্টেমের অনুশীলন হলো না! তারপরও আমার মনে হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে কাজগুলো এখন করছে সেগুলো আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা জাতীয় সংসদে বসে আগেই করতে পারতেন। এই কাজগুলোর সমাধান আগে করা হলে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ, সময় ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হতো না এবং মানুষকে রাজপথে পশুর মতো প্রাণ দিতে হতো না। একবিংশ শতাব্দীতে এসে

www.pathagar.com

একটি গণতান্ত্রিক এবং সভ্য দেশে। নৃশংসভাবে দিনে দুপুরে পিটিয়ে মানুষ হত্যা এবং মানুষ জিম্মির বিষয়টিকে আমি কোনভাবে সমর্থন করতে পারি না। অবশেষে 'লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠেনা'র মতো- বিদেশের চাপে সেনাবাহিনীর ঠেলা খেয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখন সব কিছু গলাধঃকরণ করছে– তখন মেনে নিতে পারেনি কেন? বর্তমানে রাজনৈতিক দলের নেতা নামধারীদের গলাবাজি বন্ধ হয়েছে। পত্রিকাওয়ালাদের হম্বিতম্বি এবং বাড়াবাড়িও কমেছে। কেনই বা ব্যক্তি বিশেষকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে এবং সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে অসাংবিধানিক পথে অসাংবিধানিক লোক নিয়োগ করতে হবে? প্রতিটি নির্বাচনের সময়ই এই অনভিপ্রেত সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। কিন্তু যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা কখনও সত্যিকার অর্থে বিষয়গুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন না। আবার যারা বিরোধী দলে থাকেন তারাও এগুলোর সমাধানের জন্য দায়িত্ব পালনে সংসদে যান না। তাদের কাজ-কর্মে প্রমাণ মেলে তারা দায়বদ্ধ কোনো ব্যক্তির কাছে– দেশ এবং জনগণের কাছে নয়। তারা কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না। তাদের কাজ কারবার দেখলে মনে হয় তারা নীতি বিবর্জিত এবং আদর্শহীন রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন। দেশ এবং জনগণের কাছে যদি তারা দায়বদ্ধ হতেন তাহলে যে বিষয়গুলো নিয়ে বর্তমানে দেশে বির্তক সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর সমাধান সংসদে করতেন– 'কাইজ্জা, ক্যাচাল বা কেওয়াজ' করতেন না। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা জানেন কোথায় সমস্যা- তারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্যই চিহ্নিত সমস্যাগুলো সবসময় কৌশলে জিইয়ে রাখেন। প্রধান দুটো দলই ক্ষমতায় ছিল কিন্তু কেউই সমস্যাগুলোর সমাধানে আন্তরিক নন–অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ এবং দেশের সম্পদ লুটপাট করার ক্ষেত্রও তারা সব সময় তৈরি করে রাখেন। আর ক্ষমতায় গিয়েই আসল সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বাংলাদেশের গরীব মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে লুটেপুটে খান এবং আত্মীয়- স্বজনকে বিভিন্ন পদে বসানোর চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন। লুটপাটে ব্যস্ত থাকার কারণে দেশ ও দেশের মানুষ নিয়ে তখন চিন্তা করার সময়ইবা তাদের কোথায়! যে জনগণ তাদেরকে বড় করেছে, দায়িত্ব দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছে, নির্বাচিত হওয়ার পর সেই জনগণকে অন্তত পাঁচ বছর তারা ভুলে যান। আবার নির্বাচন আসলে জনগণের শরণাপন্ন হন।

প্রতিবারের মত এবারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে হবেন, নির্বাচন কমিশনের সদস্য কে হবেন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য কারা হবেন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্কের জন্ম নেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে হবেন এই নিয়ে। এই দুটোই হলো সাংবিধানিক পদ। এই দু'জন

www.pathagar.com

ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ীই মনোনীত হয়ে থাকেন- দলীয় বিবেচনায় নয়। সবগুলো পদকে আমরা বিতর্কের ঊর্ধে রাখতে পারিনি। যে জন্য ব্যক্তি আক্রোশে ক্ষত- বিক্ষত হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান, সম্মানিত ব্যক্তিরা ও সাংবিধানিক পদগুলো। সেই সাথে দেশের সম্মানিত ব্যক্তিরাও রাজনৈতিক নেতাদের দলীয় স্বার্থের রোষানলে পড়ে নিজেদের সম্মান দিনে দিনে খোয়াচ্ছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারাও সম্মানিত ব্যক্তিদের 'তুই-তোকারি' করে সম্বোধন করেন। অথচ শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভূয়োদর্শিতায় এই সব ব্যক্তিত্ব তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত রাজনীতিবিদদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। সারাজীবন তারা সম্মানের সাথে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐসব নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা রাতারাতি খারাপ হয়ে যান কিভাবে তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারের লালন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সম্প্রতি কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা দাবিদারের বক্তৃতা শুনে সাধারণ জনগণ মর্মাহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা, আব্দুল জলিল, ওবায়দুল কাদের, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী, কর্নেল অলি আহমদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ, মোহাম্মদ নাসিম তাদের অন্যতম। তাদের কথাবার্তা ও আচরণে মনে হয় না তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো আছে। শিক্ষা থাকলেও সেটা সুশিক্ষা নয়। তারা যখন অন্যের সম্পর্কে মন্তব্য করেন বা কথা বলেন তখন আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখেন না। ঐ সব তথাকথিত রাজনীতিবিদদের আচরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে তারা লোভী ও স্বার্থপর। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হবার পর তার জীবনে আর কিই বা বাকী থাকে। তারা নতুনদেরকে সুযোগ করে দিতে চান না। যারা বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের কাছে এতোদিন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সকল বিতর্কের ঊর্ধে ওঠে বিচারকার্য চালিয়েছেন তাদের এভাবে অসম্মান করা নিশ্চয় গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটি মতামত থাকে। গণতন্ত্রেরও একটি ভাষা আছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে যখনই যে ক্ষমতায় থাকেন তখন তারাই নিজেদের পছন্দের লোকদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষ স্থানীয় প্রশাসনিক পদগুলোতে বসানোর জন্য নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নেন- সে জন্যই এতো বিতর্ক এবং আত্মঘাতী আন্দোলন। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য আমাদের দেশে ক্ষমতায় যাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় সাংবিধানিক পদ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল এবং বিতর্কিত করে চলেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে একমাত্র পদলোভী ছাড়া আর কোনো সম্মানিত ব্যক্তি এই পদগুলোতে আসতে চাইবেন না। এছাড়াও যে জিনিসটি দেখা যাচ্ছে তা হলো যারা সরকারি চাকরি করেন তারা মনে হয় রাজনীতি করতে পারবেন না। অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের

www.pathagar.com

সমর্থন থাকতে পারবে না। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যেভাবে অপদস্থ করা হচ্ছে বা রাজনৈতিক লেবাস পরানোর চেষ্টা চলছে, তাতে প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো তো নষ্ট হবেই, অন্যদিকে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম দেবে। যদি প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মকর্তা নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে থাকেন, তাহলে তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। গণতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্রের সবক দিয়ে বেড়ান, সর্বপ্রথম তাদের আচরণে, কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটা উচিত।

একটি মিথ্যা কথাকে বারবার বলার পর এক সময় তা সত্যরূপে পরিণত হয় যা সম্প্রতি বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়। নিজের পেটের ফিকির না করে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার কি করেন এটা নিয়ে জনগণের ভাবনা বেশি। দেশের সব লোক সংবিধান বোঝেন, রাজনীতি বোঝেন, অর্থাৎ যার যেটা কাজ নয়, সেটা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বেশি মাথা ঘামান। অধিকাংশ জনগণ ন্যায়-অন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পার্থক্য বোঝে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। জনগণের মধ্যে হুজুগে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে রাজনীতিবিদরা জনগণের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে প্রতারিত করছে। জনগণ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা- তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখেও দেখেন না, কান আছে কিন্তু শুনেও শোনেন না; বুদ্ধি আছে কিন্তু বিবেক তাড়িত হয়ে কাজ করে না।

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল প্রথমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজের পদত্যাগ এবং পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানের নিয়োগ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এই নিয়ে দু'দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ক্রমে প্রথমে লোক দেখানো চিঠি চালাচালি এবং পরে সংসদ ভবনে একাধিক বৈঠক বসেন। অনেক দিন বৈঠক চালিয়ে তারা অন্তঃসারশূন্যভাবে তাদের বৈঠক শেষ করেন। যে কারণে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেয়। যে আন্দোলনে রাজপথে বলি হয়েছেন সাধারণ মানুষ এবং ক্ষতি হয়েছে দেশের কোটি কোটি ডলারের সম্পদ। হায়রে দুর্ভাগ্য, যারা এসব সন্ত্রাসী আচরণ করেছে, যারা ওই আচরণ করার জন্য সাধারণ জনগণকে ইন্ধন দিয়েছে, সেই দলের কোনো নেতাকে আজ পর্যন্ত হাতকড়া লাগানো হলো না কেন? কে নিবে এই ধ্বংসাত্মক কাজের দায়িত্ব? এক সময় তারা বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং প্রশাসনকে জিম্মি করে নিজেদের দাবিগুলো এক এক করে আদায় করে নেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি আসে বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে পারবেন না। তার অপরাধ তাদের ভাষায় তিনি কোনো এক সময় নাকি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাতে কি হয়েছে? তিনি কি এ দেশের নাগরিক

www.pathagar.com

নন? রাজনীতি করলে যে তিনি স্বীয় যোগ্যতা বলে বাংলাদেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে পারবেন না, এটা কোন ধরনের মানসিকতা। বাংলাদেশে রাজনীতি করেন না বা অতীতে করেননি এমন কোনো ব্যক্তি আছেন- এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। আওয়ামী লীগের দাবির মুখে বিচারপতি কে এম হাসান নিজের সম্মান রক্ষার্থে আগেই সরে পড়েছেন। রাষ্ট্রপতি অন্যায়ভাবে একই সাথে প্রধান উপদেষ্টার পদ নিতে বাধ্য হলেন সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে- যেটা তিনি না করলেই পারতেন। বিচারপতি কে এম হাসানকে সরানোর এই পন্থাটি ছিলো অসাংবিধানিক। এই দাবি আদায় করে আওয়ামী লীগ একের পর এক দাবি তুললো প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজকে সরাতে হবে। জাকারিয়াসহ অন্যান্যকে সরাতে হবে। তাদের সেই দাবিও পর্যায়ক্রমে মেনে নেয়া হয়। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজকে ছুটিতে যেতে হয়। সেই সাথে তাদের আরো একটি বড় দাবি-ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ। এই ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা নিয়েও আছে নানা অভিযোগ। যখন যে সরকার এই কাজটি করেন তারা প্রতিবারই কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। বাংলাদেশে একবার যদি কম্পিউটারাইজড ন্যাশনাল আইডি করা যায় তাহলে ভোটার তালিকা নিয়ে এই অসন্তোষ থাকার কথা নয় এবং ভুয়া ভোটারও থাকার কথা নয়।

প্যাকেজ প্রস্তাবের সকল প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার পরও আওয়ামী লীগ আরো এক এক করে নতুন নতুন দাবি তুলতে থাকে এবং একই সাথে হরতালসহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তাদের দাবির যেন শেষ নেই! তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজই হলো যেনো ১৪ দলের দাবিকে বাস্তবায়ন করা। জনগণের ভোটে যেখানে ৪ দলের দাবিগুলো তাদের কাছে উপেক্ষিত থেকে যায়। সবশেষে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের প্রায় সকল দাবিকে বাস্তবায়ন করেও ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে অনাকাংখিতভাবে হঠাৎ করে ৪ উপদেষ্টা পদত্যাগ করে নতুনভাবে সংকটের জন্ম দেন। অবস্থা দেখে নিজের কাছে মনে হয়েছে সব সাজানো খেলা, পিছন থেকে কে বা কারা খেলছে। তাদের পদত্যাগে মনে হয়েছে তারা দেশ ও দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারেননি। দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি তাদের যে কমিটমেন্ট তারা তা পালন করেননি- উল্টো সংকটকে ঘনীভূত করেছেন। বাকী অন্যান্য উপদেষ্টাদের কথায় ও আচরণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ছিলো লক্ষ্যণীয়। পদত্যাগী উপদেষ্টারা অযোগ্য বলেই তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করবে বলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েও শেষ মুহূর্তে তা প্রত্যাহার করে এবং আবারো আন্দোলনের ডাক দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। সর্বশেষ দাবি হিসেবে তারা

www.pathagar.com

প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে রাষ্ট্রপতিকে সরে দাঁড়ানোর আহবান জানান। প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ দেশ এবং গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করে পর্দার অন্তরালের অদৃশ্য শক্তি ও সন্ত্রাসী রাজনীতিবিদদের ভয়ে সর্বশেষে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

আমরা যদি এই সংকটের গোড়ার দিকে তাকাই তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে এর মূল কারণ কি এবং কারা বারবার সংকট সৃষ্টির কলকাঠি নাড়াচ্ছেন। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর থেকেই আওয়ামী লীগ চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে কোনো ইস্যু ছাড়াই ধ্বংসাত্মক বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে তারিখ ঘোষণা করে উৎখাতের ডাক দেয়। সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দলীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা রাজপথ দখল করে নেয়। এসবের পরিপেক্ষিতে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে একটি নির্বাচিত দল দেশ চালাবে, না নির্বাচনে জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দল দেশ চালাবে? বা নির্বাচনের জন্য মধ্যস্থতাকারী কিছু কিছু মুখোশপরা ভদ্রবেশীরা অন্যের ইশারায় দেশ চালাবে? এটা যতোক্ষণ না আমরা নির্ণয় করতে পারবো, ততোক্ষণ বাংলাদেশের জনগণের জীবনে মাঝে মধ্যে বা পাঁচ-দশ বছর পর পরই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কি অদ্ভুত এই দেশ, নিজেদের প্রতি আস্থা না রেখে নির্বাচন আসলেই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছু অনির্বাচিত ব্যক্তির কাছে দেশের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করি আমরা। রাজনৈতিক কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় এবং বর্ষীয়ান নেতার রক্তে যখন রাজপথ রঞ্জিত হয়, সেই সময় শেখ হাসিনা আত্মীয়- স্বজনদের নিয়ে বিদেশে মহা-আনন্দে সময় অতিবাহিত করছিলেন। অদৃশ্য কারণে আন্দোলনের ডাক দেননি। যে সময় আওয়ামী লীগের তীব্র আন্দোলন করার কথা ছিলো সেই সময় তিনি আন্দোলনের ডাক দেননি। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী বিএনপির মতো একটি শক্তিশালী দলকে বিনা কারণে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য আওয়ামী লীগের ব্যর্থ আন্দোলন দলের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দলে কেউ প্রকাশ্যে বলতে না পারলেও অনেকেই মনে করেন আওয়ামী লীগের মতো একটি বড় দলের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অন্তত শেখ হাসিনার বর্তমানে আর নেই।

আশির দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনাকে বিদেশ থেকে এনে সামনে রেখে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী আওয়ামী লীগ নেতা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের মানসে দলীয় রীতি-নীতি ভঙ্গ করে নিজেরা পেছনে থেকে শেখ হাসিনাকে দলীয় সভানেত্রী বানালেন। যারা শেখ হাসিনাকে দলের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের পাশ কাটিয়ে দলের সভানেত্রী বানালেন তাদের মধ্যে অনেক বিতর্কিত ব্যক্তি রয়েছেন এবং

www.pathagar.com

অনেকেই সুবিধা করতে না পেরে সরে পড়েছেন। তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগও রয়েছে। কথিত রয়েছে, তাদের কেউ কেউ শেখ মুজিব হত্যার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। দলের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার জন্য এবং হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দলের চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার স্লোগানে শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রী নির্বাচন করেন। এতে দলের অনেক ত্যাগী, ভূয়োদর্শী , অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। ওই সময় এই চক্রটি এতো শক্তিশালী ছিলো যে- কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি, যা আজো অব্যাহত রয়েছে। দলের সভানেত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলবেন এমন সাহস কার? অন্য কোন যোগ্যতা না থাকলেও তার একমাত্র যোগ্যতা তিনি শেখ মুজিবের কন্যা। তিনি যা বলবেন তাই শুনতে বা করতে হবে? যা আদেশ করবেন তা কি শিরোধার্য? তা না হলে দলের মধ্যে এমন হবে কেন? দলের অভিজ্ঞ নেতাদের পাশ কাটিয়ে শেখ হাসিনাকে কেন সভানেত্রী করা হলো?

রাস্তা-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের কথা বলে মুখে খৈ ফোটান, অথচ নিজ দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা নেই- আছে পরিবারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র। তিনি শুধু মুখেই গণতন্ত্রের কথা বলেন। রাজনীতি করতে হলে দরকার শিক্ষার, ভিশন বা দূরদৃষ্টির, বুদ্ধি ও বিবেকের। রাজনীতির জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। রাজনীতিবিদরা সাধারণত মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু আজকাল সেই যোগ্যতার বালাই নেই। দেখা যাচ্ছে রাজনীতি করার যোগ্যতা এবং দলে বা কমিটির মধ্যে স্থান পেতে হলে আপনাকে শেখ পরিবারের সদস্য অথবা নেত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হতে হবে অথবা পদলেহন করতে হবে। এখানে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই, নেত্রীর আদেশ- নির্দেশ পালন করাই যেনো গণতন্ত্র! শেখ হাসিনার নিজের দলে যেহেতু গণতন্ত্র নেই, সেক্ষেত্রে অন্যকে গণতন্ত্রের সবক দেয়ার নৈতিক অধিকার তার বা তার দলের নেই। একই কারণে অন্যকে গণতন্ত্রের কথা বলা নেহাৎ লোক দেখানো ছাড়া আর কিছু হতে পারে? বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয় তারা দেশের সহজ- সরল মানুষগুলোকে বোকা বানিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। জনগণের সরলতার সুযোগ নিয়ে যখন যা তখন তা-ই তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন- নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলন না থাকলে রাষ্ট্রের মধ্যে অনুশীলন করবেন কি করে?

বাংলাদেশের জনগণ বড় আশা নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো। বাংলাদেশের মানুষ বড় আশা করে কষ্ট ও

www.pathagar.com

ত্যাগ স্বীকার করে দেশ স্বাধীন করেছিলো কথা বলার স্বাধীনতার জন্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, স্বৈরশাসকের রোষানল থেকে বাঁচার জন্য, বন্দুকের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য, বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তির জন্য। বাংলাদেশের মানুষের সাধারণত খুব একটা চাহিদা নেই। যে কারণে জনগণ এতো ত্যাগ স্বীকার করলো। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আদৌ কী সেই কাংঙ্খিত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে?

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার পরিবর্তে মান্ধাতা আমলের অনুকরণে রাজপরিবারের মতো পারিবারিক রাজতন্ত্র কায়েমের পথ পরিষ্কার করছেন। আধুনিকতার ছোঁয়া নেই রাষ্ট্র এবং দেশ পরিচালনায়। আছে মধ্যযুগীয় চিন্তা- ভাবনা ও কলাকৌশল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও বিপক্ষের শক্তি বলে দুইভাগে বিভক্ত করতে চাচ্ছে এবং তা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের কাছে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তখনকার সময় বাংলাদেশের মোটামুটি সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে তাদের নিজেদের একক কৃতিত্ব বলে দাবি করতে থাকে। স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের ফলাফলকে বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। নিজেরা নিজেদের ইচ্ছামত ভোগ দখল করতে থাকেন এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সময়ে অসময়ে তা ব্যবহার করতে থাকেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনো একক দল বা ব্যক্তির কৃতিত্ব নয়– এর দাবিদার বাংলাদেশের সকল মানুষ। আওয়ামী লীগের আচরণে মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ যেনো তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি।

মুক্তিযুদ্ধ আসলে কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। মূলত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রথম সমস্যার সৃষ্টি ওখান থেকেই। মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামী লীগ নিজ দলের সম্পদ বলে দাবি করে বসে। সেই সমস্যা এখনো বাংলাদেশে বিরাজমান। মুক্তিযুদ্ধের কথা বেশি বেশি বললেও বাস্তবে কাজ করেছে অন্যরা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মারা গেছেন আজ থেকে বহু বছর পূর্বে। তারা বাঙালি জাতির জন্য যা করে গেছেন তা বাংলাদেশের মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে মানুষ হয় তাহলে আজীবন স্মরণ রাখবে। তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের নামে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এখনো রাজনীতি করছে। কিন্তু খালেদা জিয়া– শেখ হাসিনার আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন কী তা বাংলাদেশের মানুষ আজও জানতে পারেনি। মরা মানুষ নিয়ে দু'দলের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এ দেশে। তা না হলে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগুবে না। বর্তমানে রাজনীতি হওয়া উচিত-বর্তমান নেতৃত্ব কিভাবে দেশ পরিচালনা করবে, তাদের

www.pathagar.com

ভিশন কী, তাদের কর্মসূচি কী? কী তাদের আগামী দিনের অর্থনৈতিক কর্মসূচি? তারা কতজন বেকার যুবককে চাকরি দিতে পারবেন? কি ভাবে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবেন? তাদের বৈদেশিক নীতিসহ অন্যান্য। কর্মসূচির মধ্যে প্রতিহিংসার পরিবর্ততে প্রতিযোগিতা থাকতে হবে।

স্বাধীনতার পর স্বচক্ষে দেখেছি অনেক আওয়ামী লীগ নেতা হিন্দুদের বাড়ি দখল করেছেন, ব্যাংক লুট করেছে, জায়গা-সম্পত্তি দখল করেছে। অন্যদিকে মানুষের ওপর অন্যায়ভাবে রক্ষী বাহিনী দিয়ে জুলুম করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর মানুষকে বিভিন্ন নির্যাতনে নিষ্পেষিত করেছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির স্বাদ কেড়ে নিয়ে বিষাক্ত ছোবলে ক্ষত- বিক্ষত করেছে। যে কারণে বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করতে ভয় পায়। ভোট দিতে দুই বার চিন্তা করে। সেই অবিশ্বাসের কারণে বাংলাদেশের মানুষ তাদের বার বার প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য যে রাজনীতি করা দরকার, আওয়ামী লীগ তার চাইতে অনেক অনেক দূরে।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা হজ্ব করে এসে মাথায় পট্টি বেঁধে ও হাতে তসবিহ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা চান। মিনতি করে বলেছিলেন'আমাকে একবার আপনাদের খেদমত করার সুযোগ দিন।' যদিও এর আগের নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বেফাঁস কথা বলে ফেঁসে গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। বিগত নির্বাচনের কথা স্মরণ রেখে মানুষের কাছে আকুতি-মিনতি ও ক্ষমা চেয়ে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এতো কান্নাকাটির পর বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনাকে একবার সুযোগ দিয়েছিলেন। মানুষের দয়ায় ক্ষমতায় বসে শেখ হাসিনা মানুষের কথা ভুলে গেলেন। টাকা দিয়ে একটির পর একটি ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে শুরু করলেন। অনেকবার অপ্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ করলেন। ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে লাগলেন। নিজের আত্মীয়-স্বজনকে মন্ত্রী, সচিব ও বিদেশে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে বাংলাদেশে রাজতন্ত্রের শাসন পাকাপোক্ত করলেন। আর আওয়ামী লীগের বুভুক্ষু এমপিরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন করতে লাগলেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বঘোষিত সন্ত্রাসী গডফাদার হিসেবে আবির্ভূত হলেন জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, আবু তাহের ও ডাঃ ইকবালের মতো অনেক মন্ত্রী, এমপি ও নেতা। এরা সবাই শেখ হাসিনার আশীর্বাদেই এক একটি জনপদে সন্ত্রাসী ও অত্যাচারী হিসাবে আবির্ভূত হলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি ক্ষমতায় থাকাবস্থায় বলেছিলেন, 'একটি লাশের পরিবর্তে আমি দশটি লাশ চাই।' পৃথিবীর কোনো সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের কথা বলতে

www.pathagar.com

পারেন, যা আমার জানা ছিলো না। শেখ হাসিনাকে খুব কাছ থেকে দেখে যা মনে হয়েছে, তা হলো অন্যকে খুব ছোট করে দেখার মানসিকতা, অন্যকে সম্মান না করা এবং তার মধ্যে হিংসা খুব বেশি কাজ করে।

স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সারা বাংলাদেশের মানুষ রাজপথে যখন এক মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, এরশাদের বিদায় ঘন্টা যখন নিশ্চিত, ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে নির্বাচন করে শেখ হাসিনা আন্দোলনের পিঠে ছুরি মেরে সমাজে কথিত নিজে মোটা অংকের অর্থ গ্রহণ করে জাতির সাথে বেঈমানী করলেন। অথচ শেখ হাসিনা নিজেই বলেছিলেন- যারা এই সরকারের (এরশাদের) সাথে নির্বাচনে যাবে তারা জাতীয় বেঈমান। বিকেলে জনসভায় একথা বলে রাতেই জনগণের সাথে বেঈমানী করে এরশাদের সাথে নির্বাচনী আঁতাত করলেন। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি অংশগ্রহণ না করতো তাহলে স্বৈরাচারী এরশাদকে বাংলার মসনদ থেকে অনেক আগেই বিদায় নিতে হতো– প্রাণ দিতে হতো না ডাঃ মিলন, নূর হোসেনসহ আরো গণতন্ত্রকামী মানুষকে। তৈরি হতো না দেশে রূপকথার কাহিনী। শেখ হাসিনার লোভের কাছে সাধারণ মানুষের আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়লো। এবারও এরশাদের সঙ্গে আঁতাত করলেন শেখ হাসিনা। ভাই-বোনের মধ্যে কি মধুর এ সম্পর্ক। ভাইয়ের জন্য বোনের এতোই টান, বাংলাদেশের রাজনীতির সকল রীতিনীতি ও নিয়মকানুনকে পদদলিত করে, গণতন্ত্র, সংবিধান ও জনগণকে তোয়াক্কা না করে একই সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য সবাই মিলে নানা ফন্দিফিকির করতে থাকেন। এতে সাময়িকভাবে নিজেরা কিছু লাভবান হলেও জাতি, জনগণ, সংবিধান, কাঠামো ও নিয়ম-কানুন গণতন্ত্র পরাজিত হয়েছে। একই মঞ্চে যোগ দিয়েছেন দলছুট ও জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কিছু নেতা নামধারী আদর্শহীন রাজনীতিবিদ। ইসলামের বিরুদ্ধে বললেও আওয়ামী রাজনীতির সর্বশেষ ডিগবাজি ইসলামিক দল নিয়ে রাজনীতি করার চুক্তি জনগণ কখনও ভুলবে না। পাশাপাশি নৈতিকস্খলন ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠনকারী ব্যক্তিকে নিয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতা দখল করার দুষ্ট রাজনীতি দিনে-দুপুরে মানুষ অবলোকন করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে এরশাদ যখন ৪ দলের সাথে যাবার ঘোষণা দিলেন তখন শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে বলেছিলেন- চোরে-চোরে এক হয়েছে। এখন শেখ হাসিনা কি বলবেন? তাহলে তিনিই কি সেই চোরের সাথে অবৈধ রাজনীতির সম্পর্ক গড়ে তুললেন? যদিও শোনা যায় এরশাদের সাথে শেখ হাসিনার আগে থেকেই মধুর সম্পর্ক রয়েছে- অন্যদিকে কথিত আছে তারা নাকি মাঝে মধ্যে লং ড্রাইভে যেতেন! মাঝে একটু সম্পর্কে চিড় ধরেছিলো। এখন তিনি তা আবার ঝালাই করে নিলেন। বর্তমানে নূতন সম্পর্ক ভাই-বোনে রূপান্তরিত হলো। তাদের মধ্যে নতুন আত্মীয়তা হয়েছে। এই আত্মীয়তা ভারত তৈরি করে দিয়েছে বলে

www.pathagar.com

লোকমুখে শোনা যায়। হায়রে অবাক পৃথিবী, অনেকেই বলেন এরশাদের চাবি তো ভারতের কাছে। ভারত যে দিকে বলবে তিনি সেদিকে মোড় নিবেন। চারদিকে গুজব ইতোমধ্যে লন্ডনে প্রচুর টাকাও পেয়েছেন। শেখ হাসিনা শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য গণতন্ত্র হত্যাকারীকে, অবৈধ পথে বন্দুকের জোরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারী বিশ্ব বেহায়াকে এখন তাদের জোটে নিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো, শেখ হাসিনা যেমন ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে এরশাদকে বৈধতা দানের জন্য নির্বাচনে অংশ নেন ঠিক তেমনিভাবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এরশাদ সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে তাকে প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ দিয়ে কিছুটা ঋণ শোধ করেন। তারই পুরস্কার হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরশাদকে জেল থেকে বের করে একটি আয়েসী প্রাসাদে অন্তরীণ রাখেন। যার নাম দেয়া হয় সাব জেল। সেখানে স্বৈরাচারী এরশাদ রাজার হালে এবং জামাই আদরে সময় কাটিয়েছিলেন। শুধু শেখ হাসিনা এককভাবে নয়, দুই নেত্রীই এই লম্পট, অবৈধ সেনানায়ক প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিকভাবে কমবেশি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সম্প্রতি কোর্টে রাজনীতিবিদদের আচরণ ও কালো কোর্ট পরা নামকরা কিছুসংখ্যক ব্যারিস্টার ও এডভোকেটের ব্যবহার দেখে শুধু মর্মাহত হইনি বরং আশ্চর্য হয়েছি। কোর্ট, সংবিধান ও নিয়মকানুনকে কেউ সম্মান করেন না। সাম্প্রতিক সময়ে এরশাদের মামলার একটি রায়ে শেখ হাসিনা মর্মাহত হয়েছেন। মামলার রায়ের পর শেখ হাসিনার প্রতিনিধিরা তার বাসায় সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলেন। হায়রে বেহায়া রাজনীতি! দুই দিন আগে যাকে চোর বলে গালি দিয়েছেন, এখন তাকেই মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন– যারা তাকে বরণ করে নিচ্ছেন তাদেরকে আদর্শহীন রাজনীতিবিদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? গণতন্ত্র হত্যাকারী স্বৈরাচারী নানান ঘটনার জন্মদানে পটু এরশাদ আজ গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বাংলাদেশের মান ইজ্জত পৃথিবীর মানুষের কাছে ছোট করেছে। এই স্বার্থের রাজনীতি শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব!

১৯৯১ সালের অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসেছিলো। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সেটি ছিলো বিদেশীদের কাছে সবচেয়ে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন। বিদেশেও এই নির্বাচন মোটামুটি প্রশংসনীয় ছিলো। অথচ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজিত হবার পর বলেছিলেন, নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। বিএনপি সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনা বলেছিলেন- এই সরকারকে এক মিনিটও শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না। সাবাস শেখ হাসিনা আপনি কথা দিয়ে কথা রেখেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। এর ফলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান

www.pathagar.com

হলেও জাতি লাভবান হতে পারেনি। যার ফলে শুরু হলো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র। সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের চক্রান্তে শেখ হাসিনা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন যা অব্যাহত থাকে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পরও। আন্দোলনে জনমত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে সরকারি কর্মচারিদের সাথে যোগসাজশে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনতার মঞ্চ গড়ে তোলেন। সেই সময় বিএনপি সরকার দেশে গণতন্ত্রের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করে পদত্যাগ করে নির্বাচনের ঘোষণা দেয় যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। বিএনপি যদি স্বৈরাচারী দল হতো এবং খালেদা জিয়া যদি স্বৈরশাসক হতেন তাহলে দেশ ও গণতন্ত্রের দিকে না তাকিয়ে ক্ষমতায় থাকতে পারতেন অনির্দিষ্টকালের জন্য। কিন্তু তিনি জনগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পদত্যাগ করেন। যে সব আমলা সে সময় শেখ হাসিনাকে অবৈধভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করেছিলেন এবং গোপনে হাত মিলিয়েছিলেন ক্ষমতায় যাবার পর শেখ হাসিনা পরবর্তীকালে তাদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন। ক্ষমতার মোহে শেখ হাসিনা সরকারি কর্মচারিদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র ও আন্দোলন শুরু করেন- যা বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী। এই বিষয়গুলো কোনো দল বা সরকারের জন্য ভালো বার্তা বহন করে না।

২০০১ সালে নির্বাচনে আবারো আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়। বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগ অতীতের মতো আবারো মিথ্যার আশ্রয়ে নির্বাচনে কারচুপির ভুয়া অভিযোগ তোলে এবং সংসদে না গিয়ে রাজপথে দীর্ঘদিন মিথ্যা আন্দোলন করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সংসদে যোগ দেয় এবং সংসদে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। সেই সময় শেখ হাসিনা বলেছিলেন, সংসদে গিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার নিয়ে কথা বলার জন্য। সরকারি দল যদি তাদের কথা না শোনে তাহলে পদত্যাগ করবেন বলে হুমকি দেন। আসল কথা হলো সে সময় শেখ হাসিনা সংসদ সদস্য পদ রক্ষা করার জন্য সংসদে গিয়েছিলেন। এটা দিবালোকের মতো সত্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রশ্নে বিএনপি অনেক আগেই আওয়ামী লীগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো সংসদে, কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপির সেই আহবানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আসছিলো। আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করবে আর সংসদে যাবে না তা হতে পারে না। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী দাবি করে থাকেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি নাকি তারই ব্রেইন চাইল্ড। একটি গণতান্ত্রিক দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কোনো মতেই বৈধ নয়। তারপরও বাংলাদেশের জনগণ অনন্যোপায় হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি মেনে নিয়েছিলো গণতন্ত্র ও দেশের স্বার্থে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেত্রী ও নেতাদের

www.pathagar.com

অবিশ্বাসের কারণে, এক দল অন্য দলকে বিশ্বাস না করার কারণে অদ্ভূত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু হয়। অবশ্য ২০০১ সালের নির্বাচনে হেরে যাবার পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সংস্কার দাবি করেন। তিনি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করতেন তাহলে এই পদ্ধতি হতো পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি, আর হেরে যাবার পর হয়ে গেলো সূক্ষ্ম কারচুপির অথবা পদ্ধতিতে রয়েছে নানান ত্রুটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির মধ্যে যদি কোনো সমস্যাই থাকতো তাহলে আওয়ামী লীগ নেত্রী যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তার সংস্কার করলেন না কেন? তখন সংস্কার না করে এখন রাস্তায় চিল্লাচিল্লি করছেন কেন? মানুষ হত্যা করছেন কেন? আন্দোলনের কোনো বৈধ ইস্যু না পেয়ে হাতের কাছে যখন যা পাচ্ছেন তা নিয়েই রাজপথ অহেতুক উত্তপ্ত করছেন এবং ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছেন। নাগরিকদের জীবনে একটা বিপর্যয় নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের জনগণের দেয়া দায়িত্ব পালন না করে অনিয়মতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ভাষায় কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। সংসদে না গিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে সকাল-বিকাল-দুপুর ও রাতে চিৎকার করে- আন্দোলনের নামে হরতাল-অবরোধ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছেন। তারা কোনো কিছু গড়তে, সৃষ্টি করতে পারেননি বরং এ পর্যন্ত শুধু ধ্বংসই করেছেন। সর্বোপরি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উন্নয়নের ও সাহায্যের পরিবর্তে অকাজে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন। বিএনপি সরকার শেখ হাসিনার একের পর এক চক্রান্ত সামলাবে, না কি দেশের উন্নয়নে কাজ করবে? বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নেতাদের চালচলন দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে মনে হয় তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বড় অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বর্তমানে দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের কথা বলে দেশকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার রাজাকার, আল বদর গালি দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। যারা আওয়ামী লীগের সাথে থাকবে তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। আর যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকবে না বা ভোট দেবে না তারা দেশের শত্রু। তারা হয়ে যায় কখনও রাজাকার- আল বদর না হয় গণদুশমন! তাদেরকে কে অধিকার দিয়েছে এসব টাইটেল দেবার। আওয়ামী লীগই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি- আর সবাই স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি! সেই দিক থেকে বিচার করলে তো বাংলাদেশে এখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিই বেশি (আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা ও তত্ত্ব অনুযায়ী)! স্বাধীনতার সময় আওয়ামী লীগের নেতারা ভারতে কি করেছেন সবাই কমবেশি জানে। আওয়ামী লীগের নেতাদের মনে রাখা উচিত দেশের মুক্তিযুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য দলগুলোর মধ্যেও অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।

www.pathagar.com

তারা আওয়ামী লীগের মতো গলাবাজি করতে পারে না। বলতে গেলে অন্যান্য দলে আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার রয়েছেন। আওয়ামী লীগের বলা উচিত মুক্তিযুদ্ধের পর তারা কি কি করেছে। অন্যদিকে বিএনপি মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় ও প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের নামে ঢাকায় রাস্তার নামকরণ করেছে। স্বাধীতার ৩৫ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের কথা বলে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কারো কাম্য হতে পারে না- এটা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র পথ। তা না হলে তারা অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে ফতোয়াবাজ এবং জঙ্গীদের সাথে নাকে খত দিয়ে চুক্তি করতেন না। যারা ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় বলেছিলো আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে বউ তালাক হয়ে যাবে- অথচ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সেই আওয়ামী লীগ এখন তাদের সাথে চুক্তি করলো? ক্ষমতায় যাবার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের ৫০ বছরের রাজনৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিলো। দেশের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরাও একটু চেঁচামেচি করে বর্তমানে চুপ রয়েছেন। জানতে ইচ্ছা হয় প্রগতিশীল দাবীদাররা চুপ রইলেন কেন?

তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪০ পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে, বিএনপিসহ অন্যান্য দল ভোট পেয়েছে ৬০ পার্সেন্ট। তার অর্থ এই নয় যে ৬০% লোক দেশ বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি। এ সব কথা বলে আওয়ামী লীগ শুধু ভোট ব্যবসা করছে। আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে আপোস করে একই মঞ্চে বসেছিলো এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। তারা রাতের পর রাত, দিনের পর দিন জামায়াত নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। ধানমন্ডির বাড়িতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এমনকি নিজের হাতে মিষ্টি তুলে জামায়াতের অনেক নেতাদের আপ্যায়ন করেছেন। জামায়াত নেতাদের আশীর্বাদ নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। জামায়াতের সাথে হিসাবে গরমিল হবার কারণে এবং বিএনপির সাথে জোট গঠন করায় জামায়াতে ইসলামী এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত জামায়াতে ইসলামকে এখন রাজাকার- আল বদর হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করছে। জামায়াত যদি আওয়ামী লীগের সাথে থাকতো তাহলে জামায়াতও হতো স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি! যার নমুনা সম্প্রতি দিলেন মুখবাজ আব্দুল জলিল জঙ্গী ফতোয়াবাজদের সাথে চুক্তি করে।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আমরা কী দেখতে পাই। যারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন তারা সরকার গঠন করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশ পরিচালনা

www.pathagar.com

করেন। বাংলাদেশের জনগণ ২০০১ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বিএনপিকে ম্যান্ডেট দিয়েছে দেশ পরিচালনার জন্য। বিএনপি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে– সেটাই স্বাভাবিক। বিএনপি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ভালো করতে পারে বা মন্দ করতে পারে। বিএনপি মন্দ করলে জনগণকে নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনা বিএনপির ব্যর্থতা সম্পর্কে বলবেন। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনে পরাজিত শেখ হাসিনার কথা শুনবে কেন বা নির্বাচনে জয়ী বিএনপিই বা তার কথা শুনবে কেন? বাংলাদেশের জনগণকে পরাজিত পার্টির কথা শুনতে বাধ্য করা হলে যারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন তাদের ভোটের মূল্যায়ন করবে কে? আওয়ামী লীগের যদি তুলনামূলকভাবে বেশি ভালো কোনো প্রস্তাব বা কর্মসূচি থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, তাহলে তারা পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের সামনে তুলে ধরুক। বাংলাদেশের জনগণ যদি তাদের কর্মসূচি গ্রহণ করে বা তার দল ও তাকে বিশ্বাস করে তাহলে তাদেরকে আবারো ক্ষমতায় আনবে- জনগণকে কোনোভাবে বোকা ভাবার সুযোগ নাই। তাই বলে বাংলাদেশের মানুষকে জিম্মি করে নয় বা দেশের সম্পদ নষ্ট করে নয়। এতে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা ওঁৎপেতে থাকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য। নির্বাচনে জয়ী হতে হলে জনগণকে সম্মান করা শিখতে হবে। জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করতে হবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোও কোনো সঠিক নিয়মনীতি অনুসরণ করেনি। বিদেশে আমরা কী দেখি, আর বাংলাদেশের টিভি ও পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা কী দেখি। বিদেশে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার এবং তাদের কাজকর্মকে প্রাধান্য দেয়া হয়; আর বিরোধী দলকে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী খুব কম গুরুত্ব দেয়া হয়। বিরোধী দলের কাজ হলো সরকারি দলকে দেখা যাতে তারা জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ না করে। মূলত এটাই স্বাভাবিক। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুরোটাই বিপরীত। বেশিরভাগ পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী যতোটুকু না গুরুত্ব পান তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পান নির্বাচনে পরাজিত দলীয় নেত্রী বা নেতাসর্বস্ব দলের নেতারা। পত্রিকাগুলো দলীয় মদদে আশীর্বাদপুষ্ট হবার কারণেই যা পাবার নয় তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পান বিরোধীদলীয় নেতা– এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের। এই অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাবার কারণে অনেক সময় রাজনীতিবিদরা উৎসাহিত হন। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। জনগণের মধ্যে রয়েছে মিডিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ। রাস্তায় পশুর মতো মানুষকে পিটিয়ে মারছে, দেশের সম্পদ নষ্ট করছে- তাই নিয়ে দেশের

www.pathagar.com

প্রগতিশীল দাবিদার সুবিধাবাদী (সুশীল সমাজ) অন্যায় কাজে বুদ্ধিজীবীদের কোনো লেখালেখি নেই, থমকে গেছে তাদের কলম। বাংলাদেশে যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন তাদের কাজ ও কথা শুনলে মনে হয় এদের মাথার চিন্তার মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকার কারণেই রাজনৈতিক জটিলতা দেশে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিরোধী দলীয় নেতা এবং নেত্রীরা আসল কাজে অত্যুৎসাহী না হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহিত হচ্ছে। সর্বোপরি সংবিধান লংঘনের অসাংবিধানিক ও অনৈতিক আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে দেশের মিডিয়াগুলো। সংবাদিকরা অতি উৎসাহী হয়ে দেশে বিদেশীদের বাসায় দাওয়াত খাওয়া একটু লাল পানি ও বিদেশীদের সাথে একটু সম্পর্ক রাখার বদৌলতে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে খুব বেশি করে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে তাদেরকে প্রচার দিচ্ছে। সাংবাদিকদের পেশার বিরুদ্ধে কাজ দেখে অনেকের মনেই তাদের দেশপ্রম সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

বাংলাদেশের আইন কিতাবে থাকলেও বাস্তবে নেই। তার বড় প্রমাণ হলো, সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতিবিদরা যে ধ্বংসাত্মক আচরণ করেছেন, জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে চলছেন, জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন, আইনের লোক হয়ে বেআইনি কাজ করছেন। যেখানে তারা জেলে থাকার কথা, জেলে যাওয়ার পরিবর্তে কই তারা তো দিনে দুপুরে শির উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? রাজনৈতিক ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। দাওয়াত খেয়ে বেড়াচ্ছেন। এতে একটি কথাই প্রমাণিত হলো এ দেশে নিয়ম-কানুন ও সংবিধানের দরকার নেই। রাস্তায় গুণ্ডামি করলে, জনজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষ মারতে পারলে, জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারলে, বস্তির মহিলাদের ভাড়া করে এনে জনগণের গাড়ি ভাংচুর করতে পারলে, রাষ্ট্রপতিকে নিজে বা ভাড়াটে মানুষ দিয়ে গালাগালি দিলে ও দেয়ালেই কার্যসিদ্ধি হয়। তবে কথা হচ্ছে বন্দুক তাক করে নিরস্ত্র রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করা যায়, বন্দুকের নল বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায়, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে বিদেশী কূটনীতিকদের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে রাজনীতিবিদদের দেউলেপনা। রাজনীতিবিদদের মনে রাখা উচিত বাংলাদেশ একটি স্বাধীন- সার্বভৌম দেশ। দেশ স্বাধীন করতে জনগণকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আমরা অযাচিতভাবে বিদেশিদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর সুযোগ করে দিচ্ছি। যেটা জাতির জন্য শুভলক্ষণ নয়, এতে বিপদ আসতে পারে। কিন্তু বিদেশী কূটনীতিবিদদের ভূমিকা দেখলে মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন নয়– এটা তাদের দেশের অঙ্গরাজ্য। বর্তমানে প্রভাবশালী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রগুলো যা বলছে তাই বাংলাদেশে করা হচ্ছে। তারই প্রমাণ আজকের বাংলাদেশ। তারাই যেন আমাদের প্রভু বা শাসক। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা একে অন্যকে মানেন না, বিশ্বাস করেন না- তাই তারা সহজে ছুটে যান বিদেশী রেফারিদের কাছে। কারণে অকারণে ধরণা দেন তাদের কাছে, বিচার চান তাদের কাছে। রাজনৈতিকভাবে তারা এতোই দেউলে হয়ে পড়েছেন যে সকল সমস্যার সমাধান এখন বিদেশীরা দিয়ে থাকেন। তারা যে সার্টিফিকেট দেবেন সেটাই মানা হবে, অন্য কারোটা নয়। জনগণ বলির পাঁঠাতে পরিণত হয়েছে। যার যেভাবে খুশি সেইভাবে কোরবানি দিচ্ছে। অতীতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা ভুললে চলবে না। তারা ব্যবসার নাম করে প্রায় দু'শত বছর ভারতবর্ষকে শাসন করে গেছে। বর্তমানে তাদেরই মনোনীত প্রতিনিধিরা ভিন্নভাবে দেশ চালাচ্ছে। ব্রিটিশদের লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করতে অনেক বছর লেগেছে, অনেক মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে ও অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। বর্তমানে টাকা পয়সা ধার বা জ্ঞান দানের নামে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলছে। এর ধারাবাহিকতা এখনই রোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আরো খেসারত দিতে হবে জাতিকে। বাংলার জনগণকে বাদ দিয়ে কিছু কিছু রাজনীতিবিদ বা সামরিক-বেসামরিক আমলা সে সব বেনিয়ার হাত ধরে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টায় দিন রাত ব্যস্ত। নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে তারা জাতির মান-ইজ্জতকে ভূলুণ্ঠিত করতে পিছপা হবেন না। দেশবাসীকে চোখ, কান খোলা রাখতে হবে। দেশের জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে যাতে কোনো মীরজাফর নিজের দেশের স্বার্থ না দেখে অন্যের উদ্দেশ্য হাসিল করে। রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। যেসব রেফারির কথা আমরা বেশি বেশি বলি সেসব বেনিয়াদের নিজ দেশে এদের কোনো অবস্থানই নেই। ওরা ঐ সব দেশের ছোট একজন সরকারি কর্মচারী মাত্র। বাংলাদেশে আমরা ওদেরকে বড় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। গোলামী করা কি আমাদের মজ্জাগত স্বভাব?

রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি বাংলাদেশকে ক্যান্সারের মতো আক্রান্ত করেছে। প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে আঙ্গুল ফুলে হঠাৎ কলা গাছ বনে যাচ্ছেন। যারাই ক্ষমতায় যাচ্ছেন তাদের মধ্যে অনেকেই অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছেন- কিন্তু কিভাবে? এই দুর্নীতিবাজদের ধরার জন্য দেশে যেনো কেউ নেই– আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। বাংলাদেশে আইন যেনো শুধু গরীবদের জন্য। যারা পুকুর চুরি করছে তারা আইনের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছেন। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, সামরিক, বেসামরিক আমলা, ভদ্রবেশী সুশীল,

www.pathagar.com

অবৈধভাবে আয় উপার্জনকারী ব্যবসায়ী ধরা পড়েননি বা দুর্নীতির জন্য গ্রেফতার হননি। দুর্নীতির জন্য কোনো সরকারই সামরিক আমলাকে হাতকড়া লাগাতে পারেনি। বরং ওদের পিঠে ঘি মালিশ করেছে সব সরকারই; অথচ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ হচ্ছেন সামরিক- বেসামরিক আমলা ও রাজনীতিবিদরা। বাংলাদেশে রাজনীতি করতে হলে কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু গালাগালি করলে বা মারামারি করলে, পরবর্তীকালে এমপি-মন্ত্রী হওয়া যায়; যার ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে। যে যতো বড় গলাবাজি করতে পারবে বা পেশীশক্তি দেখাতে পারবে সে এ দেশের ততো বড় নেতা। রাজনীতিতে মেধার প্রতিযোগিতা নেই, দেশপ্রেম নেই, যোগ্যতার মাপকাঠি নেই। আছে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। আমরা যতোদিন পর্যন্ত এসব থেকে বের হতে না পারবো, ততোদিন জাতি ও জনগণ তার খেসারত দিতেই থাকবে। রাজনীতিবিদদের বাইরে যারা অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন তারাও রাজনীতিবিদদের ছত্রছায়ায় অবৈধ পথে গরীব মানুষের পয়সা মেরে বড় হয়েছেন অথবা ব্যাংকের অর্থ আত্মসাত করে বড় লোক হয়েছেন। অবৈধভাবে বড় হওয়া এই বড় বড় মানুষগুলো তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। নামী-দামী ও বিলাসবহুল গাড়ি রাস্তায় চালাচ্ছেন। ঋণ খেলাপীরা আজকাল প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উপদেষ্টা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে সামনে -পেছনে দু-একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা রাখেন, যাতে করে কেউ তাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। অবৈধ অর্থের জোরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রাস্তায় যতোই চিৎকার করুন না কেন প্রধান দুই দলের রাজনীতিবিদরাই নিজেদের স্বার্থের কারণে একে অন্যকে রক্ষা করেন। ধানমন্ডী, গুলশান, বারিধারা ও নতুন পুরাতন ডিওএইচএস বাসার মালিকদের জিজ্ঞেস করলেই পাওয়া যাবে এদেশের কোষাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস। অসৎ, লোভী, অযোগ্য এবং অথর্ব রাজনীতিবিদদের কারণেই আজ বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ক্ষত-বিক্ষত। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, জাতীয় আইডিকার্ড ও কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা তৈরি ও আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। বর্তমান জরুরী অবস্থাকে রাজনীতিবিদরা ভালোভাবে গ্রহণ না করলেও জনগণ গ্রহণ করেছে। প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টারা আন্তরিক হলে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বছর দুয়েক সময় লাগতে পারে। তাও ভালো; বর্তমান সরকার এনটিবায়োটিক সরকার। তাই বর্তমান সরকার বা সরকারের কোনো লোক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার জন্য ষড়যন্ত্র করলে জনগণ তা সহজে মেনে নিবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই সরকারের উচিত হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচিত

www.pathagar.com

সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেয়া। সেই সাথে নিজেদের পছন্দের লোকদের আইনের চোখে আড়াল না করে দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতালিপ্সু এবং ষড়যন্ত্রকারী রাজনীতিবিদদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এবং জনগণকে মনে রাখতে হবে, বর্তমানে যারা ক্ষমতায় সাময়িকভাবে থাকবেন তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা বা তাদের আত্মীয়-স্বজনরা আবারও যেনো অতীতের মতো লুটপাট শুরু না করে। সব শেষে বলতে ইচ্ছে করছে- আসলে আমরা কি গণতন্ত্রের জন্য যোগ্য? না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দিকে হাত বাড়াবো। এটা ভাববার সময় এখন। ■

www.pathagar.com

কিংবদন্তী ড: ইউনূসকে অভিনন্দন ও দেশবিরোধী ফেরিওয়ালাদের প্রতি নিন্দা

এক

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। কেননা অন্য দুই বাঙালির মতো তিনি নিউইয়র্কে বা আমেরিকায় বসে কাজ করেননি। প্রথমত কাজের ক্ষেত্র ছিল নিজ এলাকা-বিশ্বের কাছে অপরিচিত জোবরা নামক একটি গ্রামে। কাজের ধরন ছিল, সমাজে অবহেলিত নারী সমাজকে কিছু টাকা ধার দিয়ে তাদের জীবনের কিছুটা অংশের পরিবর্তন করা, ড. ইউনূস বাংলাদেশে থেকে, মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে গৃহিত কর্মসূচির সাফল্যের জন্যে এ পুরস্কার অর্জন করলেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, অর্থনীতিবিদ হয়ে তিনি শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন-এটাও তাঁর কর্মের বিচক্ষণতার জন্যে। আর এটা সকলেই জানি

www.pathagar.com

যে, অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের চেয়ে শান্তির জন্যে নোবেলের মর্যাদাও অনেক বেশি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, পুরস্কারটি একইসাথে গ্রামীণ ব্যাংককেও দেয়া হয়েছে। সবদিক মিলিয়ে গোটা বিশ্বে একটা অবিস্মরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করলেন আমাদের ড. ইউনূস।

বাংলাদেশ খরা, বন্যা, অভাব, দুর্নীতি সামরিক অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক অস্থিরতার দেশ-এটাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী ৩৫ বছরের ইতিহাস এবং এটাই ছিল বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচিত করার অন্যতম অবলম্বন। এছাড়া এই আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মিডিয়ায় বাংলাদেশের কোনো খবর প্রকাশ বা প্রচারিত হলে তার ভিত্তি হয়েছে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, সামরিক অভ্যুত্থান বা হরতাল-ধর্মঘট, সবশেষে সন্ত্রাসী চক্র। আসলে পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা বাংলাদেশের ভালো দিকগুলো উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্য বাংলাদেশের ভালো দিকগুলো বিশ্বের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে। বাংলাদেশ যে কি অপূর্ব সুন্দর দেশ, দেশটির মানুষ কতো নিরীহ ও ভালো, সবুজ শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত বাংলাদেশকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। বাংলাদেশকে ছোট করার জন্য দেশ-বিদেশে চক্রান্ত সবসময় হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। তেমনি একটি দরিদ্র দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্যে কর্মসংস্থানের যে ফর্মূলা বের করেছিলেন বাংলাদেশেরই একজন অর্থনীতিবিদ, সে ফর্মূলা বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহুদেশে ইতোমধ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে: মানবহিতৈষী রাষ্ট্র নায়কেরা সেই ফর্মূলাকে ধারণ করে গোটা বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের উপায় খুঁজছেন-এটাও কি একজন বাঙালি হিসেবে ড. ইউনূসের জন্যে কম গৌরবের ছিল। আজ বুকটা ভরে যায়, যখন দেখি আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় সবগুলো দৈনিক ও টিভি-রেডিওতে বাংলাদেশের নতুন পরিচিতি, নোবেল বিজয়ী দেশের পরিচিতি, বিশ্বকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের প্রশংসাবাক্য। সম্ভবত স্বাধীনতার পর গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবরই সর্বপ্রথম সবগুলো মিডিয়া বাংলাদেশকে নিয়ে পজিটিভ একটি রিপোর্ট করলো। এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের সকলকে প্রবাসে ও দেশে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার, বাঙালিদের এগিয়ে চলার পথিকৃত ড. ইউনূসও ঢাকায় চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির মিলনায়তনে উপচেপড়া বাংলাদেশী ও বিদেশী কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে এক সমাবেশে বলেছেন, '১৩ অক্টোবরের পর বাংলাদেশের নতুন পরিচিতি এসেছে। নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশ। আমরা আর আগের বাংলাদেশে নেই। আমরা নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের অধিবাসী। এই পরিচয়েই আমরা চলবো। এখন শুধু সামনে এগুনোর পালা'। ড. ইউনূসের আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বলেছেন, 'আমাকে যারা জড়িয়ে

www.pathagar.com

ধরছেন, তারা আসলে বাংলাদেশটাকেই জড়িয়ে ধরছেন। মানুষ এতো ভালবাসে বাংলাদেশকে। এতো দেশাত্মবোধ যে জাতির, সে জাতি অন্যের কাছ থেকে পিছিয়ে থাকবে এটা কী করে হয়?'

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রথম মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলন যখন হয়েছে, ওয়াশিংটন হোটেলে তখনই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বিশাল এই সৃজনশীল কর্মকান্ডের ব্যাপারটি আমার মতো অনেকে আঁচ করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী অথবা রাজা কিংবা রাণীসহ মানব কল্যাণে নিবেদিত ও পরীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটেছিল সে সম্মেলনে। গোটা বিশ্বের সেরা এনজিওগুলোর প্রধান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী/অর্থনীতিবিদগণসহ শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, কলামিস্ট সর্বোপরি আমেরিকার তৎকালীন ফার্স্টলেডি হিলারী ক্লিনটনও বক্তব্য রেখেছেন এবং ড. ইউনূসের যুগান্তকারী এই ধ্যান-ধারণার প্রশংসা করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে সংগঠিত করে দেশে দেশে দারিদ্র বিমোচনে তাকে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সে সম্মেলনে। সে সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আমিও ছিলাম। কিন্তু প্রতিটি ফোরামে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে যখন ড. ইউনূসের নাম উচ্চারিত হয়েছে তখনই নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে। গ্রামীণের পায়জামা-পাঞ্জাবীর উপর ফতোয়া পরিহিত সাদামাঠা একজন মানুষের প্রতি বিশ্বের নেতৃবৃন্দের এই আস্থা ও ভালবাসা যেন আমাকেও আপ্লুত করেছে। সে সময়েই অনুধাবন করেছি কি বিশাল একটি দায়িত্ব নিজে থেকে গ্রহণ করেছেন আমাদের ড. ইউনূস। প্রথম সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এসেছিলেন। এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, ড. ইউনূসের কারণে শেখ হাসিনাও বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিদের কাছে বেশ সম্মানিত ছিলেন। একদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, আরেকদিকে ড. ইউনূসের দেশের প্রধানমন্ত্রী-দুটি বিষয় শেখ হাসিনার গুরুত্বকে অপরিহার্য করেছিল গোটা সম্মেলনের কার্যক্রমে। পরের বছর প্রায় একই সময়ে মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্ক সিটির হিলটন হোটেলে। সেখানেও একজন সংবাদকর্মী হিসেবে যোগদানের সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাসই হতো না যে আগের বছরের চেয়ে অনেক বেশি লোকসমাগম ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এই সম্মেলনের গুরুত্বও অনেক বেড়েছে-তা মনে হয়েছে মার্কিন মিডিয়াগুলোর আগ্রহ দেখে। সিএনএন, নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট সেই সম্মেলনের নিউজকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত একটি কর্মসূচি বা মতোবাদ কীভাবে বিরাট একটি জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের অবলম্বন হয়েছে, সে বিষয়টি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিল শীর্ষ স্থানীয় মিডিয়াগুলো। মাইক্রো ক্রেডিট

www.pathagar.com

সম্মেলন এখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে। বেশ কয়েকটি দেশে ড. ইউনূসের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে দেড় কোটি দরিদ্রকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এমন কি নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের হারলেমেও। ভবিষ্যতে হয়ত অন্য কোথাও যেতে পারে।

ড. ইউনূসের এই মতোবাদের প্রতি বিশ্বের আরো কয়েকটি ফোরামের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এজন্যে জাতিসংঘ তাঁকে বিশেষ দূত নিযুক্ত করেছে। এ সম্মানটিও বাংলাদেশী হিসেবে আমাকে অভিভূত করেছে। উল্লেখ্য যে জাতিসংঘের শান্তির দূত হিসেবে আরেকজন বাংলাদেশী কাজ করছেন। তিনিও চট্টগ্রামেরই সন্তান এবং তাঁর নাম শ্রী চিন্ময়। শান্তির বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার ভক্তরা রয়েছে যাদেরকে তিনি বাংলা নাম দিয়েছেন। এমন কি তারা সবাই বাংলায় গানও গায়।

বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের পরিচিতি ব্যাপক হয়েছে শ্রী চিন্ময় ও ড. ইউনূসের কারণে। এসব পরিচিতিতে নয়া মাত্রা যোগ হয়েছে ২০০৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কর্তৃক 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ' আয়োজনের ঘটনাটি। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী সকল বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ক্লিনটনের ব্যক্তিগত উদ্যোগের এই সমাবেশে গোটা বিশ্বের সেরা অধ্যাপক, সেরা অভিনেতা, সেরা দাতা, মানবকর্মে পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব, নোবেল বিজয়ী, সেরা চিকিৎসক, সেরা প্রকৌশলী, শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, রাজনীতিকরা যোগদান করেন। বিশ্বের অবহেলিত জনপদের উন্নয়ন ও কল্যাণে এই সম্মেলনে যোগদানকারীরা অর্থ প্রদান ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অঙ্গিকার করেন। ২০০৬ সালের নিউইয়র্কের শেরাটন হোটেলে দেখেছি আমাদের গর্ব ড. ইউনূসের কদর। দারিদ্র বিমোচন ফোরামে ড. ইউনূসের মতবাদ আসছে- সে সময় উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম। সহস্রাধিক বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তির মাঝে ড. ইউনূস উপস্থাপন করছেন তার গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা। উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হয়ে তা শুনছেন এবং অভিভূত হচ্ছেন। করতালিতে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন ড. ইউনূসকে। অন্যদিকে আরও একজন বাঙালির কথা উচ্চারিত হয়েছে ক্লিনটনের গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ সেমিনারে-তিনি হলেন ব্র্যাক-এর প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ। এমন কি তিনি যে ২৫০ মিলিয়ন ডলার দান করবেন পরবর্তি কয়েক বছরে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগবে সেটাও গর্ব করার মতো বিষয় বৈকি। আমরা শুধু ভিক্ষা করি না, মাঝে মধ্যে অন্যকে দানও করে থাকি।

মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলন থেকে ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ-সকল স্থানেই উপস্থিত সকলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও ড. ইউনূস স্বদেশী কাউকে দেখলেই কথা

www.pathagar.com

বলেছেন প্রাণ খুলে। এতো বড় মাপের একজন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি সামান্য অহংবোধ। কখনো তিনি ভুলে যাননি নিজের দেশ, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির কথা। সুযোগ পেলেই বাংলাদেশের ইমেজকে কাজের মাধ্যমে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। আমরা যা কল্পনাও করতে পারিনি সেভাবে তিনি বাংলাদেশের সম্ভাবনাগুলোকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন, বাংলাদেশের প্রতি সমগ্র বিশ্বের আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। একটি মুহূর্তের জন্যেও নিজের দেশকে বা দেশের মানুষকে খাটো হতে দেননি। মাতৃভূমির জন্যে এমন আকুতি যদি বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী বা আপামর জনতার মধ্যে জাগরিত থাকতো, প্রতিটি নাগরিক যদি দেশের ইমেজকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর থাকি, তবে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে। এগিয়ে চলার ক্ষেত্রটিকে ড. ইউনূস আরো সুগম করে দিলেন। অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ কিংবদন্তী পুরুষ ড. ইউনূসকে। নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

দুই

একদিকে যেমন বাংলাদেশকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে আবার অন্যদিকে আমরাই নিজের দেশকে ছোট করার জন্য ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দেশী- বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। অতি সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় খবর দেখে বিস্মিত হয়েছি। আর এই সংবাদটি শুনলে বা পড়লে একজন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী হিসাবে সবাই বিস্মিত হবেন। খবরটি হলো- বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আবার নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। এবার হোমল্যান্ড আন্দোলন নামক একটি সংগঠন বাংলাদেশ ভেঙ্গে পৃথক রাষ্ট্র ও মানচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে তাদের তৎপরতা শুরু করেছে। এই তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বহুল আলোচিত কালিদাস বৈদ্য। প্রকাশিত খবরে আরো বলা হয় হোমল্যান্ড আন্দোলনের কর্মসূচিতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২৫টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভেঙ্গে পৃথক রাষ্ট্রের দাবিসহ 'নতুন বাংলা' নামে হোমল্যান্ড আন্দোলন পৃথক মানচিত্র প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, বরিশাল, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ভোলা, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জসহ ২৫ জেলাকে এই সংগঠন তাদের স্বপ্নের পৃথক রাষ্ট্র নতুন বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়,

www.pathagar.com

নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোতে হিন্দু শরণার্থীদের পৃথক হোমল্যান্ডের দাবি প্রচারের যে আন্দোলন করছে তাতে মদদ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডায় অবস্থানকারী কিছু স্বঘোষিত (যারা বিদেশে এসে ইতিমধ্যে তাদের খোলস পাল্টিয়েছেন) বাঙালি হিন্দু নেতা। দীর্ঘদিন ধরেই এই তিন রাষ্ট্রে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যক বাঙালি হিন্দু নেতা হোমল্যান্ড প্রচার আন্দোলনের জন্য অর্থের যোগান দিচ্ছেন। বঙ্গসেনা, বিএলও, বিএফও, এলটিবি এর বাংলাদেশ বিরোধী প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর যে তালিকা রয়েছে তার প্রথমেই রয়েছে ড. কালিদাস বৈদ্য ও তার কলকাতাস্থ ১৬৯ গোরফা মেইন রোড, রামলাল বাজার, যাদবপুর হেডকোয়ার্টারের ঠিকানা। আরো রয়েছে চব্বিশ পরগনার লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ, নিখিল বাংলা নাগরিক সংস্থা, বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংস্থা, সংযুক্ত উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ ও গভর্নমেন্ট অব হিন্দু রিপাবলিক। বাংলাদেশ বিরোধী এই জঙ্গী সংগঠনগুলোর ক্যাম্পগুলো রয়েছে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে। এই সংগঠনগুলোর অবস্থান হচ্ছে- পশ্চিম কুঠরি পাড়া ক্যাম্প, কাপালিপাড়া ক্যাম্প, যশইকুঠি উত্তর চব্বিশ পরগণা, মাগুরাখালি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ক্যাম্প, বিজিতপুর ক্যাম্প বশিরহাট, গন্ধর্বপুর ক্যাম্প বশিরহাট, বাদুরিয়া ক্যাম্প ও উত্তর কুঠরিপাড়া ক্যাম্প উত্তর চব্বিশ পরগনা। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের সংগঠন রয়েছে ৯টি, স্বাধীন বঙ্গভূমি সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে ৪টি এবং বাংলাদেশ বিরোধী ক্যাম্প রয়েছে ৯০ টি। এই ধরনের সংবাদ এর আগেও প্রকাশ করা হয়েছে।' প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে এই সংগঠনগুলো তাদের প্রচারাভিযান চালায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে এই তৎপরতা কিছুটা স্তিমিত হলেও বিএনপি এবং চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এই তৎপরতা আবারো বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় এই সব সংগঠনের পাশাপাশি দেশে ক্ষমতায় যেতে না পেরে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং দেশের বাইরে তাদের বিশেষ প্রতিনিধিরা বিভিন্ন লেবাসে নামসর্বস্ব সংগঠন রেজিষ্ট্রেশন করে বাংলাদেশকে তালেবানী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে। তাদের স্বপ্ন হলো বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভাই কান খুলে শুনুন– আমাদের সব ধর্মের মানুষকেই তো বাংলাদেশে থাকতে হবে, তাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই আপনাদের তো কোনো ধরনের অসুবিধে হলে লাফ দিয়ে অন্যত্র যাবার জায়গা আছে। অন্যদিকে আপনারা তো বাংলাদেশের খেয়েপরে মানুষ হয়ে মার সাথেই গাদ্দারী করে চলেছেন। প্রয়োজনে লাফ দিয়ে প্রতিবেশী দেশ বা আটলান্টিকের এই পাড়ে চলে আসতে পারেন। কিন্তু আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই- আপনাদের তালেবানী স্বপ্ন কোনো দিন বাংলাদেশে

www.pathagar.com

বাস্তবায়িত হবে না। কারণ বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ ২৮ কোটি হাত দিয়ে তা প্রতিহত করবে। বাংলাদেশ বিরোধী শক্তির সাথে রয়েছে ভারতে অবস্থিত মাতৃভূমির অস্তিত্ব বিনাশী সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এবং তাদের অর্থায়নে পরিচালিত বাংলাদেশ হিন্দু- বৌদ্ধ- খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ। বাংলাদেশের বাইরে আওয়ামী লীগের মদদে আওয়ামী লীগের সদস্যরা বিভিন্ন নামে সংগঠন রেজিস্ট্রেশন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য বাংলাদেশের অস্তিত্বকে, সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে। একমাত্র আওয়ামী লীগের প্রেসক্রিপশন এবং নীল নকশাকে বাস্তবায়ন করতে গিয়েই তারা বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ঐসব দেশদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে কয়েকবছর পূর্বে একবার শেখ হাসিনা নিজেই বলেছিলেন 'দুই নৌকায় পা দিয়ে লাভ নেই। আগে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করুন'। টাকার জোরে এবং চাঁদা তুলে অভিজাত হোটেলের বল রুমে সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ এবং বিদেশ থেকে বুদ্ধিজীবী নামধারী ফেরিওয়ালাদের ভাড়া করে এনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বুদ্ধিজীবী নামধারী বুদ্ধিহীন এই সব ফেরিওয়ালারা অর্থের বিনিময়ে বিদেশে এসে অন্যদেশের এসাইনমেন্ট পালন করার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকেন। সেই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের মতো ফেরিওয়ালাদের সাথে সখ্য গড়ে তুলেন এবং তাদেরকে কোরামিন ওষুধের মতো অন্যদের নিকট বিক্রি করে থাকেন। দুই একজন সাদা চামড়ার লোককে বলে-কয়ে অনুষ্ঠানে এনে বসাতে পারলে এবং তাদের সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারলেই আয়োজকরা নিজেদের সার্থক ভাবেন। ফেরিওয়ালারা বিএনপির কাজের সমালোচনা করেন তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বিএনপির সমালোচনা করতে গিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের সর্বনাশ করছেন। ভাবতেই কেমন লাগে, অর্থ দিয়ে, টিকেট দিয়ে ভাড়া করে এনে বিদেশীদের কাছে স্বাধীন- সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও মিথ্যা তথ্য তুলে ধরছে এরা অহরহই। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নালিশ করছে বিদেশী ফেরিওয়ালাদের কাছে। এই ধরনের জঘণ্য মনোবৃত্তি সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র দেশ বাংলাদেশের কিছু মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ঐ সব বাঙালিকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট এক বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে শয়তান বলে গালি দিয়েছিলেন, এতে ডেমক্র্যাটিক দলের লোকজন খুশি হননি। বরং ডেমক্র্যাটিক দলের অনেক নেতা তাদের দেশের প্রেসিডেন্টকে গালি দেয়ার জন্য নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের এই সব রাষ্ট্রদ্রোহী বাংলাদেশকে তালেবানী রাষ্ট্রে পরিণত করতে

www.pathagar.com

চায়। কলকাতার বিদেশী কালিদাস বৈদ্যদের পাশাপাশি প্রবাসেও কালিদাস বৈদ্যদের দেশবিরোধী কার্যক্রম চলছে। বিশেষ করে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলেই তাদের দেশবিরোধী বিভিন্ন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। যারা প্রবাসে বসে বিজেপির প্রতিনিধি (মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান) সেজে বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি করছে, বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে তারা আসলেই কেউ বাংলাদেশী নয় এবং বাংলাদেশে তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই। কোন এক সময় ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে তাদের জন্ম হয়তো হয়েছিলো। তারা বর্তমানে বাংলাদেশকে ভাল না বেসে প্রতিবেশী দেশকে ভালোবাসছে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে কেউ শান্তিতে থাকুক প্রতিবেশী রাষ্ট্র তা চায় না। আর যারা ঐক্য পরিষদের নামে বাংলাদেশে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চান তারাও বাংলাদেশের নাগরিক নন। এছাড়া অনেক আগেই এদের আত্মীয়- স্বজনরা বাংলাদেশ থেকে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে স্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়েছেন। প্রবাস থেকে তারা ঐ দেশেই অর্থ পাঠাচ্ছেন– আর সর্বনাশ করছেন বাংলাদেশের। তাদের একমাত্র টার্গেট হচ্ছে আমরা যেহেতু বাংলাদেশে থাকি না এবং আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই, সেহেতু বাংলাদেশে কাউকে সম্প্রীতির মধ্যে থাকতে দেবো না। এখন যে দেশে আমাদের ব্যবসা- বাণিজ্য রয়েছে এবং আত্মীয়-স্বজনের বসবাস করছে আমরা সেই দেশের সাম্প্রদায়িক দল বিজেপির স্বার্থ সংরক্ষণ করবো। এশিয়ার মধ্যে ভারতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিলো, বাংলাদেশে নয়। মূলত বিজেপির অর্থে লালিত-পালিত গৃহপালিতরা এই প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অহর্নিশ অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং বাজ পাখির মতো বাংলাদেশের মানচিত্র খামছে ধরার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে মরিয়া এক শ্রেণীর কথাকথিত দেশপ্রেমিক জঙ্গী আওয়ামী লীগারও বিদেশে সেমিনার করে ভিনদেশীদের সামনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা রটিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাল্পনিক এবং মিথ্যা বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করে বাংলাদেশকে নগ্নভাবে উপস্থাপনের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একজন দেশপ্রেমিক কি করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন? তারা কী আসলে দেশপ্রেমিক না দেশদ্রোহী সেই বিচারের দায়ভার সদাশয় পাঠক ও সদ্বিবেচক দেশপ্রেমিক জনগণের উপরই ন্যস্ত করছি? ■

www.pathagar.com

রাজনীতির দুষ্ট বলয় থেকে খেলাধুলাকে মুক্ত করতে হবে

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির দুষ্টবলয়ের মধ্যে হাবুডুর খাচ্ছে। রাজনীতির এই দুষ্ট বলয়টি বাংলাদেশের খেলাধুলাকে ধীরে ধীরে ক্যান্সারের মতো গ্রাস করে ফেলেছে। আমরা সবাই জানি এ ব্যাধির শেষ পরিণতি কী? সেই ভয়াবহ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের খেলাধুলা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও পচন ধরেছে। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রও চর দখলের মতো দখলদার বাহিনীর হাতে চলে যায়। আর স্বার্থান্বেষী

www.pathagar.com

মহলও ওঁৎ পেতে বসে থাকে সরকার পরিবর্তনের অপেক্ষায়। সুযোগ বুঝেই তারা অসৎ স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে জেঁকে বসে বাংলাদেশের ফেডারেশনগুলোতে- আর স্বার্থ উদ্ধারের মনস্কামনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার পদলেহন শুরু করে। তেলমারা ও পদলেহনের পুরস্কার স্বরূপ যোগ্যতা না থাকলেও তারা অলিম্পিক এসোসিয়েশন, বিভিন্ন ফেডারেশনসহ সকল ক্রীড়া সংগঠনগুলোর কর্তা-ব্যক্তিতে পরিণত হন দলীয় অহি নাজিলের মাধ্যমে। ক্ষমতার মসনদে তথাকথিত রাজপুত্র বনে গিয়ে তারা প্রথমে শুরু করেন সুদে আসলে নিজের পাওনা আদায়ে। খেলাধুলার উন্নয়ন তাদের কর্মসূচির মধ্যে স্থান পায় না, বরং স্থান পায় কীভাবে নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন করা যায়। এর ফলে দেখা যায় তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হচ্ছে ঠিকই, খেলোয়াড় বা খেলাধুলার উন্নয়ন হচ্ছে না। কখনও খেলোয়াড়দের করুণ আকুতি তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না; তাদের কানে সারাক্ষণ ঝংকার তোলে নিজের এবং দলের স্বার্থ। ক্ষমতা পেয়েই চিন্তা করে এটাই আমার আলাদীনের চেরাগ বা ভাগ্য পরিবর্তনের চাবি। সুতরাং বসে থেকে লাভ কি, যা পাও তাই চেটে চুটে খেয়ে নাও; গোল্লায় যাক খেলাধুলা, গোল্লায় যাক দেশ–তাতে আমার কী?

জ্ঞান থাক আর নাই থাক, আজ পর্যন্ত যারা এনএসসিবি ও অলিম্পিক এসোসিয়েশনের দায়িত্বে ছিলেন তাদের অধিকাংশের কর্মকান্ডে মনে হয়েছে খেলাধুলা বা খেলোয়াড়দের স্বার্থের চেয়ে তারা সব সময়ই নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন। দুষ্ট রাজনীতি করে বা জোর করে তারা ঐসব পদ দখল করেছেন। খেলাধুলার উন্নয়নের পরিবর্তে কি ভাবে নিজেরা বড় হবেন বা অবৈধভাবে টাকা হাতড়ে নিবেন তা নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন কি বিদেশ যাওয়ার ধান্দায় মগ্ন ঐ সব কর্মকর্তা সর্বদা বিদেশে পাড়ি দেয়ার পথ খুঁজে বেড়ান। একটি কথা দিবালোকের মতো সত্য যে ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যে কারণে খেলোয়াড়রা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। অনেক ক্ষমতালিপ্সু, নোংরা মন-মানাসিকতাসম্পন্ন অযোগ্য অনেক কর্মকর্তার রোষানলে পড়ে বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উজ্জ্বল তারকা রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে শুধু ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে নয়, দেশ থেকেও স্বেচ্ছায় প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছেন। অথচ ছোট বেলা থেকেই তারা লালন করে আসতেন একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হওয়ার স্বপ্ন, দেশ সেবার স্বপ্ন। তাদের সেই স্বপ্নকে গলাটিপে হত্যা করেছেন তথাকথিত কর্মকর্তারা যারা চাটুকারিতায় ছিলেন পারদর্শী। তাদের চাটুকারিতার দাপটে নির্বাসিত হয়েছে প্রকৃত ক্রীড়াবিদ এবং খেলোয়াড়দের স্বপ্নগুলো। দেশে স্বপ্ন দেখানো লোকের আজকাল বড় অভাব। সাধারণ ছাত্ররা আর স্বপ্ন দেখেন না খেলাধুলাকে নিজেদের পেশা হিসেবে নেয়ার। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, বিভিন্ন সময় খেলাধুলার সাথে সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

কয়েকজন ক্রীড়াবিদও কর্মকর্তা মনোনীত হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন দায়িত্ব। তাদের সুযোগ ছিলো খেলাধুলার মান উন্নয়ন করার। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখলাম, যেমন লাউ তেমনি কদু। লোকের পরিবর্তন হয়েছে সত্যি ,পরিবর্তন হয়নি মনমানসিকতার ফেডারেশন ও খেলোয়াড়দের ভাগ্য। তাদের অবস্থা হয়েছে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো। কারণ তারাও দায়িত্ব পেয়ে খেলোয়াড়দের স্বার্থ দেখেননি, দেখেছেন নিজেদের স্বার্থ, আকড়ে ধরেছেন পুরোনো জীর্ণ প্রথা। কথায় বলে যে যায় লংকা সেই হয় রাবণ। খেলোয়াড়দের স্বার্থের পরিবর্তে তারাও নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমরা সব সময় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে। যে কারণে কখনো বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের কাঙ্খিত পরিবর্তন হয়নি। তাই অধঃপতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। অথচ বিদেশের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই। দেখতে পাই একজন খেলোয়াড়ের মূল্যায়ন তারা কীভাবে করছে। একজন খেলোয়াড় জাতির জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য মডেল হিসেবে কাজ করছেন। বিদেশীরা যেখানে একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে জাতির মাথার মুকুট বানায়, সেখানে আমরা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিক্ষেপ করি আস্তাকুড়ে। খেলোয়াড়রা বাংলাদেশে যতোদিন ভালো খেলতে পারবে ততোদিন পাবে শুকনা হাততালি আর বাহ্‌বা। তারপর তাদের অনাহারক্লিষ্ট ও অসম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে হয়। তাদের খোঁজ খবর কেউ রাখে না। যে কারণে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ এখন আর আগের মতো খেলাধুলার দিকে ঝুঁকছে না। সবাই এখন ঝুঁকছে লেখাপড়া আর বিদেশ পাড়ির দিকে। কারণ তারা স্বচ্ছ আয়নায় দেখতে পাচ্ছে খেলাধুলার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এমনকি মা বাবারাও ভবিষ্যত অন্ধকার দেখে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখেন। অথচ উন্নত দেশে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি হতে হলে এক্সট্রা কারিকুলাম থাকা দরকার। খেলাধুলার মতো অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকলে ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়। অতিরিক্ত যোগ্যতা না থাকলে ভালো ছাত্র হলেও ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় না। উন্নত দেশে বাবা-মারা ছেলে-মেয়েদের খেলোয়াড় হিসাবে দেখতে চান। মা-বাবারা মাঠে বসে তাদেরকে উৎসাহিত করে থাকেন। আর আমাদের দেশে সব উল্টা। কাজেই বাংলাদেশে খেলোয়াড়রা আগের মতো ধুকে ধুকে মরতে চায় না। অযোগ্য লোকজন যে বাংলাদেশের খেলাধুলার বারটা বাজিয়ে ছেড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আগে এক সময় দেখা যেত সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসতে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যেমন বিভিন্ন টেক্সটাইল মিল, জুটমিল, বিজেএমসি, বিটিএমসি, আনসার ও বিমানসহ অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান খেলোয়াড়দের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতো। বর্তমানে দু-একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া খেলাধুলার

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতা কেউ এগিয়ে আসে না। বা প্রয়োজন মনে করেন না। কারণ ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সামাজিক দায়িত্ব নেই। তারা শুধু জনগণকে চুষে বড় হয়। যার কারণে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে নিম্ন পর্যায়ের প্রতিটি জায়গায় অসুস্থ লোক জেঁকে বসে আছে। এখন সেই দৃশ্য আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে।

অথর্ব কর্মকর্তাদের বা দলীয় সেবাদাসদের দাসত্বের কারণে খেলাধুলা ও খেলোয়াড়দের রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করার হীন মানসিকতা চলছে। এমনকি খেলাধুলার ফলাফলকেও রাজনীতির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জঘন্য মানসিকতা কখনও কখনও লক্ষ করা যাচ্ছে। শুধু কি তাই? পুরস্কারের ক্ষেত্রেও সেই একই চরিত্র ভেসে উঠেছে। যারা পদলেহনকারী, দলীয় মদদপুষ্ট, দলীয় ক্যাডার বা সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তারাই খেলাধুলার ক্ষেত্রে সচরাচর পুরস্কার পাচ্ছে। প্রকৃত খেলোয়াড় যিনি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে জাতির জন্য গৌরব এনে দিয়েছেন, তাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে না। কারণ তিনি রাজনীতি করেন না বা পদলেহনে অভ্যস্ত নন বা নিজের ন্যায্য অধিকার অর্জনের জন্য কারো শরণাপন্ন হননা। যারা কর্মকর্তা, কর্মকর্তার স্ত্রীকে খুশি করতে পারছেন তারাই জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন বলে বাজারে জনশ্রুতি রয়েছে। যারা সেটা করতে পারছেন না তারা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। অথচ আমরা সবাই জানি খেলাধুলা রাজনীতির প্রভাবমুক্ত চিত্তবিনোদনের খোরাক ও জাতীয় ঐতিহ্য তুলে ধরার অন্যতম শক্তিশালী বাহন। খেলোয়াড় বা পুরস্কার নির্বাচনে বিচারের দায়িত্বে থাকেন অনেকাংশেই অযোগ্যরা। যোগ্যদের মর্যাদা বোঝা বা জানার কথাতো তাদের নয়।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ তারা খেলাধুলার উন্নয়নে যা লেখা প্রয়োজন তা লিখছেন না। যা নিয়ে সমালোচনা করার দরকার নেই তারা বরং তা নিয়েই লিখছেন। এটা তাদের সীমাবদ্ধতা না ইচ্ছাকৃত কে জানে। ক্রীড়ার উন্নয়নে ক্রীড়া সাংবাদিকতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লেখার পূর্বে একজন ক্রীড়া সাংবাদিককে অনেক টেকনিক্যাল জিনিস জানতে হয়। সাংবাদিকরা একজন ছোট খেলোয়াড়কে লেখার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বড় ক্রীড়াবিদ তেরি করে দিতে পারেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতা আর সাধারণ ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা করা এক নয়। উন্নত বিশ্বে ক্রীড়া সাংবাদিকরা সাধারণ সাংবাদিকদের চেয়ে এগিয়ে মর্যাদা ও পেশার ক্ষেত্রে।

জানা গেছে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের এ্যাথলেটরা নাকি যাযাববের মতো দিনাতিপাত করছেন। কারণ তাদের অবস্থাও হোমলেসদের মতো। বহু ঘটনার

www.pathagar.com

পর, অনেক দর কষাকষির পর এ্যাথলেটদের স্থান দেয়া হয়েছিলো মিরপুর জাতীয় স্টেডিয়ামে। একটি স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে নাকি তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কোথাও তাদের অবস্থান নেই। আমাদের প্রশ্ন হলো কার স্বার্থে, কোন রাঘব বোয়ালের ইশারায় এ্যাথলেটদের মিরপুর থেকে বের করে ঘর ছাড়া করা হলো? এ রাজনীতি কতোদিন চলবে? এমনিতেই নানাভাবে এ্যাথলেটরা নিগৃহীত। নানাজনের রাজনীতির শিকার তারা। না ঘর কা না ঘাটকা এমন অবস্থা যদি হয় এ্যাথলেটদের, সেক্ষেত্রে ক্রীড়ার উন্নতি হবে কী করে!

বাংলাদেশের খেলাধুলার উন্নয়নে প্রয়োজন সুস্পষ্ট রূপরেখা। যে রূপরেখার উপর ভিত্তি করে রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সারাদেশে খেলাধুলা বোঝার মতো দুই একজন শিক্ষিত লোক ছাড়া আর কোনো লোকই নেই। তবে ভাসাভাসা জ্ঞানসম্পন্ন লোক যথেষ্ট রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের খয়েরখাঁদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে, অথবা দলীয় ক্যাডারদের দায়িত্ব দিয়ে আর যাই হোক খেলাধুলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। খেলাধুলার উন্নয়ন করতে হলে যারা ছোট বেলা থেকেই ক্রীড়াঙ্গনের সাথে জড়িত, খেলাধুলা বোঝেন, লেখাপড়া আছে এবং খেলাধুলার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা আছে তাদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে। যোগ্যতা থাক আর না থাক বড় কর্মকর্তারা খেলাধুলা সম্পর্কে কিছু না জেনে সন্ধ্যায় কেতাব পড়ে মুখে বুলি আওড়াবেন, সকাল-সন্ধ্যা চা খাবেন আর পদ আঁকড়ে রাখবেন -এ ধরনের মানসিকতা পরিহার করা আবশ্যক। এমন সব কর্মকর্তার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে যারা একে পেশা হিসেবে নেবেন এবং পেশার উন্নয়নে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন। সেই সাথে অশুভ রাজনীতি, সন্ত্রাসের কবলে জড়িয়ে পড়া যুব সমাজকে খেলাধুলার উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ মনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে খেলাধুলা; আর খেলাধুলার উন্নয়নে প্রয়োজন একজন ভিশনারী বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুস্থ মানুষ। জাতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা অসুস্থতার পরিচয় দিচ্ছি। সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধুলা, বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা, আচার-আচরণ, ন্যায়বিচার অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় বিদ্যমান। ভাবনা চিন্তায় থাকা অসুস্থ তাদের সংখ্যা দেশে প্রচুর। দেশে অসুস্থ মানুষের পরিবর্তে সুস্থ মানুষ তৈরি করতে পারলে জাতি লাভবান হবে। খেলাধুলার ফলাফল নিয়ে অসৎ রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। বিদেশ থেকে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের গৌরব অর্জন কোনো সরকারের একক কৃতিত্ব নয়, তারা বরং নিজেদের যোগ্যতার বলেই সম্মান অর্জন করেন। বাচ্চারা এখন মাঠে দৌড়াদৌড়ির পরিবর্তে এপার্টমেন্টের ভিতরে বড় হচ্ছে। আরো দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের খেলাধুলার মাঠগুলো এখন মাস্তান বা বক্তৃতাবাজদের দখলে চলে গেছে। খেলার মাঠ রাজনীতির মাঠে পরিণত হয়েছে। এরও অবসান

www.pathagar.com

দরকার। সেই সাথে প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলার নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ডিগ্রির মতো শারীরিক শিক্ষার ওপর কোর্স প্রবর্তন করতে হবে; শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি বেশি করে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করতে হবে। দেশের আনাচ-কানাচ থেকে ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের জাতীয়ভাবে ভরণ পোষণ এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। অলস যুব সমাজকে যদি ক্রীড়ামুখী করা যায় তাহলে হয়তো অন্ধ ধ্বংসাত্মক রাজনীতি প্রীতি কিছুটা কমবে। জাতিকে সুস্থ করতে হলে খেলাধুলার বিকল্প নেই। দেশে সুস্থ মানুষ তৈরি হলে অসুস্থতার কিছুটা লাগব হবে। তবেই যদি ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যন্ধ্যাত্ব ঘোঁচে। ■

www.pathagar.com

ইরাক ধ্বংসের দায়িত্ব কে নেবে? দোষীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কি আদৌ সম্ভব?

প্রেসিডেন্ট বুশের সদম্ভ ঘোষণা ছিল ইরাক যুদ্ধ শেষ হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি আসলে কি তাই? দিন দিন ইরাক পরিস্থিতি ভয়াবহ থেকে অধিকতর ভয়াবহের দিকে মোড় নিচ্ছে। এমন কোনো দিন নেই ইরাক পক্ষের কিংবা বিপক্ষের লোক মারা যাচ্ছে না। উভয়পক্ষের যারা মারা যাচ্ছে তারা জানে না তাদের অপরাধ কি? কেউ জানে না কে কার শত্রু। একদল দেশরক্ষার জন্য পৃথিবীর সুপার পাওয়ারের সাথে যুদ্ধ করছে। অন্যদল বিনা অনুমতিতে অন্যের দেশ দখল করে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। আমরা মানবগোষ্ঠী নিজেদের যতোই সুসভ্য জাতি হিসেবে ঢাক ঢোল পিটাই না কেন, মূলত আমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

আজও পশুত্বের রাহুমুক্তি ঘটেনি এবং প্রকৃত সভ্যতারও উত্তরণ ঘটেনি। আমরা মুখে গণতন্ত্রের খৈ ফুটালেও নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করি না। এমন কি আমাদের কাজ-কর্ম এবং জীবনাচরণেও তার প্রতিফলন ঘটে না। নিজেদের দেশে গণতন্ত্র চর্চা করে অন্যের গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে নগ্ন হস্তক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র বাধেনা। বড় দেশগুলো সবসময় নিজেদের স্বার্থে ক্ষুদ্র দেশগুলোর সংস্কৃতি, ধর্ম ও উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে থাকে। তারা অন্যদেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেনা। বিশ্বের বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলো দুর্বলের উপর অবৈধভাবে অযাচিত কর্তৃত্ব করতে চায় বলেই অনেক সময় পৃথিবীতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের পশুত্ব মাঝে মাঝে এতোই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে জগতে সবল ও দুর্বলের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে গোটা বিশ্বজুড়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলছে। বিশ্বের স্বঘোষিত ত্রাণকর্তার দাবীদার ও সুসভ্যরাই বাস্তবে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোকে গিলে ফেলতে চায়। অন্যদিকে ছোট দেশগুলো চায় স্বাধীনভাবে আত্মসম্মান নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। এই আগ্রাসন ও অস্তিত্ব টিকে রাখা ও বেঁচে থাকার অধিকারের যুদ্ধ আজীবন চলতে থাকবে। তাই এশিয়া বলুন, ইউরোপ বলুন, মধ্যপ্রাচ্য বলুন, দেশে অথবা কম্যুনিটি বলুন, কিংবা আফ্রিকা বলুন - সর্বত্রই অশান্তি ও অনাসৃষ্টির লু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। অথচ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জটিল ও ভয়াবহ সমস্যাগুলোর শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধান ঘটেছে যুদ্ধ-বিগ্রহ,আগ্রাসন বা কর্তৃত্ব জাহিরের মাধ্যমে নয় বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই। ছোট রাষ্ট্রগুলোর প্রতি বড় ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। সমৃদ্ধশালী ও পারমাণবিক শক্তির অধীশ্বর দেশগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে ছোট রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ন্যায় ও শোভনীয় আচরণ নিশ্চিত করা, তাদেরকে বৈষম্যমূলক আচরণের কবল থেকে রক্ষা করা। লোভ-লালসা; প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা ও অন্যের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপের পরিবর্তে আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে। ধর্ম-বর্ণ- গোষ্ঠী, দেশ ও দেশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে সাম্যবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে পৃথিবীকে অনেক অনাকাঙ্খিত সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। শুধু ইরাক কেন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে অকারণে মানুষের প্রাণহানির ঘটনা যে কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষকে সজোরে নাড়া দেয়। তাই মানসিক তাড়না থেকেই ইরাকের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা ও লাখ লাখ লোকের প্রাণহানির ঘটনার পেছনের কিছু ইতিহাস সচেতন পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। লোভ-লালসার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে যতোক্ষণ না মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হবে, ততোদিন পৃথিবীতে দুর্বলের ওপর সবলের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও অন্যান্য অপকর্ম চলতে থাকবে। সম্প্রতি হঠাৎ করে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাদ্দামের

www.pathagar.com

মৃত্যুদন্ড কার্যকরের ঘোষণা এলো। সাদ্দাম হোসেন অন্যায় করলে অবশ্যই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড হয়ত যে কোনো সময় কার্যকর হতে পারে। অবশ্য ইতোপূর্বে আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঠিক কড়া নাড়ার মুহূর্তে সাদ্দাম হোসেন, তার সৎ ভাই ও সাবেক গোয়েন্দা প্রধান বারজান আল তিকরিতি ও সাবেক প্রধান বিচারক আওয়াদ হামিদ আল বন্দরকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর কয়েকজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদানের রায় ঘোষণার পূর্বে ইরাকে সশস্ত্র বাহিনীর ছুটি বাতিলসহ কয়েকটি এলাকায় সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল। নিয়মতান্ত্রিকভাবে বা প্রচলিত আইনানুসারে যদি তাদের বিচারকার্য সম্পন্ন হত তাহলে হয়তো কথা বলার কিছু থাকতো না। বিচার সম্পর্কে তখন সাদ্দামের প্রধান আইনজীবীর বক্তব্য ছিল এই রকম– বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে যেমন ভেতরের কাহিনী সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায় ঠিক তেমনি সাদ্দামের বিচারের রায় ঘোষণার পূর্বেই কর্তৃপক্ষের গৃহিত ব্যাপক প্রস্তুতি থেকেই মামলার রায় সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। অনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তড়িঘড়ি বিচারকার্য সমাধা করা হয়েছিল। তবে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন সাদ্দামের বিচার থেকে বুশ প্রশাসন তেমন লাভবান হতে পারেনি। সাধারণ জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাধর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে পদত্যাগ করতে হল। আরও হয়তো অনেকেই অপেক্ষা করছেন পদত্যাগের জন্য। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বুশের রিপাবলিকান দলের অনেকটা ভরাডুবি হয়েছে। দীর্ঘ সময় পর কংগ্রেস এবং সিনেট উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাত ছাড়া হয়ে গেছে। সে যাহোক, সাদ্দাম এবং অন্যান্যদের বিচার প্রক্রিয়া ও মৃত্যুদণ্ডাদেশের জটিল প্রক্রিয়ার পোস্টমর্টেম বা এই জটিল সমীকরণ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। শুধু বাস্তবতার পটভূমিতে অতীত ইতিহাসের দু-একটি ঘটনার উদ্ধৃতিই এখানে উপস্থাপন করা হলঃ

খ্রিস্টের জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে স্বীয় প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বদৌলতে তৎকালীন বিশ্বে যুগান্তকারী আলোড়নের ঢেউ তুলেছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। ভাস্কর পুত্র কদাকার-কুৎসিত সক্রেটিসের দার্শনিক তত্ত্ব ও শাণিত যুক্তিতে প্রলুব্ধ হয়ে যুব সমাজ বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো তার চারদিকে ভীড় জমাতে লাগলো। ক্ষমতার মোহাবিষ্ট, অজ্ঞতার বাহুবন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ও স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠী সক্রেটিসের এহেন জনপ্রিয়তায় এতই তটস্থ হয়ে পড়লো যে অবশেষে তারা তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা ও যুব সমাজকে বিপথগামী করার অভিযোগ উঠাল। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করে হেমলক

www.pathagar.com

বিষপানে মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রদান করা হলো। বিজ্ঞ বিচারকদের উদ্দেশ্যে সক্রেটিসের শেষ বক্তব্য ছিল– দ্য আওয়ার অব ডিপারচার হ্যাজ অ্যারাইভড। উই গো আওয়ার ওয়েজ– আই টু ডাই, ইউ টুলিভ হুইচ ইজ বেটার অনলী গড নুজ। মৃত্যুর দন্ডাদেশ প্রদানের পর কারাপ্রকৌষ্ঠে সহচর পরিবেষ্টিত সক্রেটিস আলাপ আলোচনার এক ফাঁকে হেমলক পান করলেন এবং অস্তগামী সূর্যের মতো আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। প্রাণপ্রিয় শিক্ষকের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার করুণ দৃশ্য অবলোকনে সকৃতজ্ঞ শিষ্যগণ বুক চাপড়ে আহাজারি শুরু করলো। সক্রেটিস তাদের শান্ত হবার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'আমি বেঁচে আছি বলেই মরতে যাচ্ছি। মৃত ব্যক্তি ত পুনরায় মরতে পারে না।' সক্রেটিসের মৃত্যুর ২ বছরের মাথায় নিয়তির নির্মম বিধানে গ্রীসের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তনের ঢেউ নেমে এলো। সেই ঢেউয়ের প্রচন্ড তরঙ্গাভিঘাতে ক্ষমতাসীনদের সুরক্ষিত হর্মে ব্যাপক চিড় ধরলো। ফলে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীদের কয়েকজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো এবং অনেককে গ্রীস থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে গ্রীকবাসী তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো। অন্যদিকে ধর্মদ্রোহিতা ও যুব সমাজকে বিপথগামী করার মিথ্যা অপরাধে যাকে মাত্র ২ বছর আগে মৃত্যু দণ্ডিত করা হয়েছিল তারই সম্মানে তৈরি করা হলো বোঞ্জের প্রতিকৃতি।

সাদ্দামের বিচারের প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যায় -১৯৮২ সালে শিয়া অধ্যুষিত দুজাইল শহরে শিয়া সম্প্রদায়ের ১৪৮ জন বেসামরিক লোককে হত্যার নির্দেশ প্রদানের অভিযোগেই সাদ্দাম ও তার সহযোগীদের দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন ইরাকী উচ্চ ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক রউফ রশিদ আবদেল রহমান। মূলত সাদ্দামকে গতিচ্যুত করার ব্যর্থ অভ্যুত্থানের জের ধরেই দুজাইল হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মুসলিম বিশ্বে শিয়া-সুন্নী মতবাদের উদ্ভবের কাহিনীও অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মতোই চকিতে হাজির হয়। আমাদের জানা মতে শিয়া এবং সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক কোনো বিধি-বিধান নিয়ে মতভেদ নেই। উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী; সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী (সঃ)কে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে উভয় সম্প্রদায়ই কায়োমনোবাক্যে স্বীকার করেন। শিয়া মতবাদের অনুসারিগণ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি অতিমাত্রায় সম্মানপ্রদর্শন করতে গিয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ), দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এবং তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)কে কিছুটা খাটো করে দেখেন। অন্যদিকে সুন্নী মুসলমানগণ ইসলামের সকল খলিফাকেই সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রমাণ মিলে- ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে শিয়া-

www.pathagar.com

সুন্নীর মধ্যে মতপার্তক্য সামান্য কিছুটা থাকলেও তা বিদ্রোহ বা বিস্ফোরণে মোড় নেয়নি। ইসলামের তৃতীয় খলিফা, অতিমাত্রায় সরলপ্রাণ ও ধর্মানুরাগী যুন্নুরাইন (দুই নুরের অধিকারী) হযরত উসমানের খিলাফতকালেই শিয়া-সুন্নীর মতভেদ যথেষ্ট মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হযরত উসমানের অতিমাত্রায় সারল্য, রাত-দিনের বেশির ভাগ সময় ধর্ম-কর্মে নিমগ্ন থাকা এবং সর্বকাজে মারওয়ানের উপর নির্ভরশীলতাকেই অনেকে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এদিকে রাজকার্যে মারওয়ানের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব সংঘাতে রূপ নেয়ার উপক্রম হওয়ায় ধর্মপ্রাণ কিছু সংখ্যক মুসলমান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কয়েকজন সাহাবী যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের মূলোচ্ছেদের প্রক্রিয়া হিসেবে হযরত উসমান, আলী, মুয়াবিয়া ও মারওয়ানকে গোপনে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত উসমানকে নৃশংসভাবে খুনের মাধ্যমে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের বীজ বপিত হয়। অথচ ভাগ্যচক্রে হযরত আলী, মুয়াবিয়া ও মারওয়ান পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পান। হযরত উসমান (রাঃ) এর নিহত হওয়ার পর মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হন বীরশ্রেষ্ঠ হযরত আলী (রাঃ)। হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব আরও প্রকট আকার ধারণ করে। তদুপরি মুয়াবিয়া ও মারওয়ানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এক সময় নৃশংসভাবে খুন হন হযরত আলী (রাঃ)। হযরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাত বরণের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রাঃ) ৬ মাস খিলাফত পরিচালনা করলেও বৈরি পরিবেশের চাপে পড়ে এক পর্যায়ে মুয়াবিয়ার সাথে তাঁকে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। চুক্তির শর্তানুসারে ইসলাম বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব মুয়াবিয়ার ওপর অর্পিত হয় এবং তার মৃত্যুর পর হযরত আলী (রাঃ) এর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পুনঃ প্রত্যর্পণের বিষয় নিশ্চিত করা হয়। অথচ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছু দিন পর স্বার্থান্বেষী মুয়াবিয়া হাসানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির যাবতীয় শর্তের বরখেলাপ করে স্বীয়পুত্র ইয়াজিদকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং হাসানকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিষপানে হত্যা করেন। মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় শিয়া সম্প্রদায় ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেন এবং হাসানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। অন্যদিকে মুয়াবিয়ার উত্তরসূরী ইতিহাসধিকৃত ইয়াজিদের পৈশাচিকতা এবং কারবালায় মহানবী (সঃ) দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রাঃ) এর শিরচ্ছেদের ঘটনা শিয়া সম্প্রদায়ের ক্রোধের অনলে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। মূলত কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ইমাম হোসেনের শিরচ্ছেদের ঘটনা মহাপ্রলয়ের আগ পর্যন্ত শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে বিশ্ব মুসলিমকে অশ্রুস্নাত করতে থাকবে।

www.pathagar.com

মুয়াবিয়া সূচিত রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় তার পুত্র ইয়াজিদ ও অন্যান্যরা বংশ পরম্পরায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর অবশেষে বিস্মৃতির অতল গর্ভে চিরতরে হারিয়ে যায়। হযরত উসমানের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর মুয়াবিয়া শাসকগণ দুর্দমনীয় ক্রোধ ও ঘৃণা বশে হযরত আলী (রাঃ) ,তাঁর বংশধর ও অনুসারিদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল। মুয়াবিয়া এবং উমর বিন আব্দুল আজিজ ওরফে দ্বিতীয় উমর ছাড়া এই বংশের অপরাপর শাসকগণ শুক্রবারের পবিত্র খুতবায় হযরত আলী (রাঃ) এর মুখমন্ডল বিকৃত করার জন্য অভিশাপবাণী উচ্চারণ করত বলেও ইতিহাসে প্রমাণ মিলে। মুয়াবিয়া শাসকদের উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা তুঙ্গে ওঠার পর তাদের বিরুদ্ধে গণরোষ উথলে ওঠে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নির্যাতিত ও উৎপীড়িত মুসলমানগণ আব্দুল মোত্তালেবের দশম পুত্র (অর্থাৎ মহানবী (সঃ) এর চাচা) আব্বাসের বংশধরদের নেতৃত্বে সুসংগঠিত হয় এবং যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। তারা মুসলিম বিশ্বের রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তর করেন এবং বিশ্ববিখ্যাত বাগদাদ নগরীর গোড়া পত্তন করেন। আব্বাসীয় বংশের শাসনকাল মুসলিম ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুর্বণ যুগ ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত। ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পাঠশালা, গ্রন্থাগার ও পান্থশালা স্থাপন, বিজ্ঞান চর্চার জন্য বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা, রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণীদের ঈর্ষণীয় সমাবেশ ঘটানো, আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন, প্রজা হিতৈষণা, রাজ্যের অকল্পনীয় বিস্তৃতি সাধন, প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, আধুনিক সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠন, সমর নৈপুণ্য ইত্যাদি মানবীয় ও অতিমানবীয় গুণে আব্বাসীয় বংশের খলিফা হারুন-অর-রশিদ এবং তার পুত্র আল মামুন মানব ইতিহাসে কিংবদন্তীর মহানায়কের স্থান দখল করে রয়েছেন। ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরীর পরিকল্পনা, বিভিন্ন স্থাপত্য নিদর্শন, পুরাকীর্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, পাঠশালা, নহরে যুবাইদা ইত্যাদি যুগ ও কালের গন্ডী পেরিয়ে মহাপ্রলয়ের আগ পর্যন্ত এই রাজবংশের ঐতিহাসিক কীর্তি হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকবে। পুণ্যবতী জীবন সঙ্গিণী বিবি যুবাইদার স্বপ্নের একটি কাহিনী অবলম্বনে বাগদাদ থেকে মক্কা নগরীর বায়তুল হারাম পর্যন্ত রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে দূরদর্শী খলিফা হারুণ অর রশিদ 'নহরে যুবাইদা' নামক পানি সরবরাহের যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা অদ্যাবধি বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের কারণ হয়ে রয়েছে। এই ঐতিহাসিক নহরটি খননকাল থেকে অদ্যাবধি কোটি কোটি মানুষের পিপাসা-নিবৃত্তিসহ নানা চাহিদা পূরণ করে আসছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও কর্তৃক চন্দ্র- সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি,জোয়ার-ভাটার সময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা দানের বহু আগেই অর্থাৎ অষ্টম ও

www.pathagar.com

নবম শতাব্দীতে খলিফা মামুনের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট চমকপ্রদ ও অভাবনীয় সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সকল তথ্য ও উপাত্ত এতোই অভ্রান্ত ও যুক্তিসিদ্ধ ছিল যে তাদের পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীদের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছে। এক কথায় আব্বাসীয় যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবিস্মরণীয় আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেকের বিস্ময়ের কারণ হয়ে রয়েছে। সঙ্গত কারণেই বলতে হয় যে কর্ডোভার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন কেন্দ্র আধুনিক বিজ্ঞানীদের সাধনা ও গবেষণার জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্র রচনা করেছিল। সহজভাবে বলা যায়- আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের নেতৃত্বে স্পেনে মুসলিম সভ্যতার প্রসার ও বিস্তার এক সময় সমগ্র ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীর বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তবে খিলাফতের শেষের দিকে মুসলিম শাসকদের চরম নৈতিক স্খলন ঘটেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমর চর্চা, প্রজাসাধারণের কল্যাণে অর্থ ও সময় ব্যয়ের পরিবর্তে তারা রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে পুরোদমে অপসংস্কৃতি চর্চায় মেতে উঠলো এবং ভোগ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। জনৈক ইতিহাসবেত্তার মতে মুসলমান শাসক বিত্তবৈভব ও প্রাচুর্যের ধাক্কায় এতোই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন এবং তাদের নৈতিক স্খলন এক পর্যায়ে এতোই চরম আকার ধারণ করেছিল যে তারা নিজেদের রাজপ্রাসাদে উপপত্নী ও মক্ষীরাণীদের নিয়ে দিবসের অধিকাংশ সময় মেতে থাকতেন, প্রজাসাধারণ বা দেশের সার্বিক অবস্থা খোঁজ-খবর নেয়ারও তেমন প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন না। জাতির এই চরম ক্রান্তিলগ্নে নিমজ্জমান মুসলিম বিশ্ব তরীকে উদ্ধারের জন্য কোন সুদক্ষ শাসক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। ফলে হারুণ অর-রশিদ, মামুর প্রমুখ পরাক্রমশালী ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের রক্ত ও ঘামে তৈরি বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে ধ্বংসের প্রলয় নৃত্য শুরু হলো। গোঠাবিশ্বে মুসলিম শাসক ও সৈনিকরা চরম মার খেতে লাগলো। সর্বশেষ পর্যায়ে স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা শান্তি প্রস্তাবের নামে নিরস্ত্র মুসলিম জনতাকে মসজিদে ঢুকিয়ে চারদিক থেকে গুলি বর্ষণে পশুর মতো বধ করেছিল। রাজা ও রাণীর এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে স্পেনের মুসলিম সম্প্রদায় যেই নির্বুদ্ধিতা ও কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছিল- তাকে চিরস্মণীয় করে রাখার খাতিরেই দুরন্ধর রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা এপ্রিল ফুলের প্রবর্তন করেছিলেন। তাদের প্রবর্তিত এপ্রিল ফুল প্রথাটি অনেকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অদ্যাবধি পালন করে থাকে।

মুসলমানের এই নৈতিক স্খলনের ধাক্কা মধ্যপ্রাচ্যকেও সজোরে আলোড়িত করে। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় সময়ের অগ্রযাত্রায় ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার আদর্শকে পদদলিত করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থে মেতে ওঠলো এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসে কখনও শিয়া মতবাদ, কখনও সুন্নী মতবাদের ধুয়া তুলে

www.pathagar.com

বিশাল সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করতে লাগলো। এভাবে একদিনকার একক সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থলে মধ্যপ্রাচ্যে ছোট বড় ১৮টি রাষ্ট্রের জন্ম দিলো। খন্ডিত-বিখন্ডিত হওয়ার পরও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একতা, সংহতি ও সহমর্মিতার মনোবৃত্তি আজও জন্ম নেয়নি। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ- তেল, সোনা ও অন্যান্য আকরিককে ছকড়া-নকড়া দরে বিক্রি করে অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান ভোগবিলাসিতার সাগরে ডুবে গেলেন এবং নিজেদের রাজসিংহাসনকে সুসংহত ও সুরক্ষিত করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের অস্ত্র প্রস্তুতকারী দেশগুলোর সাথে সখ্য গড়ে তোলেন এবং রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে অস্ত্র আমদানিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে - দেশের তেল ও সোনা বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে ক্রয় করা এ সকল অস্ত্র দেশের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে রাজা-বাদশাদের হর্ম ও তাদের স্বজনদের রক্ষার কাজে। অতীতকে স্মরণে না রেখে মধ্যপ্রাচ্যে হঠাৎ ধনী হওয়া কিছু দেশের কর্ণধারদের আচরণ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্যথিত করেছে। হঠাৎ গজিয়ে উঠা এই ধনীসম্প্রদায় অপরাপর মুসলিম দেশের লোকজনকে মিসকিন হিসেবে সম্বোধন করতে কুণ্ঠিত হয় না। এদিকে জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের স্থলে মুসলিম শাসকদের পারিবারিক সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির জন্য দুহাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা তাদেরকে শুধুমাত্র পরমুখাপেক্ষিই করেনি বরং করেছে পশ্চিমা বিশ্বের অনুকম্পানির্ভর। দেশে উন্নতমানের অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, সমরাস্ত্র তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা, নাগরিক সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে তারা তেল বিক্রির পয়সায় হাল ফ্যাশানের আকাশ আড়াল করা প্রাসাদ নির্মাণ , বাইজী নিয়ে মনোরঞ্জন ও বিদেশ থেকে নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি আমদানির প্রতিযোগিতায় পাগলপ্রায় হয়ে উঠলেন। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে নানা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে আনন্দ-ফূর্তিতে দিনযাপন করতেন ও রাশি রাশি অর্থের অপচয় করতেন। অনেক রাষ্ট্রপ্রধান গোষ্ঠিস্বার্থ নিশ্চিত করতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং আত্মরক্ষার অবলম্বন হিসেবে বিশ্বের পরাক্রমশালী রাষ্ট্রগুলোর দরবারে ধরণা দিতে শুরু করলেন। পশ্চিমা বিশ্ব এই সুযোগটি কড়ায়-গন্ডায় কাজে লাগালো এবং নগদ ডলারের বিনিময়ে নানা চুক্তির উছিলায় অস্ত্র বিক্রির মহড়া শুরু করল। আবার বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অস্ত্রের বাজার অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতা যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী জিইয়ে রাখলো। এভাবে বুদ্ধির জোরে বাঁদরের পিঠা ভাগের মতো বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে

www.pathagar.com

পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে ইন্ধন যুগিয়ে দশকের পর দশক দু-হাতে ফায়দা লুটছে। কারও অজানা থাকার কথা নয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কারা করেছিল। এ সবের জন্য দায়ী কারা? মূলত সমাজে যাদেরকে আমরা বিশ্বসভ্যতার ত্রাণকর্তা ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত ভেবে শ্রদ্ধা করি, পারমাণবিক শক্তির অধীশ্বর ও সর্বক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট বলে ধরে নেই এসব তো তাদেরই কাজ। পরবর্তীকালে পৃথিবীতে যে সকল নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোও ঐ স্বঘোষিত উত্তমরাই ঘটিয়েছে।

বিশ্ববাসীর অজানা নয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমর মানব সভ্যতার ভিতকে নড়বড়ে করে তুলেছিল এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্নের আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন কিংবা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করার কারণেই হোক হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে জগতশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের স্বঘোষিত ত্রাণকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত উক্ত বিস্ফোরণে একই দিনে হাজার হাজার মানব-সন্তান চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়েছিল। তাছাড়া উক্ত বিস্ফোরণে যে লাখ লাখ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পঙ্গুত্ব বরণ করেছিল তাদের শোচণীয় দুর্ভোগের সঠিক বর্ণনায় ভাষা হার মানতে বাধ্য। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বকে তৃতীয় মহাসমরের অভিশাপমুক্ত এবং মানব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সুসংহত ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বুকভরা আশা নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তথা জাতিসংঘ। হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে বিস্ফোরিত পারমাণবিক বোমার প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসযজ্ঞের বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিশ্ববাসীকে পারমাণবিক ও অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের অভিশাপমুক্তিসহ নানা গালভরা প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘের মহাসনদ রচিত হলেও অল্পদিনেই জাতিসংঘের কর্মকান্ড বিশ্ববাসী তথা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বকে হতাশ করেছে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্র শক্তিগুলোর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের নিরিখে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোর ঘাড়ে ইসরায়েল নামক ইহুদী রাষ্ট্রকে সিন্দাবাদের একচোখা দৈত্যের মতো চাপিয়ে দেয়া হলো। ইহুদিদের কি চরমভাবে হত্যা ও অপমাণিত করেছে হিটলার। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে নির্বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে। অন্যায় করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। বর্তমানে তারা ইহুদিদের কাছে ভালো মানুষ সেজেছে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ ও সংঘাত লাগিয়ে মজা মারছে সভ্যতার দাবিদাররা। পশ্চিমা বিশ্বের পরোক্ষ ইন্ধনে ইসরায়েল জাতিসংঘের অনেক সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করেছে। তখনই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার আদর্শ-উদ্দেশ্য অনেকটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। তৎকালীন বিশ্বের প্রায় ৭০ কোটি মুসলমানের মতামতকে সদম্ভে পদদলিত ও মথিত করে মাত্র ১ কোটি ইহুদী ধর্মাবলম্বীর স্বার্থ

www.pathagar.com

রক্ষায় বিশ্বের পরাশক্তিগুলো রীতিমত কোমর বেধে লেগে গেলো। এরপর যাবতীয় ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের মাথায় সজোরে পদাঘাত করে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো নীরবে-নিভৃতে নবপ্রতিষ্ঠিত ইহুদী রাষ্ট্রকে আধুনিক মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ করে মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বের পরাশক্তির ক্ষুদ্র ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে গড়ে তুললো। একদিকে গোটা বিশ্ব থেকে ইহুদীদেরকে ইসরায়েলে জড়ো করানো, অন্যদিকে বাস্তুহারা প্যালেস্টাইনীদেরকে বাস্তুভিটি থেকে উৎখাতের প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য ইন্ধন যুগিয়ে জাতিসংঘের ধারক ও বাহকরা মানবতার ত্রাণকর্তার (!) ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। অধিকন্তু সার্বক্ষণিক প্রচার মিডিয়ার আনুকূল্যে বাস্তুহারা প্যালেস্টাইনীদের মুক্তিসংগ্রাম সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো। বস্তুত, বাস্তুভিটি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ফিলিস্তিনীরা ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে শরণার্থী শিবিরে অমানবিক জীবন যাপন করছে এবং মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁই-এর আশায় যাযাবরের মতো সমগ্র আরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে মনুষ্যত্ববাদের পূজারী পশ্চিমা বিশ্বগুলো ইসরায়েলের যাবতীয় কর্মকান্ডকে বিনা বাক্য ব্যয়ে অনুমোদন করতে লাগলো এবং আত্মরক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত প্যালেস্টাইনীদের শুরুতে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের দেয়া সন্ত্রাসী খেতাবধারীদের নেতা ইয়াসির আরাফাতকে প্যালেস্টইনের অবিসংবাদিত নেতা বলে স্বাগত জানালো। এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কারও তাকে দেয়া হল। বলতে আপত্তি নেই যে ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে অনেকের মধ্যে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এদিকে বিশ্বশক্তির সক্রিয় আশীর্বাদপুষ্ট ইসরায়েলের অধীশ্বররা দিনে দিনে বেপরোয়া হয়ে উঠলো এবং যখন-তখন প্যালেস্টাইনী ভূখন্ডে হামলা চালিয়ে গণহত্যা চালাতে লাগলো। তাদের এই সাঁড়াশি অভিযানে আজ পর্যন্ত কত হাজার নিরীহ প্যালেস্টাইনী প্রাণ হারিয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে পাল্টা হামলায় অনেক নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয় ইহুদীও অকারণে প্রাণ হারাচ্ছে। উন্নত বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে আর কতো নিরীহ প্যালেস্টাইনী ও ইহুদী প্রাণ হারাবে তা ভবিষ্যতে জানা যাবে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হিটলারের অকৃত্রিম পরামর্শ দাতা ও মন্ত্রী গোয়েবলস বলেছিলেন, প্রচার মাধ্যমে কোনো মিথ্যাকে বারবার প্রচার করা হলে জনমনে এক সময় তা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া হিসেবে স্বীকৃত ইসরাইল প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলোর সহায়তায় হিটলারের আমলের প্রক্রিয়াকে শুধু অনুসরণ করেনি বরং তাতে বহুমাত্রিকতার সংযোজন ঘটিয়েছে। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন ধরনের সহিংসতা ঘটামাত্রই তা

www.pathagar.com

মুসলিম সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ড বলে চালিয়ে দেয়ার কাজে ইসরায়েলের এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলো কোমর বেঁধে লেগে যায়। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটালে তা ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়- ধর্ম বা গোষ্ঠীর নামে চালানোর নজির মিলে না। সন্ত্রাসীদের কোনো রঙ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি নেই। সন্ত্রাসীরা সব সময় সন্ত্রাসী, সে যে ধর্মেরই অনুসারী বা বিশ্বাসী হোক না কেন। এজন্য ইহুদী সন্ত্রাসী বা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ইত্যাদি শব্দ বিশ্বের কোনো অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূলত পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো সন্ত্রাস এবং ইসলামকে একই সূতার গ্রন্থিতে আবদ্ধ করতে গিয়ে শুধুমাত্র মিথ্যারই আশ্রয় নেয়নি বরং অনেক জলজ্যান্ত সত্যকেও গলাটিপে হত্যা করেছে। একদিকে মিথ্যার বেসাতি এবং অন্যদিকে সত্যকে গলাটিপে হত্যা করার উদ্যোগ পরস্পর মিলেমিশে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে এতই লেজে গোবরে করে ফেলেছে যে বিশ্বের সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। অথচ ইসলামের শাব্দিক অর্থ যে শান্তি-এই পরম সত্যটুকু বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার কোনো উদ্যোগ পেট্রো ডলারের অধীশ্বর মুসলিম রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি। এমনকি ইসলামের মর্মবাণী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য যুতসই প্রচার মাধ্যম গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি কিংবা গড়ে তোলেনি। ফলে বিশ্ব মুসলিমের প্রতিনিধিত্বকারী আবরবিশ্ব নিজেদের বিভিন্ন কুকাজের মাধ্যমে একদিকে ইসলামকে নিন্দিত করেছে, অন্যদিকে নিজেরাও পশ্চিমা বিশ্বের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে একের পর এক মুসলিম বিশ্বকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করছে, পরস্পরকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের উস্কানী দিয়ে ও নানা কূটচালে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অস্ত্রের রমরমা ব্যবসাও অব্যাহত রেখেছে এবং বিভিন্নভাবে শায়েস্তা করে চলেছে। সব চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে- যখন পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম সন্ত্রাসী, ইসলামী জঙ্গী ইত্যাদি শব্দচয়নে প্রতিনিয়িত মুখে খৈ ফোটাচ্ছে তখন সৌদি আরবসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানগণ প্রতিবাদের পরিবর্তে অহরহ পশ্চিমা বিশ্বের গালভরা প্রশংসা করে বেড়াচ্ছে । অথচ আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে যুদ্ধংদেহী ও যুদ্ধলিপ্ত, বর্বর, সত্যভ্রষ্ট ও বিপথগামীদের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে এবং তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) সমগ্র আরবে শান্তি ও সমৃদ্ধির বীজ বপন করেছিলেন। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ (সঃ) পৌত্তলিক, বর্বর ও দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনদের আল্লাহর একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে বিশ্বের বুকে এক সুসভ্য রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করেছিলেন। ইসলামের খলিফাগণ সাম্য, ন্যায়বিচার, পরমত সহিষ্ণুতা, পর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অমুসলিম ও সংখ্যালঘু নাগরিকদের

www.pathagar.com

অধিকার সংরক্ষণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা অত্যন্ত বিরল। কথিত আছে ব্যভিচারের অপরাধে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর তার পুত্র আবদুল্লাহকে নিজ হাতে ১০০ দোররা মেরেছিলেন; ইহুদীদের প্রস্তাব অনুযায়ী অবরুদ্ধ জেরুজালেমের চাবি স্বহস্তে গ্রহণের জন্য মদিনা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত দীর্ঘ পথে একমাত্র ভৃত্যের সাথে উটের পিঠে চাপা ও উটের রশি টানা ভাগাভাগি করে ন্যায়-বিচারের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন- মানব সভ্যতার ইতিহাসে হযরত ওমরের সৃষ্ট এই ধরনের নজির দ্বিতীয়টি মিলবে না। অথচ মুসলমানদের সজ্ঞান উপেক্ষা কিংবা অজ্ঞতার কারণেই তাদের এই আকাশ আড়াল করা গৌরব বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে আজ। এটি অনস্বীকার্য যে সাধারণ মুসলমানরা মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসী বা মুসলিম দেশের রাজাবাদশার গর্হিত কাজগুলোকে কোনোভাবে গ্রহণ করেনি, বরং ঘৃণা করেছে।

যাহোক, ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। এ ঘটনাটি দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সজোরে নাড়া দিয়েছে। হাজার হাজার নিরীহ লোকের এই প্রাণহানীর ঘটনা শুধু নিন্দনীয় নয়, অত্যন্ত জঘন্যও বটে। তবে এ ঘটনাটির হোতা কে বা কারা তা সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে ওসামা বিন লাদেন ও তার অনুসারীরা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। অথচ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশই ইরাকী নন। পরবর্তিতে দেখা গেছে তারা অন্য দেশের এবং তাদের সাথে ক্ষমতাধরদের সুসম্পর্ক রয়েছে। যার ফলে নিজেরা তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করে প্লেনে তুলে দেশের বাইরে নিরাপদে তাদেরকে পাঠিয়েছে। তাদেরকে ধরলে জানা যেতো ঘটনাটি ঘটার পেছনে রহস্য কি? উক্ত হামলার হোতা ওসামা বিন লাদেনের অপরাধে সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসীর লেবাস পরানোর যে উদ্যোগ বিভিন্ন দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো গ্রহণ করেছিল তা কোনোক্রমেই অনুমোদনীয় নয়। কারণ বিন লাদেনের উত্থানের ইতিহাস আজও বিশ্ববাসীর স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়নি। তদুপরি বিন লাদেন বিশ্ব মুসলিমের প্রতিনিধিতত্ব করে না। তাই বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড কিংবা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার দায় বিশ্ব মুসলিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার উদ্যোগকে কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। বিন লাদেনকে কে বা কারা সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তাও বিশ্বের অনেকেরই অজানা নয়। বিশ্ববাসীর জানা মত- বিন লাদেনকে এই যুক্তরাষ্ট্রই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলো; আর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধেই বা কেন তিনি সে পথ বেছে নিলেন তা খুঁজে বের করা আবশ্যক। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্লেনের ব্লাক বক্স না পাওয়া গেলেও সন্ত্রাসীদের পাসপোর্টগুলো সরকারের হাতে অক্ষতভাবে রক্ষিত রয়েছে বা আশে পাশে পাওয়া গেছে, যেখানে লোহা গলে পানি হলো সেখানে

www.pathagar.com

আরবী লেখা অনেকগুলো পাতা পাওয়া গেছে। অনেকের মধ্যে এটা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এটা কিভাবে সম্ভব বা এটা কাদের কারসাজি? ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের কারণে আমেরিকায় বসবাসরত মুসলমানদের নিজদেশে অনেক হয়রানি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিকার হতে হয়েছে। অনেকেই অপরিসীম দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা ভুগে অবশেষে পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেলে আসা দেশে চলে গেছেন। যার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বিদ্যমান। যখন বাংলাদেশীরা ভয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে অনেক দূরে, সেই সময় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ঠিকানা মেইন স্ট্রীমের লোকজনকে এনে এস্টোরিয়ায় মিটিং করে সবাইকে আহ্বান করেছিল, ভয় না করে নিজেদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করার।

এদিকে ১১ সেপ্টেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘটনার জের ধরে আফগানিস্তানে মোল্লা ওমরের সরকার এবং ইরাকে সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে। মোল্লা ওমরের সরকারের সাথে বিন লাদেনের সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গিলানো গেলেও ইরাকের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চিমা বিশ্ব নানা অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করার অথবা অন্য কাউকে খুশী করার জন্য পথ খুলে দিয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের মিথ্যা অভিযোগগুলো ইরাকের নেতারা বার বারই প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু কেউই তা আমলে নেয়নি। এমনকি জাতিসংঘের কথাও তারা শোনেনি। পরে ইরাকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও রাসায়নিক গ্যাস মজুদ রাখা ও ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করার অজুহাতে ইরাক ও আফগানিস্তানে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা এবং সরকারের উচ্ছেদ ঘটালেও বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সন্ত্রাস নির্মূলের উদ্যোগ পুরোপুরি ব্যর্থ না হলেও সন্ত্রাসের যে বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে তা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র জো নেই। ইরাক ও আফগানিস্তানের হাজার হাজার বছরের ঐতিহাসিক স্থাপত্য, ভূপ্রাকৃতিক সম্পদ ও দেশের অবকাঠামো ধ্বংস, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট, লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোকের মৃত্যু, মিলিয়ন মিলিয়ন বাস্তুত্যাগীর পার্শ্ববর্তী ও ভিনদেশে সকরুণ মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হওয়া ও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের পুরোপুরি অপচয়ের দিকগুলো বিশ্ববাসী সময়ের অগ্রযাত্রায় ভুলে গেলেও হাজার হাজার বা লাখ লাখ মানুষের প্রাণহাণীর বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিতে দেখবেন। ইতোমধ্যে ইরাকে প্রাণহাণীর সংখ্যা অনেকের দৃষ্টিতে মিলিয়ন এর উপরে এবং আহতের সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিহত সেনা সদস্যের সংখ্যা ৪ হাজার পার হলেও পঙ্গুত্ব বরণকারীর সংখ্যা হয়তো বা বিশ হাজারের কোঠায় পৌঁছার উপক্রম। সৈন্যরা জানে না তাদের অপরাধ কি, তারা কি নিজের দেশকে আগ্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করছে কি না? না স্বার্থান্বেষী

www.pathagar.com

রাষ্ট্র নায়কের ইচ্ছা, লোভ, অন্যদেশকে দখল করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। পতিত রাষ্ট্র হিসেবে ইরাকের প্রাণহানি ও পঙ্গুদের হিসাব এ মুহূর্তে নাই বা করলাম। আবার নিহতরা মরে গিয়ে রক্ষা পেলেও আহতদের জীবনভর পঙ্গুত্বের দুর্বিসহ অভিশাপ বহন করতে হবে- যার আর্থিক মূল্য নিরূপণ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যারা নিহত বা আহত হয়েছেন তারা জানেনা তাদের অপরাধ কি? ইরাকে এমন কোন পরিবার পাওয়া যাবেনা যে যার পরিবারের কেউ নিহত হয়নি। দেখা যাবে একটি পরিবারে বাবা মারা গেলে অন্য পরিবারে হয়তো মা, ভাই, বোন, স্বামী-স্ত্রী কেউ না কেউ প্রাণ হারিয়েছেন। এই স্বজন হারানোর বেদনা বহুকাল চলবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যই জাতিসংঘের সৃষ্টি। এদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ ইরাকে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ইরাকে বুশ-ব্লেয়ারের সাঁড়াশি ও অমানবিক অভিযানের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বুশ -ব্লেয়ারের অমানবিক হামলার বিরুদ্ধে কিংবা ইরাকে লাখ লাখ প্রাণহানীর ঘটনায় জাতিসংঘ শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নিছক ঠুটো জগন্নাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শুধু যে ইরাকে হঠকারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তা নয়, অতীতেও অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। জাতিসংঘের এহেন ভূমিকা একে নিছক সাক্ষী গোপালের ভূমিকায় ঠেলে দেয়নি বরং অনেকের নিকট বীতশ্রদ্ধও করে তুলেছে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে বিশ্বের নিরাপত্তাহীন ক্ষুদ্র- ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের উপর আস্থা হারাতে বসেছে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক, ওআইসি, সাউথ-ইস্ট এশিয়া, আশিয়ান আফ্রিকান ইত্যাদি ধরনের বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলছে যা জাতিসংঘের জন্য মোটেও সুখকর নয়। বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষায় জাতিসংঘ যে পুরোপুরি অকেজো, পারমাণবিক শক্তি হাসিলের মাধ্যমে অন্যদের সমকক্ষতা অর্জনের পথে বড় বাধা এবং এটি যে পরাশক্তিগুলোর স্বার্থ রক্ষার অনেকটা হাতিয়ার তা ভুক্তভোগীরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর দু ধরনের নীতির কারণে ছোট রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার গড়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। একদিকে পাকিস্তান ও ভারতে পরমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে। অন্যদিকে আবার ভারতকে সাহায্য করবে যুক্তরাষ্ট্র যদিও তারা ইন্সপেকশন করার সুযোগ দেয়। আবার ইরান ও উত্তর কোরিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কারণে এবং বড় দেশগুলোর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির করে চলেছে। খোলামেলাভাবে বলতে গেলে বলতে হয় জাতিসংঘ বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা নয়

www.pathagar.com

বরং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার ও তাদের অনুকম্পাপ্রার্থী। সম্ভবত এ কারণেই স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিতে এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে যখন পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া তৈরির প্রতিযোগিতা পুরোদমে চলছিল তখন জাতিসংঘের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভ মন্তব্য করেছিলেন~ Though the U N O is the chaste daughter of a chaste mother now she is suffering from so many diseases. She needs a doctor to treat her. She needs surgical operation to cure her.

যাহোক, জাতিসংঘের অসহায়ত্ব, বুশ প্রশাসনের ঔদ্ধত্য কিংবা বুশ-ব্লেয়ারের হঠকারিতা ইত্যাদির অবিমিশ্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ইতোমধ্যে ইরাকের প্রায় ৫ হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতা এবং আফগানিস্তান ও ইরাকে সম্পদের বিনাশ ছাড়াও অসংখ্য তাজা প্রাণ ঝরে গেছে। অজস্র সম্পদের বিনাশ এবং এই ঝরে যাওয়া ও চিরতরে পুঙ্গুত্বের অভিশাপ বরণকারী লাখ লাখ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়া আমাদের মতো নিরস্ত্র ও অসহায়দের কিছুই করার নেই। সম্ভবত এ কারণেই স্বদেশে যেমন প্রেসিডেন্ট বুশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমাবেশ হচ্ছে তেমনি বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্রেই তিনি যাচ্ছেন সেখানেই শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র জনগণ তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। নিতান্ত শ্রুতিকটু হলেও বলতে হচ্ছে- আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় অনেক জিওপি প্রার্থী প্রেসিডেন্ট বুশকে তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণে আহ্বান জানাননি হেরে যাওয়ার ভয়ে, পারতপক্ষে অনেকেই তাকে এড়িয়ে গেছেন। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মানবগোষ্ঠী মারণাস্ত্রের ঝনঝনানি কিংবা অকারণে রক্তক্ষয়কে বিন্দুমাত্র অনুমোদন করে না। তারা চায় মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহের পেছনে শ্রমজীবী মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ট্যাক্সের রাশি রাশি অর্থের অপচয় চিরতরে বন্ধ হোক। তারা চায় অকারণে যুদ্ধের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ রেখে তা বিশ্বমানবতার কল্যাণে, বিশ্বের কোটি কোটি বুভুক্ষু, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, শিক্ষা, চিকিৎসা, এইডসসহ নানা মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে ও নানান ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হোক। আমাদের ভুললে চলবেনা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে বিশ্বমানবতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। বুশ প্রশাসন ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করেছে তার অংশ বিশেষের সাহায্যে এশিয়ায় সাধারণ মানুষের উন্নয়ন বা আফ্রিকার কোটি কোটি এইডস আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা করা যেতো, নিজের দেশে লুইজিয়ানাতে ক্যাটরিনাদুর্গত মানুষদের দুর্ভোগ বহুলাংশে লাঘব করা যেতো, বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার উদ্যোগ যথেষ্ট কার্যকর করা যেত

www.pathagar.com

এবং এশিয়া ও অনুন্নত বিশ্বে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যেত। এমনকি নিজের দেশের যে অর্থনীতির বারোটা বাসতে চলেছে। সে দিকে কোনো নজর নেই। সাধারণ জনগণ দিশেহারা। স্মর্তব্য, বৈষম্য ও বিশ্ব থেকে হ্যাভ ও হ্যাভ নটের সমস্যা নির্মূলিত করা না করা পর্যন্ত তা কারও জন্যই সুখকর হবেনা। কারণ গগনচুম্বী অট্টালিকার পাশে জরাজীর্ণ কুড়ে ঘর শুধুমাত্র আকাশ-আড়ালকরা হর্মটির সোন্দর্য বিকাশের অন্তরায়ই হয়না বরং তার প্রতি জিহ্বা বাড়িয়ে তাকে উপহাসই করে। তেমনি বিশ্ববাসীকে ক্ষুধা-দারিদ্র ও রোগ-শোক থেকে উদ্ধার ও রক্ষা করা না গেলে তাদের মরা-পচা লাশের দুর্গন্ধে আকাশ ভারাক্রান্ত হবে, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে বিশ্বের ভরাপ্রাচুর্যের দেশগুলোর অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তদুপরি ইরাক থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের উছিলায় ইরাকে সামরিক অভিযানের ফলাফল এখন সকলেই কমবেশি টের পাচ্ছে। সেখানে কুর্দী, শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গায় প্রতিনিয়ত শত শত লোকের প্রাণহাণীকে আমরা গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্ববাসীকে গেলাতে চাইলেও তা যে কার্যত আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল তা বোঝার বাকি নেই। এদিকে শিয়া-সুন্নী ও কুর্দিদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির বন্ধনকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমরা সেখানে যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের বীজ বপন করেছি তা আদৌ নির্মূলিত হবে কি-না তাও ভবিতব্যের বিচার্য। ভবিষ্যতে শিয়া-সুন্নী ও কুর্দিদের মধ্যে তিনটি রাষ্ট্র হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যায়- ইরাক থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের নামে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক অভিযান সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত অভিযানকে কেন্দ্র করে বর্তমান বুশের পিতা সিনিয়র বুশও নানা কারণে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। পুত্র বুশের তুলনায় জ্যেষ্ঠ বুশ অধিকতর মেধাসম্পন্ন বিধায় তিনি সরাসরি ইরাকের রাজনীতিতে আঘাত হানেননি। তিনি জানতেন ইরাকে সাঁড়াশি হামলা চালাতে গেলে অকারণে লোকক্ষয় ছাড়াও সম্পদ ও সভ্যতার যে বিনাশ হবে তা পূরণ করার সুযোগ বা সামর্থ তার নাও হতে পারে। ইরান-ইরাকের ৯ বছর স্থায়ী যুদ্ধ, কুয়েতে ইরাকের অভিযানের জের ধরে দীর্ঘ দিন জাতিসংঘ কর্তৃক অবরোধ আরোপের ফলে অর্থনৈতিক চরম বিপর্যয়ের পরও বুশ-ব্লেয়ারের অর্থাৎ বিশ্বের ৪০টির অধিক রাষ্ট্রের অভিযান মোকাবেলায় এবং পরবর্তীতে ইরাকের জনগণ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মোকাবেলা আজও করে যাচ্ছে । যদি ইরাকের জনগণের নিকট পরাশক্তিগুলোর মতো আধুনিক সমরাস্ত্র ও প্রশিক্ষণ থাকতো তাহলে বিশ্ব পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতো বলে অনেকেরই ধারণা। আবার ইরাকে অকারণে অভিযান চালাতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য চরমভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। একটি দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে একাধিক

www.pathagar.com

শক্তির উত্থান ঘটেছে যা পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা সাধ্যাতীত হতে পারে। যেমন ইরানের পারমাণবিক শক্তির মহড়া, ইরাকে মুক্তাদা আল সাদরের উত্থান , লেবাননে হিজবুল্লার বাড়াবাড়ি বর্তমানে নানা অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে। পরিস্থিতির সার্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে ইরাকসহ ঐ পুরো অঞ্চলটাই যুক্তরাষ্ট্রের হাতছাড়া হতে বসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এই চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। এতে মধ্যপ্রাচ্যের উক্ত অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই লাভবান হবে;কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তেলের প্রতি লোভ সামলানো কি সম্ভব? এদিকে ইরানে শাহের পতনের পর খোমেনি কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে আমেরিকানদের জিম্মি হিসেবে আটক রাখার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রবাসী ভুলে গেলেও বিশ্ববাসী ভোলেনি। আবার কার বা কাদের উস্কানীতে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন অকারণে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জুড়িয়েছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কাহিনীও কারও অজানা নয়। তাই যাদের উস্কানীতে একদা সাদ্দাম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন আজ যদি তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর করা হয় তবে বিশ্ববাসীর অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সাদ্দাম তো একদিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ শত্রুতে পরিণত হলেন কেন? বা কাকে খুশী করতে গিয়ে অযাচিতভাবে সাদ্দামকে প্রাণ দিতে হলো। পৃথিবীতে যারা নানান সময়ে নানা ধরনের অপকর্ম করেছে তাদের বিচার আগে হোক বা পরে হোক হয়েছেই। যাহোক, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটি প্রশ্নই বার বার আমাদের মতো সহজ সরল মানুষদের হৃদয়কে আলোড়িত ও আন্দোলিত করছে। প্রশ্নটি হচ্ছে– ক্ষমতাচ্যুতির পর ১৮ বছরের পুরানো মামলায় যদি সাদ্দাম ও তার সহযোগীদের ফাঁসির দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয় তবে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন এবং সর্বশেষে সকল তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর নানা অজুহাতে ইরাককে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে যারা নিরীহ লাখ লাখ লোকের প্রাণহাণী ঘটিয়েছে, পঙ্গু করেছে অগণিত মানুষ, বিনা কারণে অন্যায়ভাবে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে, স্বদেশের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে এবং দেশের অবকাঠামো ধ্বংস করেছে ও অবলীলায় ধ্বংস করে চলছে এর দায়দায়িত্ব কে নেবে? এই জঘণ্য অন্যায়ের হোতাদেরকে কি কোনো দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব? ■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সমীপে

বাংলাদেশ কি সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে? এই প্রশ্নটি আসা একেবারেই অমূলক নয়। একজন দেশপ্রেমিকের কাছে এই প্রশ্নটি অমূলক হবার কোনো কারণ নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে খুনের রাজনীতি চলে আসছে। একের পর এক খুন হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক কোনো খুনেরই বিচার আজ অবধি হয়নি। নামমাত্র বিচারের নামে প্রহসন প্রক্রিয়া চলেছে। বিচারের নামে কমিশন গঠিত হয়েছে, কিন্তু কোনো রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি। সম্প্রতি দেশে যে সব ঘটনা ঘটছে তার বিচার হচ্ছে না, কারণ যারা খুনী অথবা খুনের সাথে জড়িত তারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলগুলোর অধিকর্তার

www.pathagar.com

পদে অধিষ্ঠিত। অথবা বড়কর্তা বাবু দ্বারা লালিত পালিত। যে দল বা যারাই ক্ষমতায় যান না কেন খুনী-সন্ত্রাসীদের অবস্থান কোনোভাবেই পরিবর্তিত হয় না। যে কারণে আইনের লম্বা হাত তাদের স্পর্শ করতে পারে না। তারা সব সময়ই আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন এবং থাকবেন। অবস্থা দেখে মনে হয় বাংলাদেশে আইন যেনো শুধুমাত্র গরীবদের ধরার জন্য প্রণীত। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সব সময় শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচার দেখে অভ্যস্ত, কখনো শান্তিতে ঘুমাতে পারেননি। সন্ত্রাসী ঘটনা এবং খুনের হোলি খেলা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। এতোদিন পর্যন্ত খুন হতো সাধারণ মানুষ; রাজনৈতিক খুনের সংখ্যাও যে একেবারে কম ছিলো তা বলা যাবে না। ইদানিং রাজনৈতিক খুনের মাত্রা এতো বেশি বেড়ে গেছে যে তা থেকেই প্রমাণ হয় বাংলাদেশ সন্ত্রাসীদের খুনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ছিলো না। বর্তমানে ধনী, দরিদ্র কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিদেশী কুটনীতিক থেকে শুরু করে সবাই এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বাইরে গেলে যে বাড়িতে ফিরে আসবেন তার নিশ্চয়তা নেই। ভয়ে ভয়ে কতোক্ষণই বা চলা যায়। সবাই তো পুলিশ নিয়ে চলতে পারবে না। রাষ্ট্রের পরিচালকরা জনগণের ট্যাক্সের অর্থে নিজেদের নিরাপদ রাখেন, অথচ জনগণ নিরাপদ কি-না, জনগণের কি হবে তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নই।

বাংলাদেশে এখন খুনের রাজনীতি যেভাবে শুরু হয়েছে তার চিত্র দেখলে আতংকে শরীর শিউরে ওঠে। সম্প্রতি যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার চিত্র যদি তুলে ধরা যায় তাহলে ব্যাপারটি অনুধাবন করতে সহজ হবে। খুন করা হয় সাংবাদিক মানিক সাহা, সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু, সংসদ সদস্য আহসান উল্যাহ মাস্টারকে এবং প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় বুদ্ধিজীবী হুমায়ুন আজাদের (হয়তো সেই আঘাতের ফলেই পরবর্তীতে বিদেশে তার মৃত্যু), বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের, কুলাউড়া থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এম এম শাহীনের; বোমা ফাটিয়ে সিলেটের মেয়র কামরানের জীবননাশের চেষ্টা করা হয়। সিলেটের যে কটি সন্ত্রাসী ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার খলনায়ক জোট সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমানের পুত্র সন্ত্রাসী এমপি নাসের ও তার গুন্ডাবাহিনী। সর্বশেষ ষড়যন্ত্র করা হয় গ্রেনেড দ্বারা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের হত্যার । ষড়যন্ত্রের পুরোটা কৃতকার্য না হলেও, একেবারে অকৃতকার্য হয়েছে- বলা যাবে না। এতে আওয়ামী লীগের মহিলা নেত্রী আইভী রহমানসহ সাধারণ লোকদের হত্যা করা হয়েছে, অনেকেই আহত হয়েছেন। একটার পর একটা হত্যার হুমকিসহ যতোগুলো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার একটিরও আজ পর্যন্ত কোনো বিচার হয়নি- এমনকি ঘটনার

www.pathagar.com

সাথে যে সব সন্ত্রাসী জড়িত তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। হবার সম্ভাবনাও নেই। যদিও আহসান উল্যাহ মাস্টারের খুনের প্রধান সাক্ষী সুমনকে পুলিশ নিজেই পিটিয়ে হত্যা করেছে। যারা আইন রক্ষার কাজে নিযুক্ত তারাই আইন ভঙ্গ করে চলেছেন ধারাবাহিকভাবে। বাংলাদেশে এখন আইনের শাসন নয় পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের দাপট চলছে। তা না হলে একজন জনপ্রতিনিধিকে কীভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়, সাংবাদিককে হত্যা করা হয় এবং অপর সংসদ সদস্যের প্রাণ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়? বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও সিলেটের মেয়রের উপর বোমা মারা হয়? এ কোনো বর্বর এবং অসভ্য সমাজে আমাদের বসবাস? দিনে দিনে মানুষ সভ্য হচ্ছে আর আমরা পরিণত হচ্ছি হিংস্র প্রাণীতে। এই হিংস্রদের রোষানলে পড়েছে বাংলাদেশ ও দেশের কিছু জনপ্রিয় রাজনীতিবিদসহ অন্যরা।

বর্তমান বিশ্ব সন্ত্রাস এবং উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও উচ্চকিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাসের কারণেই দুটি দেশের শাসন ক্ষমতার পতন ঘটেছে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মদদদাতা বিজেপি সরকারকেও মসনদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। বর্বরোচিত বোমা হামলা ও কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণহানী ঘটেছে প্রাতঃস্মরণীয় আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) এর মাজারেই। আবার জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের নিকট নিরাপত্তার জন্য বারংবার আবেদন জানিয়ে অবশেষে সন্ত্রাসের যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে উপর্যুপরি দু দফা নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে রাজধানীর উপকণ্ঠেই। শুরুতে এ নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ডকে দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে চালিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলের চাপের মুখে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য ও খুঁটির জোর মজবুত হলে এতোসব অরাজকতার পর আবারও নতুন করে অন্য একজন সংসদ সদস্যকে পবিত্র সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত প্রটেকশন প্রার্থনা করতে হয়েছে। এবার অর্থমন্ত্রীর পুত্র সাংসদ নাসের রহমান কর্তৃক কুলাউড়া থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এম এম শাহীনকে- ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে প্রটেকশন প্রার্থনা করতে হয়েছে। সংসদকে কার্যকর এবং যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়েই জনাব শাহীন সংসদে ব্যক্তিগত প্রটেকশনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। এতে তিনি মিঃ টেন পার্সেন্ট হিসেবে সমধিক খ্যাত ঐক্যজোটের সাংসদ নাসের রহমানের চরম বিরাগভাজন ও চক্ষুশূল হয়ে পড়েন। নাসের রহমানের ঔদ্ধত্যপনা ও প্রতিহিংসার থাবা তার প্রতি আরও শাণিত হয়। জানা যায় কুলাউড়াবাসী তথা প্রবাসী

www.pathagar.com

বাংলাদেশীদের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি এম এম শাহীন তার বৃদ্ধা মা, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও স্বদেশ প্রত্যাগত বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা খালিদ-উর রবসহ সপরিজনে মৌলভীবাজারস্থ তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে নাসের রহমান তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। জনাব শাহীন বিষয়টি আঁচ করতে পেরে পুলিশের সাহায্য চান। পুলিশ তৎক্ষণাত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে জনাব শাহীনের বাড়ি পৌঁছে দেন। পরদিন তার জনসভায় হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। তিনিসহ কয়েকজন আহত হন এবং এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান। এছাড়াও নাসের রহমানের সশস্ত্র মাস্তান দল জনাব শাহীনের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে মালামাল ভাংচুর, জাতীয় নেতৃবৃন্দের ছবি তছনছ, কয়েকজন কর্মীকে মারধর ও একজনকে খুরের আঘাত করে। ইতিপূর্বেও নাসের রহমানের বর্বর বাহিনী জনৈক লন্ডনপ্রবাসীকে এবং কমিশন না পাওয়ায় ব্যবসায়ী নুরুজ্জামানকে থানাহাজতে সাপমারা করে ছেড়েছিল । সম্প্রতি লন্ডনের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক জনমতের সম্পাদককেও নাসের রহমান হুমকি দিয়েছেন এবং সেই ভয়ে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

লক্ষ্যণীয়, উন্নত বিশ্বের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির দীক্ষাপ্রাপ্ত জনাব শাহীন প্রতিহিংসামুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির আদর্শকে ধারণ করে বিলাসবহুল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মোহ কাটিয়ে স্বদেশে পাড়ি জমান। তিনি তার পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থে রাজনীতির কর্মকান্ড পরিচালনা করেন এবং কুলাউড়াকে শূন্য অবস্থা থেকে বর্তমানের অবস্থায় উন্নীত করেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসামুক্ত জনাব শাহীন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও দল-নির্দল ,হিন্দু- মুসলিম নির্বিশেষে সকলের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন জোরদার করতে সর্বদা সচেষ্ট। এ কারণে সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি বন্ধ হওয়া জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হলেও তার এলাকার জনগণ এ জঘণ্য বিষবাষ্পের প্রভাবমুক্ত। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার বৃহত্তর কল্যাণে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা তৎপর এবং এ কাজে অন্যের অযাচিত হস্তক্ষেপকে মেনে নিতে নারাজ। তার অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় কুলাউড়ায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলোর মধ্যে কোনো হানাহানি ও লাঠালাঠির ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। তাই জনাব শাহীনের প্রাণনাশের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং তার ও অন্যান্য লোকজনের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে এলাকার শান্তিপ্রিয় জনগণ প্রতিবাদসভার আয়োজন করে। এদিকে নাসের রহমানের সশস্ত্র মাস্তানরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে জনাব শাহীনের সেই প্রতিবাদ সভার মঞ্চ ভাংচুর, ১০ জনকে মারধর করাসহ ব্যক্তিগতভাবে তাকেও হত্যার চেষ্টা চালায়। একবিংশ শতাব্দীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে ক্ষমতাসীন সরকারের একজন ক্ষমতাধর সাংসদ কর্তৃক অন্য একজন জনপ্রিয় স্বতন্ত্র সাংসদকে এভাবে লাঞ্ছিত

www.pathagar.com

করার ও তার উপর নিরবচ্ছিন্ন হামলা চালানোর দৃষ্টান্ত বাংলাদেশেও তেমন মিলবে না।

সাবেক সরকারের আমলে গুটিকতক সাংসদ ও দলীয় কর্মীদের মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাসের কারণেই সরকারের গণেশ উল্টেছে এবং দেশবাসী বিগত নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া অর্থাৎ আপনার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বরমাল্যে ভূষিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। অথচ সাবেক শাসনামলে প্রকাশ্যে সাংসদ হত্যা, ঘোষণা দিয়ে অন্য সাংসদকে হত্যার প্রচেষ্টা, একের পর এক নির্বিচারে সাংবাদিক হত্যা, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীকে মাসের পর মাস গুম করে রাখা, ঢাকাতে ব্যবসায়ীর লাশের ২ শতাধিক খন্ডিত টুকরো রাস্তায় ছিটানো ইত্যাদি দেশবাসী অবলোকনের সুযোগ পায়নি।

তাই আইন শৃঙ্খলার চরম অবক্ষয়, সাংসদ হত্যা বা সাংসদকে হত্যার হুমকি, বিরোধী দলের সভায় বোমা হামলা সার্বিক বিচারে পূর্বের শাসনামলকে দুঃশাসন বলা হলে তুলনামূলক বিচারে বর্তমান আমলকে বলা হচ্ছে জ্বলন্ত নরক। যে দেশে সরকারি দলের একজন প্রভাবশালী সাংসদের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য হুমকির মুখে অন্য স্বতন্ত্র সাংসদকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রটেকশন প্রার্থনা করতে হয়, সে দেশের সাধারণ জনগণ কত ভয়াবহ অসহায়ত্বের শিকার তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে।

এম এম শাহীনকে নিছক কুলাউড়ার সংসদ সদস্য জ্ঞান করা সমীচীন হবে না। বরং তিনি নিজ এলাকাবাসী এবং সমগ্র প্রবাসী বাংলাদেশীদেরই প্রতিনিধি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে প্রবাসী বাংলাদেশীরাই অদ্যাবধি বাংলাদেশের ঘুণেধরা অর্থনীতির অচল চাকায় নিয়মিত তেলের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। তাই জনাব শাহীনের উপর হামলা ও তার প্রাণনাশের প্রচেষ্টাকে সরকার যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখুন না কেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। সরকারের উদাসীনতার ক্ষেত্রে হয়তো বা প্রবাসীদের প্রচেষ্টায় অনাগত ভবিষ্যতে এটি বহু দূরও গড়াতে পারে।

সঙ্গত কারণেই বলতে হচ্ছে যে পট পরিবর্তনের পর বিগত সরকারের অনেক বাঘা বাঘা সন্ত্রাসী ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের খেসারত হিসেবে বর্তমানে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। খালেদা সরকার এ মুহূর্তে দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে গুটি কতক চিহ্নিত দলীয় সন্ত্রাসীর দৌরাত্ম্যের খেসারত হিসেবে ভবিষ্যতে আপনার সরকারকেও হয়তো করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। তাই দলীয় সন্ত্রাস নির্মূলে এবং দেশে আইনের শাসনকে মজবুত করতে আপনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এম এম শাহীন এমপি আমেরিকার বিলাস বহুল জীবনের মায়া ত্যাগ করে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে গিয়েছেন দেশ ও মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়ে। বাংলাদেশে গিয়ে সংসদ সদস্য এম এম শাহীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা রাজনীতির ইতিহাসে বিরল। যেখানে দেশের গুটিকতক মানুষ এবং দেশের রাজনীতিবিদরা দেশের কোষাগার লুণ্ঠন করে দেশে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন সেখানে এম এম শাহীন এমপি নিজের জীবন ও নিজের সন্তানদের ভবিষ্যত নষ্ট করে দেশে গিয়েছেন শুধুমাত্র মানব কল্যাণে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করার জন্য। দেশ এবং মানব সেবায় তিনি এতো অন্ধ ছিলেন যে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেননি নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিলো বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ যেভাবে অন্ন বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য মরণপণ লড়াই করে গ্রামে বেঁচে আছে তার সন্তানরাও সেইভাবে বেঁচে থাকবে। এম এম শাহীন এমপি কুলাউড়ায় গিয়ে মেহনতি মানুষের সাথে বসবাস শুরু করেন। সন্তানদের ভর্তি করিয়ে দেন গ্রামের স্কুলে অন্য সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের বাচ্চাদের সাথে। কিন্তু এম এম শাহীনের টাকা পয়সার তেমন কোনো অভাব ছিলো না যে তিনি তার সন্তানের আমেরিকায় বা ঢাকায় কোনো ভাল স্কুলে পড়াতে পারতেন না। তার রাজনৈতিক আইডিওলজির কারণেই তিনি তার সন্তানদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশ আমলা রাজনীতিবিদের সন্তানরা ঘুষ বা চুরির টাকা দিয়ে বিদেশে লেখাপড়া করছে। আর রাজনীতিবিদরা দেশের অর্থ লুণ্ঠন করে স্বদেশেও উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বাণিজ্যসহ বাড়ি গাড়ি গড়ে তুলছেন। এখানেই এম এম শাহীনের সাথে অন্যান্য রাজনীতিবিদের পার্থক্য।

এম এম শাহীনের রাজনৈতিক নীতি, আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণতা কুলাউড়ার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলো এবং তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছিলেন বলেই চারদলীয় ঐক্য জোটের প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ও ডাকসুর সাবেক সভাপতি ব্যর্থ ও পশ্চাতমুখী নেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের মতো জাতীয় নেতাকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে। কুলাউড়ার মানুষ অন্যায় ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এম এম শাহীনকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। এম এম শাহীন এমপির জয়লাভ ও রাজনৈতিক কারিশমায় সিলেটের রাজনৈতিক অঙ্গনে পটপরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত বহন করে। তার মানবতাবাদী, রাজনৈতিক আদর্শ মানুষের মধ্যে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কুলাউড়ার মানুষ প্রমাণ করেছে, সন্ত্রাস করে, রামরাজত্ব কায়েম করে মানুষের মন জয় করা যায় না। কুলাউড়ার মানুষের কাছে ভন্ড ও প্রতারক রাজনীতিবিদদের চরিত্র উন্মোচন হয় পাশাপাশি সিলেটে বিএনপির অঘোষিত রাজনৈতিক গডফাদারের মৌলবাদী শক্তির

www.pathagar.com

পূনর্বাসনের নীল নক্সা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা কুলাউড়ার মানুষ গ্রহণ না করায় তার প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হয়। নির্বাচনে পরাজয় ও সিলেটের রাজনীতিতে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি জনগণের বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন অর্থমন্ত্রীর কাছে চপেটাঘাত মনে হয়েছে। যে কারণে এম এম শাহীন এমপি তার রোষানলে পড়েন। সেই থেকেই তিনি এম এম শাহীন-এর বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এমএম শাহীনের এলাকায় উন্নয়নের বাজেট অর্থমন্ত্রী বন্ধ করে দেন। শিক্ষা মন্ত্রী ওসমান ফারুক নিজের বন্ধুকে খুশী করতে গিয়ে কুলাউড়ার এমপিভুক্ত সকল সাহায্য বন্ধ করে রাখেন। উত্তরায় সরকারী প্লট পেলেও পূর্তমন্ত্রী আব্বাস হিংসার বশবর্তী হয়ে প্লট বরাদ্দ বাতিল করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কি জানেন বাংলাদেশের অধিকাংশ মন্ত্রী, এমপি অর্থমন্ত্রীর কাছে জিম্মি। তাকে তোয়াজ না করলে নাকি কেউ কিছু পায় না। এমপি, মন্ত্রীরা দুর্বল হলে তখন কী অবস্থা দাঁড়ায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীন দেশে এতো বৈপরিত্য কেন? কুলাউড়া কি বাংলাদেশের কোনো অঞ্চল নয়? যদি হয় তাহলে জনগণের নামে বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে টাকা আনার অংশ কেন কুলাউড়াবাসী পাবে না?

ভিক্ষা করে একটি জাতিকে একবেলা খাওয়ানো যায়, ঋণের বোঝা জনগণের মাথার উপর রেখে যাওয়া যায়। কিন্তু জাতিকে স্বাবলম্বী করতে হলে, ত্যাগ, জ্ঞান, শিক্ষা, সততা, সেবা, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ভিশনারী হতে হবে। এজেন্ট হিসাবে বিদেশী সংস্থার উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়, জাতিকে এগিয়ে নেয়া যায় না। তাই জাতিকে সামনে নিতে হলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আশে পাশের মেধাশূন্য অসৎ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। নেতৃত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে ইয়াংদের সুযোগ করে দিতে হবে। তাতে আপনি ও আপনার দল লাভবান হবে, জাতি উপকৃত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি হয়তো অবগত আছেন যে, অর্থমন্ত্রী কুলাউড়ার উন্নয়ন বরাদ্দ বন্ধ করে দিলে এম এম শাহীন এমপি পারিবারিক ও প্রবাসীদের সহযোগিতায় নিজ এলাকায় উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রাখেন- যা অর্থমন্ত্রীর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি সিলেটে এম এম শাহীনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেন। তিনি টের পান যে সিলেটে বিএনপির মাটি তার পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিলো- তাই তিনি এম এম শাহীন এমপিকে দমানোর জন্য তার পুত্রকে সংসদ সদস্য বানান। বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের অফিস থাকলেও কোনো সংসদ সদস্যের অফিস নেই। কিন্তু এম এম শাহীন নিজ খরচে নিজ এলাকায় ও ঢাকাতে একটি অফিস চালু করেন জনগণের সুখ-দুঃখের খবর রাখার জন্য। যাতে জনগণ এসে একটি জায়গায় বসতে পারে ও

www.pathagar.com

তার অভিযোগগুলো জানাতে পারে। এই সব মানব উন্নয়নমূলক কাজগুলো অর্থমন্ত্রী ও তার পুত্র নাসের রহমান এমপির অন্তরকে তীরের মতো বিদ্ধ করে। এম এম শাহীনের জনপ্রিয়তায় নাসের রহমান এমপি অস্বাভাবিক আচরণে লিপ্ত হন। প্রথমে এম এম শাহীন এমপিকে অর্থনৈতিকভাবে, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসী পথ বেছে নেন। সিদ্ধান্ত নেন এম এম শাহীনের মতো একজন জনপ্রিয় এমপিকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার। যে কারণে নাসের রহমান এমপি তার সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেন এম এম শাহীন-এর পেছনে। তারা মনে করেছিলেন যে এম এম শাহীনকে সরিয়ে দিলে সিলেটে তাদের পরিবারতন্ত্র কায়েম করা সহজ হবে।

এখন প্রশ্ন হলো এমএম শাহীন এমপির অপরাধ কি? তার উপর কেন এই মানবসভ্যতা বিবর্জিত হামলা চালানো হলো? এটি বিশ্লেষণ করলে সিলেটের রাজনীতির নোংরা কথা, নাসের রহমান এমপির সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা, তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অতিষ্ঠ জনগণের কথা, তার চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের কথা, হুমকি, ধমকি ও রক্তচক্ষু দিয়ে প্রশাসনকে নিজের তাবেদারী সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহারের কথা, সিলেটের কাঠ চোরাচালানের মাধ্যমে পাচারের কথা, মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বিরোধী শিবিরের সমর্থকদের ব্যাংকের উচ্চ পদে নিয়োগ করা এবং সর্বশেষ এম এম শাহীন এমপিকে প্রকাশ্য দিবালোকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেবার কথা ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান সম্পর্কে দিবালোকের জনসভায় ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ ভাষণের কথা জাতীয় সংসদে উত্থাপন করার বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। নাসের রহমান ও সাইফুর রহমানের অবৈধ কাজে সহায়তা করেছেন মৌলভীবাজারের তৎকালীন ডিসি মকলেসুর রহমান। যার বিরুদ্ধে সংসদে এম এম শাহীন অভিযোগ করেছেন। এই সব বিষয়গুলো সংসদে উত্থানের ফলে নাসের রহমান এমপি এম এম শাহীন এমপিকে খুন করার জন্য তার লালিত ও পালিত সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেন। একজন জনপ্রিয় প্রতিনিধিকে তার এলাকায় এসে খুন করার মতো নিকৃষ্টতম এবং পৃথিবীর জঘন্যতম কাজ করতে উদ্যত হন। কুলাউড়ার মানুষ তাকে নির্বাচিত করেছিলেন তাদের সেবা করার জন্য, অন্যকোন এলাকার মাস্তানের প্রতিহিংসার শিকারের জন্য নয় বা তাদের কথায় চলার জন্য নয়। কোনো সভ্য সমাজ এধরনের গর্হিত কাজ মেনে নিতে পারে না। যারা আইনের রক্ষক তারা যদি ভক্ষকে পরিণত হন তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থান কোথায়? তারা কার কাছে বিচার প্রার্থনা করবে? সন্ত্রাসী লালনের পাশাপাশি তারা কি আইনও লালন করে? আইন কি তাদের কথাতেই চলবে? তা না হলে মামলা করার পরও নাসের রহমান এমপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন? এদেশের আইনও যে ইশারাই চলে তার একটি

www.pathagar.com

বড় প্রমাণ হলো একজন জনপ্রতিনিধি অনন্যোপায় হয়ে থানার শরণাপন্ন হলে, থানার কর্মকর্তা কেনই বা কেইস নিতে চায় না। তাহলে সাধারণ জনগণের অবস্থাটা যে কত অসহনীয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। একজন সংসদ সদস্য অন্য একজন সংসদ সদস্যকে কিভাবে হত্যার নীল নক্সা প্রণয়ন করেন। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে নাসের রহমান এমপি এখন ভুলে গেছেন তার পরিবারের অতীত উত্থানের কথা। কথায় বলে না গোবরে সব সময় যে পদ্মফুল ফুটে না সেকথা মনে হয় অসত্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী আপনি তো জানেন সন্ত্রাসীদের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস সে কথাই বলে। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান ও ডাঃ ইকবালের মতো সন্ত্রাসী লালন করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কী পরিণতি হয়েছে? নাসের রহমান এমপির মতো একজন জয়নাল হাজারীই যথেষ্ট আপনার দলের ক্ষতির জন্য। সে সময় বেশি দূরে নয়। তাই সময় থাকতে সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।

সময় এসেছে এসব ব্যাপারে আপনার সরাসরি হস্তক্ষেপের। সময় এসেছে অর্থমন্ত্রীর পুত্র নাসের রহমান এমপি'র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার। আপনার নেয়া অনেক একক সিদ্ধান্ত আগেও যেভাবে প্রশংসিত হয়েছে, এ ব্যাপারেও আপনার তেমন একক সিদ্ধান্ত আমরা প্রবাসীরা আশা করি। এতে শুধু দেশই নয়, আপনার দলও লাভবান হবে বৃহত্তর সিলেটসহ সারাদেশে। ■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রবাসের সাংবাদিকতার অতীত এবং বর্তমান

প্রবাসে সাংবাদিকতার শুরু মূলত আশির দশকের মাঝামাঝি বিধায় এর অতীত ও বর্তমান নিয়ে আমি আশির দশক থেকে শুরু করছি। অবশ্য বাংলাদেশীদের কর্মকান্ড এর অনেক আগ থেকেই শুরু। প্রবাসী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো। প্রবাসীদের অগ্নিঝরা আন্দোলনের কথা কম-বেশি অনেকেরই জানা। আশির দশকে প্রবাসে তেমন বেশি পাঠক ছিল না, ছিল না বাংলাদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্য, মসজিদ-মন্দির , সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন। মানুষ ছিলো হাতে গোণা। এখন বাংলাদেশীদের প্রতিধ্বনি উত্তর আমেরিকার প্রতি কর্ণার থেকে প্রতিনিয়ত শোনা যায় যা আগে ছিল কল্পনাতীত।

www.pathagar.com

আশির দশকের মাঝামাঝি প্রবাসী নামে একটি পত্রিকা অনিয়মিত বের হতো। পত্রিকাটিতে প্রবাসী কম্যুনিটির কোনো প্রতিচ্ছবি ছিলো না। সেইজন্য পত্রিকাটি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি আমার ধারণা। প্রথম পত্রিকা হিসেবে সমাজের বহু লোকের কাছে থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তরা পত্রিকাটিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর পরিবর্তে একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তারা সচরাচর নিজেদের পছন্দসই ও তেল তোয়াজের লোকদের খবর ছাপাতেন। যাদের পছন্দ হতো না তাদের কোনো সংবাদ বা ছবি ছাপতেন না। তখন আমরা সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার স্বার্থেই বাঙালির সবচেয়ে পুরাতন সংগঠন 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার' সাথে জড়িত ছিলাম। বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার ব্যানারে আমরা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে পালন করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে ঐ পত্রিকায় এই সব নিউজ ছাপানো হতো না। এই ভাবে আরো অনেক সংগঠনের সংবাদ ইচ্ছাকৃতভাবে না ছাপানোর কারণে পত্রিকাটি সবার পত্রিকা হতে পারেনি। পারেনি পাঠকদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে। এই সব উপলব্ধি থেকেই বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্য ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন পত্রিকা বের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন ১৯৮৮/৮৯ সালের দিকে এবং দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য লেখকদের সাথে কথা বলেন। সেই চিন্তা চেতনা ও ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৯০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। প্রবাসের সাথে দেশের সেতুবন্ধ, সৎ, সুন্দর, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রবাসীদের হাসি কান্না, বেদনা ও আনন্দের প্রতিচ্ছবি এবং প্রবাসে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ঠিকানা প্রথম সাপ্তাহিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের পর পরই ঠিকানা মোটামুটিভাবে পুরো প্রবাসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মূলত ঠিকানাই একমাত্র পত্রিকা যা আত্মপ্রকাশের লগ্ন থেকে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। দলমত সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে এবং মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে ঠিকানা প্রবাসীদের এক এক করে মন জয় করে নেয়। প্রভাব ও বিত্তশালীদের অন্যায় আব্দার ও চাপের কাছে ঠিকানা কখনো মাথা নত করেনি। দেশে বিদেশে অনেক কোর্ট-কাচারি; মামলা-মোকদ্দমা ও জক্কি ঝামেলা অতিক্রম করে ন্যায় সুন্দর ও সত্যের বার্তাবহ হিসেবে ঠিকানা তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়। একাজে ঠিকানাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনেকের চক্ষুশূলে পরিণত হয় ঠিকানা। অনেক হুমকি ধমকি ও আন্দোলনের মুখে ঠিকানা তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্রও পিছপা হয়নি। মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ঠিকানা বহুবার বহু ব্যক্তি-সংগঠনের রোষানলে পড়ে। ঠিকানার জনপ্রিয়তায়

www.pathagar.com

ঈর্ষান্বিত হয়ে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন সময়ে ঠিকানাকে বিভিন্ন লেবাস পরানোর অপচেষ্টা করেছিল। কখনো বিএনপির পত্রিকা, কখনো বলার চেষ্টা করা হলো ঠিকানা আওয়ামী লীগের পত্রিকা, কখনো বা জাতীয় পার্টির পত্রিকা, কখনো জামাতের পত্রিকা। কখনো বলার চেষ্টা করা হলো ঠিকানা দেশ বিরোধী পত্রিকা, কখনও হিন্দু বিদ্বেষী, কখনও স্বাধীনতা বিরোধী, কখনও সিলেটীদের পত্রিকা। আবার অন্যদিকে প্রবাসে সম্মিলিতভাবে সব রাজনৈতিক দল ঠিকানার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডায় অংশ নেয়। কিন্তু সম্মানিত পাঠকদের সাথে নিয়ে ও তাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ঠিকানা পরিবার সমস্ত অন্যায় ও মিথ্যা ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে আজ পাঠকদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ও জাতিসংঘের বিপরীত দিকে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জয় করে নিয়েছে পাঠকদের হৃদয়। চলার পথে ঠিকানা আজ পর্যন্ত কোন অন্যায়ের সাথে অপোস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। ঠিকানা সব সময় দলমত, ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতি ও অন্যায়ের উর্ধে উঠে সব দলের, সব মতের সব বিশ্বাসের লোকদের মতামতকে একত্রিত করে সকলের মাঝে সোহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে বহির্বিশ্বের বাঙালিদের সাথে দেশের মানুষের সেতুবন্ধ তৈরি করা। এ কাজ করতে গিয়ে ঠিকানা পরিবারের অনেককেই অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে এবং অনেক সময় নানা অনাকাঙ্খিত অপবাদ শুনতে হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম পত্রিকাতে মেধার প্রতিযোগিতা হবে; কিন্তু কিছু সহকর্মীরা সে পথ না মাড়িয়ে প্রতিহিংসার আশ্রয় নিলেন। এমনকি ঐসব জ্ঞানপাপীরা কখনও বুঝার চেষ্টা করেনি যে নতুনদের স্বাগত জানানোর মধ্যে আনন্দ আছে ভয় পাবার কিছু নেই এবং এতে মেধার বিকাশ ও স্ফূরণ হয় ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাছাড়া কোনো কিছু চিরস্থায়ী নয়। আমেরিকা প্রতিযোগিতার দেশ। প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকতে পারলে এমননিতেই ঝরে পড়বে। ঠিকানা জন্মের পর বহু পত্রিকার জন্ম হয়েছে। কয়েকটি বর্তমানে রয়েছে বাকিগুলো ইতোমধ্যে ঝরে পড়েছে।

সত্য কথা বলতে কি আজ প্রবাস থেকে বাংলা ভাষাভাষী যতগুলো পত্রিকা বের হচ্ছে ২/১ টা ছাড়া বর্তমানে অন্য পত্রিকাগুলো মোটামুটিভাবে যারা চালাচ্ছেন তারা ঠিকানায় অতীতে কর্মরত ছিলেন -এটা শুনলে ভালোই লাগে। কিন্তু ঠিকানা থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধে নিয়ে চলে যাবার সময় অনেকেই ন্যূনতম পক্ষে সৌজন্যতাবোধ দেখাননি বরং পরবর্তীকালে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সামনে পড়লে এক ধরনের ব্যবহার দেখান এবং পেছনে গেলে নানান ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারা একটিবার ভাবেন না যে উক্ত পত্রিকাটির সাথে সম্পর্ক রাখলে তারাই লাভবান হতেন। সাময়িকভাবে নতুন কর্মস্থল ও

www.pathagar.com

মনিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা অতীতের সমস্ত সুন্দর দিনগুলোর কথা সহজে ভুলে যান। ভেতর এবং বাইর থেকে ঠিকানার বিরুদ্ধে অতীতে নানান ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে সাধারণ মানুষকে নানা সময় ঠিকানার বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ঠিকানার কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং যারা করেছে এবং করিয়েছে তাদেরই বেশি ক্ষতি হয়েছে। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ঠিকানার তথ্য চুরি করে ও অভিজ্ঞ কর্মীদের নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে অনেকেই ঠিকানার পূর্বে এবং পরে পত্রিকা বের করেছেন, এমন কি একই দিনে অনেকগুলো পত্রিকা করিয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। ঠিকানা থেকে চলে যাবার পর অনেকেই স্বার্থ উদ্ধারের পর তাদেরকে রাস্তায় বসিয়েছেন। অথচ আল্লাহর রহমতে ঠিকানার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়নি এবং যাবতীয় ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ঠিকানা তার আপন মহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ ঠিকানার মূল শক্তি তার সম্মানিত পাঠক, খবরের বস্তুনিষ্ঠতা ও সততা এবং পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতা ।

ঠিকানা ত্যাগের পর কেউ কেউ পত্রিকা বের করেছেন নতুবা কোনো ব্যবসায়ীর পত্রিকায় যোগ দিয়েছেন। তারা প্রথমেই টার্গেট করেন ঠিকানাকে এবং ঠিকানার উপর আঘাত হানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। যে ঠিকানা এক সময় তাদের অবলম্বন ছিলো , যার মাধ্যমে তাদের প্রবাসে বা দেশে পরিচয় গড়ে উঠেছিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে সেই ঠিকানাকেই তারা ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠেন। সকলের শেষে পত্রিকা বের করে যারা সমসাময়িক পত্রিকাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে সচেষ্ট না হয়ে এক লাফে গাছের মগ ডালে চড়ার ঢঙে সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে আত্মহননের পথ বেছে নেয় কার্যত তাদের প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনা। উল্টো দু'দিনেই তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তখন সব খুইয়ে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। ঠিকানার বিরুদ্ধে এই নিষ্ফল আন্দোলন এখনো অব্যাহত রয়েছে। মাঝে মধ্যে অবশ্য ঠিকানাকে কাবু করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দেন; আবার সময় সুযোগ এলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেন। ঠিকানার বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা আক্রোশ যেনো শেষ হবার নয়। অথচ ঠিকানা হাঁটি হাঁটি পা পা করে সম্মানিত পাঠকদের ভালোবাসা নিয়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। ঠিকানা যখন বের হয় তখন প্রবাসে সাংবাদিক পাওয়া যেত না, কম্পজিটার পাওয়া যেতো না, ডেলিভারী ম্যান পাওয়া যেতো না, তথ্য প্রযুক্তি আজকের মত এতো উন্নত ছিলো না যে টিপ দিলেই সব সময় খবর পাওয়া যেত বা দেখা যেতো না। তখন ঢাকা থেকে নিউজ আনতে কাড়ি কাড়ি অর্থ

www.pathagar.com

ব্যয় করতে হতো। প্রতি মিনিট কথা বলার জন্য ৩ থেকে ৪ ডলার ব্যয় করতে হতো। হাতে প্যাস্টিং করতে গিয়ে এক নাগাড়ে ২-৩ দিন অহর্নিশ কাজ করতে হতো। ফ্যাক্স টেলিফোন অত্যন্ত ব্যয় বহুল ছিলো অর্থাৎ পত্রিকা প্রকাশ করা তখন খুব কষ্টের ছিলো। টেলিফোন লাইন পাওয়ার জন্য বুকিং দিয়ে ২/১ দিন অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে পত্রিকা করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। নামমাত্র পরিশ্রমে কাটিং ও প্যাস্টিং করে রাতারাতি পত্রিকা বের করা যায়। এমন কি কিছু টাকা দিয়ে ঢাকা থেকে পত্রিকা করে এনে নিউইয়র্কে সাংবাদিক সাজা যায়। অনবদ্য কারণে অনেক অপেশাদার ব্যক্তি কৌতূহল বশে বা অন্যের প্ররোচনায় পত্রিকা প্রকাশের নামে প্রচারপত্র প্রকাশ করে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে সর্বস্ব হারিয়েছেন। বাকিরা হয়তোবা হারাতে বসেছেন। বাঙালির সাধারণ প্রবৃত্তি হলো তারা ভিন্ন কিছু চিন্তা করতে জানে না। শুধু অন্যকে অনুসরণ করতে ও গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে অভ্যস্ত। একটি জিনিস শেষ না করা পর্যন্ত তারা থামে না। এক সময় যারা গ্রোসারী, ট্রাভেল ব্যবসা, রেষ্টুরেন্ট শুরু করেন, পরবর্তীতে অন্যরা এসে এই ব্যবসাগুলো ধ্বংস করেছে। তারা একবার ভাবেননি আদৌ এই ব্যবসার প্রয়োজন আছে কিনা? ঠিক তেমনি, মিডিয়া জগতে যারা আসছেন, তাদের নিজেদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা আছে কি না তা যাচাই করে না। কম্যুনিটিতে এতো মিডিয়ার প্রয়োজন আছে কিনা বা যারা মিডিয়া চালায় তাদের আর্থিক অবস্থা কেমন, জ্ঞান আছে কি-না, এরা আদর্শবান মানুষ কিনা ইত্যাদি। যদি তারা নিজেদের চেহারা আয়নায় দেখতে পারতেন তাহলে হয়ত অন্যভাবে জীবিকার্জন বা প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্যোগ নিতেন। আমেরিকায় জীবন-জীবিকার জন্য তো কারো কোনো অসুবিধে হয় না। যখনই দেখে এই পেশায় সৎভাবে বেঁচে থাকা যাবেনা তখন দায়ে ঠেকে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন এবং চিহ্নিত অপরাধীদের আড়ালে আবডালে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শ্রুতিকটু হলেও বলতে হচ্ছে-যাদেরকেই কাজ শিখিয়ে প্রবাসে ঠিকানা কর্মী হিসেবে গড়ে তুলেছিল এবং যাকে পুঁজি করে আজ তাদের অনেকে অনেক স্থানে প্রতিষ্ঠিত; ঠিকানা থেকে তাদের অনেকেই অনেক কিছু পেয়েছেন কিন্তু বিনিময়ে ঠিকানাকে দিয়েছেন নানান যন্ত্রণা।

কখনো কখনো মনে হয় আমরা বাঙালিরা মানসিকভাবে সত্যিই দরিদ্র। এমনিতেই বাঙালিদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস কম। অনেকেই রয়েছেন যারা বলে থাকেন-আমি খুব ব্যস্ত, পত্রিকা পড়ার সময় নেই। এমনও ব্যক্তি রয়েছেন যারা সপ্তাহে ১ ডলার খরচ করে ১টি পত্রিকা কিনেন না। অথচ তাদের অর্থের কোনো কমতি নেই। তারা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করছেন।

www.pathagar.com

অথচ দৈনিক ১০ সেন্ট পত্রিকার জন্য ব্যয় করতে তাদের চরম অনীহা। তারা যদি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি কম্যুনিটি বির্নিমাণে এগিয়ে আসতেন, তাহলে আজকে কম্যুনিটির চেহারা অনেক সুন্দর হতো। সূচনালগ্নে পাঠক তৈরির উদ্দেশ্যে ঠিকানাকে পাঠকের নিকট পৌঁছানোর জন্য অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে বিনামূল্যে পত্রিকা দেয়ার চেষ্টা করেছি। অনুষ্ঠান আয়োজকগণ আমাদেরকে অনুষ্ঠানে ঢুকতে দেননি। অগত্যা পত্রিকাটি অনুষ্ঠানস্থলে রেখে তাদের নাক ছিঁটকানী ও হেলু টাইপের চেহারা দেখে ফিরে এসেছি। আবার অনেকের সাহায্য এবং সহযোগিতাও পেয়েছি। বর্তমানেও অনেক লোক আশা করেন ফ্রি পত্রিকার জন্যে। কিন্তু একটি উন্নত বিশ্বে বসবাস করে যেখানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা, সেখানে তারা বিনা মূল্যের পত্রিকা আশা করেন। অথচ একটি বার তারা ভাবেন না যে এই পত্রিকাটি তৈরি করে পাঠকের নিকট পৌঁছাতে কি পরিমাণ আর্থিক বিনিয়োগ, কতো লোকের শ্রম ও সাধনা জড়িত রয়েছে। যারা ফ্রি পত্রিকা পাবার আশা করেন তারা যদি দরিদ্র হতেন তা হলে কথা ছিলো না। ফ্রি পড় য়া পাঠক বা যারা পত্রিকা পড়েন না আসলে তারা রুচিবান না। কিন্তু মানুষকে সমাজে দেখানোর চেষ্টা করেন তারা রুচীবান। যাহোক, ঠিকানাকে অন্য পত্রিকা ভাবলে চলবে না। ঠিকানার পেছনে শত কর্মী-বাহিনীর শ্রম আর ঐ কর্মীবাহিনীর পরিবারের অনেককেই নির্ভর করতে হয় তার আয়ের ওপর।

ঠিকানা একমাত্র পত্রিকা এই প্রবাসে আমরা যারা মার্কেট তৈরি করেছি, পাঠক সৃষ্টি করেছি, লেখক-লেখিকাদের পৃষ্ঠপোষকতাসহ বহু জিনিস করার চেষ্টা করেছি। যার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট, সাধনা, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিহিংসা, ব্যক্তিগত আক্রোশ বশে অপেশাদারিত্বের কারণে আমাদের তৈরি করা মার্কেটকে এখন অনেকেই বড় না করে ধ্বংস করার প্রতিযোগিতা করছেন। তাদের মনোভাব এমন যে আমি যেহেতু খেতে পাচ্ছিনা অন্যকেও খেতে দেবো না। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ঠিকানা একমাত্র পত্রিকা যেখানে প্রফেশনাল সংবাদকর্মী রয়েছেন। প্রফেশনালিজম বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র ঠিকানাতে রয়েছে। একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য যা প্রয়োজন তা রয়েছে একমাত্র ঠিকানাতেই। অন্যদিকে বর্তমানে প্রবাসে যারা সংবাদপত্র বের করছেন তাদের কেউ কেউ এটাকে পেশা হিসেবে নেননি, নিয়েছেন আত্মপরিচয় ও নিজেদের অপরাধ আড়াল করার মাধ্যমে হিসেবে। তারা যেহেতু আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভোগেন সেহেতু যেনোতেনোভাবে পত্রিকা বের করেন। তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ না হওয়ায় সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বা প্রফেশনাল পত্রিকা না বলে প্রচারপত্র বলাই শ্রেয়। যারা পত্রিকা বের করেছেন তাদের কেউ হলেন পেশায় ডাক্তার, কেউ রিয়েল এ্যাস্টেট ব্যবসায়ী, কেউ টেলিফোন ব্যবসায়ী, কেউ ইমিগ্রেশনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ব্যবসা করেন।

www.pathagar.com

আবার কেউ বা ট্যাক্সি চালক, কেউ বা তেলের ব্যবসায়ী কেউ বা ইন্টার-প্রেটার। অর্থাৎ তাদের পেশা নানান ধরনের। তারা পেশাগতভাবে কেউ সাংবাদপত্রের সাথে জড়িত না। শুধুমাত্র প্রধান সম্পাদক, সম্পাদক, প্রকাশক বা সাংবাদিক হিসেবে কমিউনিটিতে পরিচিতি বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে চেয়ার পাওয়ার জন্য পত্রিকা বের করেছেন চিরায়ত পেশাকে পাশ কাটিয়ে। বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে অনেকে রয়েছেন একটু অর্থ হলেই যারা পত্রিকা বের করার স্বপ্ন দেখেন এবং অনেক সময় রাতারাতি পত্রিকার নামে প্রচারপত্র বেরও করেন। কিন্তু আমরা উন্নত বিশ্বে কী দেখতে পাই? নিউইয়র্ক সিটির মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো অঢেল বিত্ত-বৈভবের মালিকরা স্বীয় পেশার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা বশে পত্রিকা প্রকাশ করার স্বপ্ন দেখেন না। তারা তো ইচ্ছা করলে নিউইয়র্ক টাইমসের মতো দিনে কয়েকটি পত্রিকা অনায়াসে বের করতে পারেন। যাদের যে পেশা তারা সেই পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা আমাদের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই বিধায় নিজেদের আসল পেশাকে লুকিয়ে নকল পেশাকে নকল লোক দিয়ে চালানোর চেষ্টা করি। আর অনেকে প্রবাসে পত্রিকা বের করে প্রথমেই ঠিকানাকে টার্গেট করেন। ঠিকানায় যারা কাজ করে তাদের বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে কয়েক মাস কাজ করিয়ে তাদেরকে পথে বসিয়ে দেন। আবার বিভিন্ন স্টেটে ঠিকানার যারা প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের ভাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। অনেকে আবার ঠিকানার সৃষ্টিশীল কাজ চুরি করে কপি করেন। আর ঠিকানার বিরুদ্ধে সবাই এক মঞ্চে অবস্থান নেন। প্রবাসে এমন কিছু বিকারগ্রস্ত লোক বসবাস করছে যারা নিজেকে অনেক কিছু মনে করেন। তারা প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে নানান ষড়যন্ত্রে মেতে থাকেন কি ভাবে পত্রিকা শিল্পকে ধ্বংস করা যায়।

প্রবাসে অনেক সাংবাদিক রয়েছেন যারা শুধু সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেয়ার বা বিশেষ সুবিধে হাসিলের জন্য নামেমাত্র পত্রিকার সাথে জড়িত থাকেন বা পার্টটাইম সাংবাদিকতা করেন। বাস্তবে কেউ ট্যাক্সি চালান, কেউ বা গ্যাস স্টেশনে কাজ করেন, কেউ বা দ্বার রক্ষক, আবার কেউ কোনো দোকানে কাজ করেন। বিভিন্ন সময় পরিচয় দেন আমি অমুক পত্রিকার সাংবাদিক বা ঢাকার অমুক পত্রিকার প্রতিনিধি। অথচ তাদেরকে দেখা যায় অধিকাংশ সময় অন্য কাজ করতে। যারা নিজেদের পেশার প্রকৃত পরিচয় দিতে লজ্জা পান তারাই সাংবাদিকতার মতো মহান পেশাকে কলংকিত করতে সাংবাদিকতার মুখোশ পরে থাকেন। প্রবাসের সংগঠনগুলো আজ কাল অনুষ্ঠান করতে ভয় পান। কারণ সাংবাদিকদের দাওয়াত দিতে গেলে এখন ৪০ থেকে ৫০ জন সাংবাদিক উপস্থিত হন। প্রবাসে এখন সংবাদপত্র ও টিভি মিডিয়ার সংখ্যা সব মিলিয়ে ২৪ টির বেশি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ২৪টি প্রতিষ্ঠানের ২ জন প্রতিনিধিকে বললে কতো জন হয়। সেই ভয়ে

www.pathagar.com

অনেকে অনুষ্ঠান করতে ভয় পান। আবার অনেকেই রয়েছেন যারা অনুষ্ঠানে গিয়ে পেটপুরে খেয়ে আসেন, কিন্তু তাদের পত্রিকায় কিছুই লেখেন না। অনেক সময় ঢাকা থেকে কোনো উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, এমপি আসলে পার্টটাইম সাংবাদিকদের দৌরাত্ম্যে পেশাদার ও সার্বক্ষণিক সাংবাদিকরা বসার সিট পর্যন্ত পান না। অনেক সময় দেখা যায় পার্টটাইম সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময় ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে থাকেন। যে কারণে কিছু কিছু প্রবাসী সাংবাদিককে এখন সাধারণ প্রবাসীরা খুব একটা সম্মানের চোখে দেখেন না। আমরা নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের কারণে পদে পদে সম্মান হারাচ্ছি। সম্মান এমন একটি জিনিস যা অর্জন করতে হয়। প্রবাসে মাঝেমধ্যে দেখা যায় দিন কয়েক বা সপ্তাহ কয়েকের জন্য কেউ পত্রিকা বের করে নিজেদেরকে কখনও দেশপ্রেমিক, কখনও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে বলে চালানোর চেষ্টা করেন। আসলে ঐ সব ব্যক্তি তাদের অতীতের কুকর্মগুলো ঢাকার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয়ে আবির্ভূত হন। নিজেদের বর্তমান পেশাকে আড়াল করে মানুষকে পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেন আমি সাবেক অমুক, সাবেক তমুক। ঐ সব বহুরূপী ও বর্ণচোরাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। কারণ বর্ণচোরা ও অপসাংবাদিকদের খপ্পর থেকে যতো তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে আসতে পারি ততোই আমাদের মঙ্গল। অন্যথায় কমিউনিটি ও জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দুর্ভোগ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

প্রবাসে সংবাদপত্র পেশায় যারা জড়িত রয়েছি আমরা নিজেরাও নিজেদের সম্মান করতে জানি না। সেক্ষেত্রে অন্যের কাছ থেকে সম্মান আশা করা অনেকটা দুরাশা মাত্র। পেশার প্রতি কমিটমেন্ট না থাকার কারণে প্রবাসের অনেক সাংবাদিককে বিভিন্ন ব্যক্তি ,সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের লেজুড় বৃত্তি করতে দেখা যায় – যা সাংবাদিকতা পেশার জন্য সত্যিই লজ্জার বিষয়। একজন সংবাদপত্রসেবী যদি সমাজের কালো মানুষ, অসৎ মানুষের, আইনের চোখে অপরাধীদের অর্থের কারণে বুদ্ধি, পরামর্শ দেন এবং তার পারপাস সার্ভ করেন সেক্ষেত্রে ঐ কথিত সাংবাদিককে সম্মান করার মতো কোনো কারণ আমি দেখি না। অর্থের বিনিময়ে যারা নিজের মরালিটিকে, বিবেক বুদ্ধিকে অসৎ ও কালো মানুষগুলোর কাছে বিক্রি করে দেন তাদেরকে আর যাই বলি সাংবাদিক বলা যাবে না। আমাদের অনেকেই অধিকাংশ সময় অপেশাদার সুলভ আচরণ করি।

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছে এবং অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। প্রবাসে সাংবাদিকতা জগতেও এখন চলছে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে যুদ্ধ। ঠিকানা সব সময়ই ন্যায়,সত্য ও সুন্দরের পক্ষে ছিলো, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু প্রবাসে সাংবাদিক নামধারী কিছু ব্যক্তি সব সময়ই

www.pathagar.com

অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন ঠিকানার বিরোধিতা করার খাতিরে। আইনের চোখে যে অপরাধী ঠিকানা তাকে অপরাধী হিসেবে দেখে; যে কারণে ঠিকানা কালোবাজারি, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, রিয়্যাল এস্টেট জালিয়াতি,ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতিসহ সমাজের বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। আর অপেশাদার সাংবাদিকরা তাদের সাথে হাত মিলিয়ে নানান খবরের মাধ্যমে অহরহ জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টির চেষ্টা করছেন; কেউ বা অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে আবার কেউ বা ভয়ে। ঠিকানা যদি কোনো অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে লেখে, আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখে, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির বিরুদ্ধে লেখে তখন অন্যরা অন্যায়কারীর পক্ষে অবস্থান নেন। কপিকাট সাংবাদিকতা ও অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে যাবার কারণে তথাকথিত সাংবাদিকদের নিয়ে কালো মানুষগুলো তাদের পারপাস সার্ভ করেন এবং অপকর্ম করান। অতএব, এখন সময় এসেছে পেশাদার ও অপেশাদার সাংবাদিক তথা সাংবাদিকের মুখোশধারীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করার । প্রবাসের যে সকল সাংবাদিক কমিউনিটির নোংরা মানুষগুলোর সাথে ওঠাবসা করেন এবং নিজেরাও অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত তাদের বর্জন করতে হবে সাংবাদিকতার বৃহত্তর স্বার্থেই। প্রবাসে কারা সঠিক সাংবাদিতা করছে, অন্যদিকে কারা অনৈতিক কাজে সাড়া দিচ্ছে তাদেরকে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে। প্রবাসে ঠিকানার সাংবাদিকরা স্পট রিপোর্ট করেন, আর অন্যরা লোকমুখে শুনে সাংবাদিকতা করেন। বিভিন্ন কারণে আমাদের আদর্শ, নীতি ও নৈতিকতা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। যে জন্য পদে পদে আমরা নিজেদের সম্মান হারাচ্ছি। একজন সাংবাদিক যদি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত রেস্টুরেন্ট ও আড্ডায় খেজুরী আলাপ করে, তাহলে সাধারণ প্রবাসীরা সাংবাদিকদের সম্মান করবেন কেন? রাতের পর রাত বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দৌড় ঝাপ করি, তাহলে সাধারণ মানুষ সম্মান করবে কেন? প্রকৃত সাংবাদিকরা অনেক সময় তাদের থেকে নিজের সম্মান রক্ষার্থে অনেক দূরে থাকেন।

যোগ্যতার মানদন্ডে যাদের সমাজের পেছনের সারিতে থাকার কথা আমরা নিজেদের স্বার্থে পত্রিকার লোকেরা তাদের প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছি। এই অযোগ্য, অথর্ব ও অশিক্ষিত লোকগুলোকে নেতৃত্বে টেনে আনার কারণেই কম্যুনিটির বর্তমান এই কাহিল অবস্থা হয়েছে। নেতৃত্ব শূন্য হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলাদেশী কম্যুনিটি। কম্যুনিটিতে এখন অসৎ মানুষদের রাজত্ব চলছে। নিজের অপকর্ম ঢাকার জন্য তারা অর্থের বিনিময়ে চেয়ার কিনে ভালো মানুষ সাজার অভিনয় করছেন। যেখানে কৃতকর্মের জন্য তাদের লোক চক্ষুর আড়ালে থাকার কথা সেখানে তারা আড়ালে না গিয়ে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে অর্থের জোরে চেয়ার

www.pathagar.com

কিনে ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন সময় দেখা গেছে পত্রিকায় সত্য কথা লিখলে অসৎ মানুষগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে সাংবাদিককে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন বা করানোর চেষ্টা করেন। এই সুযোগগুলো তাদেরকে আমরাই সৃষ্টি করে দিয়েছি। সমাজের নোংরা মানুষগুলোর সাথে কিছু কিছু ভদ্রবেশী অভদ্রলোক রয়েছেন। তাদের অপকর্মের কথা, অন্যায়ের কথা, চুরির কথা, জালিয়াতির কথা লিখলেই পত্রিকা খারাপ। কম্যুনিটির অনেক ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা ঐসব অসৎদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এদেরকে আমাদের বর্জন করতেই হবে। পত্রিকার কাজ হলো- সত্য, সুন্দর ও সৃজনশীল কর্মকান্ডের প্রশংসা করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এইতো সেই দিনের কথা। কানেকটিকাটের গভর্নর তার বাসায় শুধু অবৈধভাবে পাঁচ হাজার ডলারের কাজ করার কারণে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে এবং এক বছর জেলের ভেতর থাকতে হয়েছে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে। অন্য একটি ঘটনা রিপাবলিকান দলের মেজরিটি পার্টির নেতা টম ডেসেলের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আসলে তিনি ক্ষমা চেয়ে তার পদ থেকে নিজেই সরে দাঁড়ান। এভাবে অসংখ্য ঘটনার কথা বলা যাবে। অথচ আমরা কি করি- সমাজের সম্মানিত লোকদেরকে অবজ্ঞা করে তাদের স্থলে সমাজের বিভিন্ন সময় অপরাধমূলক কাজে জড়িত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বিভিন্ন অপরাধীকে অর্থের বিনিময়ে এনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বানানোর চেষ্টা করি। নির্বাচনে নিজেদের অর্থে ভোটার বানিয়ে ভোট দিয়ে এই সব অপরাধীদের জয়ী করতে দ্বিধা করি না। পক্ষান্তরে পরোক্ষভাবে তারা ঐ সমস্ত লোকদের টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করে থাকেন। ঐ সমস্ত নানা অপরাধীদের সাথে জড়িতরা তাদের ডানে-বামে সমাজের দু-একজন ভালো মানুষকে টাকার বিনিময়ে এনে বসানোর চেষ্টা করেন। এমন কি এদেশের কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীকেও বসান পয়সার বিনিময়ে। অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে যারা ঐ সব অপরাধীদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তাদের সম্বন্ধেও আমাদের একটি ধারণা থাকা দরকার। আমাদের জানতে হবে এরা কারা, কেনই এইসব অপরাধমূলক কাজে জড়িত লোকদের জন্য কষ্ট করে এরা কাজ করে, অপেশাদার সাংবাদিকরা এদের খবর ফলাও করে ছাপায়? অর্থাৎ কোনো লাভ আছে কিনা ইত্যাদি। সমাজে ঐ সমস্ত নোংরা কাজে অভিযুক্ত অপরাধীদের কাজকে প্রচার করার জন্য অধিকাংশ অপেশাদার সাংবাদিক কাজ করে থাকেন এবং বিনিময়ে নিজেরাও মাল-পানি হাতড়ে নেন। তাই এদেরকেও চিহ্নিত করতে হবে সমাজে। এদের অনৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা রাখতে হবে। আমরা যারা পেশার প্রতি আন্তরিক অনেক সময় ওদের কারণে আমাদেরকেও সমস্যায় পড়তে হয়।

মূলত ন্যায়ের পথে লড়াই করা, অন্যায়কারীদের মুখোশ সমাজে উন্মোচন করা

www.pathagar.com

এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করাই সংবাদপত্রের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যায়? ঠিকানা প্রকৃতপক্ষে কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে লিখলে, একই সময় অন্য পত্রিকাগুলো তাদেরকে ভালো মানুষ বানানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। আমার প্রশ্ন কোর্ট বা ঠিকানার কাছে কোনো ব্যক্তি অপরাধী হলে অন্য পত্রিকার কাছে ঐ ব্যক্তি ভালো মানুষ হয় কিভাবে? এতে বুঝতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য কি? এটা করতে পারলে টু পাইস কামানো যায়। বাস্তবে আমাদের পেশার প্রতি প্রতিশ্রুতি না থাকার কারণে এগুলো হচ্ছে।

ঠিকানা শুধুমাত্র একটি পত্রিকা নয়। ঠিকানা একটি আন্দোলন। প্রবাসে বাংলাদেশী কম্যুনিটি বিনির্মাণে এবং মূলধারার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির যোগসূত্র তৈরি করতে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঠিকানা কাজ করে আসছে। ঠিকানা পরিণত হয়েছে প্রবাসীদের দাবি আদায়ের হাতিয়ারে। ঠিকানা একটি আন্দোলনের নাম যে আন্দোলনের ফলে ঠিকানা প্রবাসীদের দাবি আদায়ে প্রবাসে প্রবাসী মন্ত্রণালয়, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সোনালী এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশ বিমান, এয়ারপোর্টে যাত্রী হয়রানী বন্ধ ও সর্বোপরি জাতীয় সংসদে একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত করতে নানানভাবে সাহায্য করেছে। নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ঠিকানার সম্পাদক মন্ডলীর চেয়ারম্যান এম এম শাহীন প্রবাসীদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কুলাউড়ার জনগণ ও প্রবাসীদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন। তার উত্থাপিত অনেক দাবি (প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট) ইতিমধ্যে বাস্তবে রূপ পেয়েছে। তার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রবাসীদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রবাসীদের সরকারিভাবে রাজউকের ফ্লাট দেয়া হচ্ছে। এয়ারপোর্টে বন্ধ হয়েছে প্রবাসী যাত্রীদের হয়রানি। প্রবাসীদের আরো অনেক দাবি তিনি ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন- যা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এম এম শাহীনই একমাত্র প্রতিনিধি যিনি প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে কথা বলছেন। ঠিকানা প্রবাসে বাংলাদেশীদের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে। ঠিকানা শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন ও প্রবাসীদের দাবি আদায়ে সোচ্চার নয়, ঠিকানা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশে ও প্রবাসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসে ও দেশে ঠিকানার ভূমিকা সমুজ্জ্বল। সমাজের প্রতিটি ভালো কাজে ঠিকানা তার হাত সম্প্রসারিত করেছে, দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কম্যুনিটির স্বার্থে মঙ্গলজনক কাজে ঠিকানা প্রতিবার এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে আসবে। কম্যুনিটির বিভিন্ন সেবামূলক কাজে ঠিকানা আর্থিকভাবে এগিয়ে এসেছে। প্রবাসে বিভিন্ন স্কুল কলেজের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করে তাদেরকে উন্নত জীবন গড়ার কাজে সহায়তা করে আসছে এবং কবি-সাহিত্যিক ও মূলধারায় প্রতিষ্ঠিতদেরকে স্বীকৃতি

www.pathagar.com

দিয়ে কম্যুনিটি বিনির্মাণে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

ঠিকানার গ্রহণযোগ্যতার কারণেই প্রবাসে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত সফরে আসা বাংলাদেশের একাধিক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, নেত্রী, মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কবি, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পপতি, সাংবাদিক প্রমুখ ঠিকানা অফিস পরিদর্শন করেন।

ঠিকানা দেশের সাথে প্রবাসের সেতুবন্ধ রচনার পাশাপাশি এই প্রবাসে অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছে। আবার বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক প্রথিতযশা সাংবাদিক, কবি, লেখক, সাহিত্যিকদের লেখা প্রতিনিয়ত ছাপছে। সেই হিসেবে বলা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতেও ঠিকানা অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে।

দেশে ও প্রবাসে বাংলাদেশীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক কর্মকান্ডে এবং খেলাধুলার প্রসারে ঠিকানা বারবার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে এবং যত্নের সাথে খবর ছাপিয়ে সুন্দর কম্যুনিটি বিনির্মাণের আন্দোলনে সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সম্মেলনে থাকে ঠিকানার পৃষ্ঠপোষকতা।

প্রবাসে যখন প্রথম সাংবাদিকতা শুরু হয় তখন আমাদের মধ্যে এতো বিরোধ ছিলো না, প্রতিযোগিতা ছিল ভালো করার। আমাদের মধ্যে মতপাথর্ক্য ছিলো। যেহেতু আমরা বিভিন্ন মতে, বিভিন্ন আদর্শে ও বিভিন্ন তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু বর্তমানে সাংবাদিকদের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও পেশীশক্তি প্রদর্শনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অনেকেই আবার সভার আয়োজন করে হুমকি দেবার চেষ্টা করে। ঐসব অপরাধমূলক কাজে জড়িতরা গর্তে থাকার পরিবর্তে নিজের সুন্দর চেহারা কি আয়নায় দেখতে পায় না? যে কারণে একে অন্যের ধ্বংস বা ক্ষতি কামনা করেন। যে হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে ঠিকানা অনেকের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ঠিকানাকে চিরতরে স্তব্ধ করতে প্রতিনিয়ত, ষড়যন্ত্র করে চলেছেন। কিন্তু সম্মানিত পাঠকদের ভালোবাসায় সত্যের পক্ষে অবিচল থাকায়, অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করায়, কারো সাথে আপোষ না করায় ঠিকানা বাঙালি পাঠকদের ঠিকানা হিসেবে বেঁচে রয়েছে এবং আশা করি বেঁচে থাকবে। ■

www.pathagar.com

প্রবাসে সংবাদপত্রের ভবিষ্যত ও আমাদের করণীয়

জীবন- জীবিকার সন্ধানে বাংলাদেশীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে। বর্তমানে দেশে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী মহল ছাড়া দেশে সাধারণ মানুষের কোন অবস্থান নেই। যে আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে বাঙালিরা দেশ স্বাধীন করেছিলো, স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাজনৈতিক হানাহানি ও কিছু উচ্চাভিলাষী মানুষের জন্য সে আশা- আকাঙ্খা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। সর্বক্ষেত্রে আজ স্থবিরতা; ভয় ও অস্থিরতা অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করছে। আমরা এক ধাপ আগাইতো দুই ধাপ পিছিয়ে যাই। দেশে গণতন্ত্র, আইনের শাসন নামে মাত্র প্রচলিত। বেকার যুবকদের জন্য স্বদেশে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা

www.pathagar.com

থাকলে কারো হয়ত বাইরে যাওয়ার আগ্রহ থাকতো না। কিন্তু দেশের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে কষ্টার্জিত অর্থে পড়াশুনা করে ঐ সমস্ত জ্ঞানী- গুণীরা অন্য দেশে শ্রম দিচ্ছে। তারপরও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কঠিন পরিবেশে বসবাস করে সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা মুখ্য ভূমিকা রাখছেন। উত্তর আমেরিকায় বাঙালিদের বসবাস খুব দীর্ঘ কালের না হলেও কম দিন হয়নি। বর্তমানে আমেরিকায় বাঙালিদের একটি শক্ত অবস্থান রয়েছে। নানা কারণে প্রবাসে বাংলাদেশীরা অনেকেই এটিকে তাদের নিরাপদ আবাস হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আমেরিকার সমাজ জীবনে আইনের শাসন বিদ্যমান; ধনী- দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান সামান্য থাকলেও প্রতিযোগিতা করে নিরাপদে একজনের বড় হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সত্তর দশকে সামান্য কিছু সংখ্যক বাঙালি এদেশে আসলেও আশি এবং নব্বই - এর দশকে প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা বাড়তে শুরু করে ওপি-১, ডিভি লটারীর মাধ্যমে। তখন নতুন করে প্রবাসে বাঙালিদের বসবাস অনেকেই ভালভাবে নেননি। কিন্তু কর্মঠ বাঙালিরা নতুন সমাজে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেকেই শুরু করেন ব্যবসা-বাণিজ্য। নতুন করে বসবাস করা বাঙালিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা ও প্রবাসী বাঙালিদের নিজস্ব একটি ঠিকানা দেয়ার জন্য অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার পরও ২১ ফেব্রুয়ারির দীপ্ত শপথ নিয়ে ঊনিশ বছর পূর্বে ঠিকানা তার যাত্রা শুরু করে। সেই যাত্রা থেকে আজ অবধি ঠিকানা কখনো থেমে থাকেনি। ঠিকানা শুধু প্রবাসে বাঙালিদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেনি, তার পাশাপাশি সারা বিশ্বের প্রবাসী বাঙালিদের সমস্যার কথা বার বার সরকারের কানে পৌঁছে দিয়েছে। যদিও খালেদা জিয়ার সরকার প্রবাসীদের কিছুটা দাবি দাওয়া পূরণ করেছে, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। ভবিষ্যতে আশা করি প্রতিটি সরকার প্রবাসীদের পকেটের দিকে না তাকিয়ে তাদের দাবি- দাওয়ার প্রতি আন্তরিক হবেন। তাতে উভয়ই লাভবান হবে।

কম্যুনিটিকে আরো সমৃদ্ধ, বাংলাদেশের সাথে প্রবাসীদের সেতুবন্ধ, প্রবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং নিত্যদিনের হাসি- কান্না, সুখ-দু:খের প্রতিচ্ছবি, বাঙালিদের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্যে একটি সংবাদ মাধ্যম জরুরী, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সত্য এবং ন্যায়ের শপথ নিয়ে প্রবাসে বাংলাদেশের অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে ঠিকানা যাত্রা শুরু করে। ১৯ বছর পূর্বে যে অঙ্গীকার নিয়ে ঠিকানা যাত্রা শুরু করেছিলো পরবর্তীকালে পাঠকদের অফুরন্ত ভালবাসায় সিক্ত হয়ে ঠিকানা আজো তার সেই গৌরবময় ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। জন্মের পর থেকে ঠিকানা আজ পর্যন্ত অন্যায়ের কাছে, মিথ্যার কাছে, অসত্যের কাছে, পেশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ঠিকানা প্রবাসে বাংলাদেশীদের দর্পণ হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিলো। অনেকেই বিভিন্ন সময় ঠিকানাকে ধ্বংস করার মানসে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রই

www.pathagar.com

ঠিকানাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র হেলাতে পারেনি। ঠিকানার যাত্রা শুরু হয় ২৪ পৃষ্ঠা দিয়ে, বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ১২৪ থেকে ১২৮ এমনকি ১৩৬ পৃষ্ঠার বর্ধিত কলেবরে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য লেখকদের লেখা নিয়ে ২৭৬ পৃষ্ঠার পত্রিকা বের হয়েছে। এমন কি প্রবাসে ও দেশে অনেকেই নানা সময়ে ধমকের সুরে কথা বলার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তারা জানেনা ঠিকানার হাত কত লম্বা। অনেকেই সময়ে অসময়ে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে দেশের প্রভাবশালীদের কানমন্ত্র দিয়েছেন কিন্তু কিছুতেই বশীভূত হয়নি ঠিকানা। তারা জানেন না ঠিকানা কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়, একমাত্র পাঠক ছাড়া। কম্যুনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা, প্রবাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা, বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, কৃষ্টি, কালচার এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরা, সব সময় সত্য এবং সুন্দরের পক্ষে অবস্থান, প্রবাসে সাংবাদিকতা পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, এক স্টেটের বাঙালিদের সাথে অন্য স্টেটের বাঙালিদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক এবং সেতুবন্ধ গড়ে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঠিকানার জন্ম। ঠিকানার পাশাপাশি কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়াও সম্ভবত নিউইয়র্কে একই প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা ঐ ইচ্ছা বা আকাঙ্খা ধরে রাখতে পারেনি নানা প্রলোভনের কারণে। সেই সময়ে আমেরিকায় পত্রিকা বের করা ছিলো খুবই দুরূহ ব্যাপার। প্রবাসে তেমন কোন সাংবাদিক ছিলেন না, টেলিফোন এবং ফ্যাক্স ছিলো খুবই ব্যয়বহুল, দেশে টেলিফোন এবং ফ্যাক্স লাইন খুব সহজে পাওয়া যেত না। হাতে কেটে কেটে পত্রিকা পেস্ট করা হতো সারা রাত ধরে এবং ভোরে প্রিন্ট করে বিতরণ করা হতো। কঠোর পরিশ্রম ও অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ঠিকানা পাঠকদের কথা চিন্তা করে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। অনেকেই তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করে বলতেন এরা কাঁথা সেলাই-এর মত করে পত্রিকা বের করে। বড় বড় ডিগ্রি ও পয়সাওয়ালা লোকজন প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে নানান কথা বলার চেষ্টা করতো। বলতো, ওরা কিছু জানে না। তাও লোকজনের সম্মুখে নয়- আড়ালে- আবডালে। কিন্তু ঠিকানা কারো কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রবাসের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও বাংলাদেশে ঠিকানার পূর্ণাঙ্গ অফিস প্রতিষ্ঠা করা হলো। ঠিকানার বৈশিষ্ট্য সব সময় অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা। ঠিকানা যখন প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে সবার মন জয় করতে শুরু করলো ঠিক তখনই একটি অতি উচ্চাভিলাষী মহল ঠিকানাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নানান ষড়যন্ত্র শুরু করে। যার অংশ হিসাবে মালিকদের না জানিয়ে ষড়যন্ত্র করে পরবর্তীকালে তারা কেটে পড়ে এবং পর্যায়ক্রমে কম্যুনিটিতে বিভিন্ন চক্রান্ত শুরু করে এবং ধর্মীয় রাজনীতি করার লক্ষ্যে অন্য একটি সংবাদপত্র বের করে। তাদের চক্রান্তের কাছে আমরা ছিলাম খুবই নগণ্য। কিন্তু আদর্শ, লক্ষ্য ও সততায় অবিচল থাকার কারণেই আমরা এ যাবত বেঁচে আছি।

www.pathagar.com

বলতে গেলে তখন থেকেই প্রবাসে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শুরু হয় অনিয়ম, অপেশাদারিত্ব, নীতি নিয়ম বর্হিভূত আদর্শহীন হলুদ সংবাদিকতা। আর এদের সাথে যোগ দেয় প্রবাসের একটি স্বার্থান্বেষী অসৎ মহল। যাদের কাজ হলো সমাজে বিষবাষ্প ছড়ানো, দুই নম্বরী করে অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করা ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। যারা দেশে পবিত্র সাংবাদিকতার আড়ালে নোংরামি করে জীবন-জীবিকা ও সমাজকে কুলষিত করে এদেশে এসেছে, আমেরিকায় এসেও তারা ঐ একই রকম অভ্যাস চালিয়ে যেতে চেয়েছিলো-কিন্তু পারেনি। এদের কাজ হলো সাংবাদিকতার মহত্ত্ব ও নিজেদের বিবেককে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা। কেউ যদি সঠিক সংবাদ কম্যুনিটির স্বার্থে পরিবেশন করে সেই সংবাদটির সত্যতা যাচাই- বাছাই না করেই অর্থের বিনিময়ে উল্টো খবর পরিবেশন করে কম্যুনটিতে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া এবং অসাধু লোকদের সাপোর্ট করে অর্থের ধান্ধা করা ওদের কাজ। অবৈধ পথে কালো টাকার মালিক হয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা এবং অসাধু লোকদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সমাজে সহযোগিতা করা।

সাংবাদিক নামধারী ঐ সব সাংঘাতিকরা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে না নিয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার নীতি বহির্ভূত সব কাজে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে। শপ এরাউন্ড করাই এদের পেশা এবং নেশাতে পরিণত হয়। প্রত্যেক জিনিসের একটা গ্রামার থাকে। একটি ব্যবসা করতে গেলেও কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়- কর্পোরেশন করতে হয়, অফিস নিতে হয় এবং অফিসের জন্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিতে হয়। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ করতে প্রবাসে কোন নীতি নিয়ম মানা হয় না। এখানে কোন ফেডারেল গভর্নমেন্ট নেই, যার কাছ থেকে ঋণ বা ধার নিয়ে পত্রিকার বিল দেয়া যায়। বাংলাদেশে নানা ধরনের ব্যাংক আছে যেখান থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে অর্ধেক ব্যবসায় খাটানো ও অর্ধেক পকেটে ভরে আনন্দ- ফুর্তি করার সুযোগ রয়েছে। কারণ তাদের লোন ফেরৎ দিতে হয় না। কার এত সাহস আছে মিডিয়ার লোকদের কাছে লোন ফেরৎ চাইবে। লোন ফেরৎ চাইলে এক হাত দেখিয়ে দেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয় পরোক্ষভাবে। দেশে অধিকাংশ মিডিয়ার মালিকরা ব্যাংক ডাকাতি, অন্যের জায়গা দখল, আদম পাচার, হত্যা, সরকারের সাথে আঁতাত, অন্য দেশ থেকে অবৈধ টাকা সংগ্রহ করা, বিভিন্ন এজেন্সীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তথ্য সরবরাহ করা, বড় বড় দোষী ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অপরাধকে আড়াল করাসহ এমন কোন অপকর্ম বাকি নেই যে তারা করেননি। কাজেই তাদের বা পত্রিকার কর্মকর্তাদের নীতিবাক্য শুনে আমাদের লাভ কী? প্রবাসেও দেশ থেকে আসা ঐ ধরনের কিছু কিছু সাংবাদিক নামধারী সাংঘাতিক রয়েছেন, যারা এখানের সমাজকে কুলষিত করছেন পদে পদে। প্রবাসে এখন আগের তুলনায় প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ভিজ্যুয়াল মিডিয়া রয়েছে। যদি পাঠক অনুযায়ী হিসাব করা হয়- তাহলে

www.pathagar.com

প্রবাসে এত মিডিয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কী? অনেকেই এখনো রাতে ঘুমানোর আগে স্বপ্ন দেখেন সকালে উঠে পত্রিকা বের করবেন বা পত্রিকার সম্পাদক হবেন। অন্য পেশাকে লুকিয়ে রেখে সাংবাদিক হলেই মনে হয় সমাজে সম্মান পাওয়া যায়- যে কারণেই সবার সাংবাদিক হবার খায়েস হয়। তা নাহলে এমন হবে কেন? হুট করে খেয়ালের বশবর্তী হয়ে বা অন্য পত্রিকাকে এক হাত দেখিয়ে নেয়ার মানসেই তারা কোন কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই পত্রিকা বের করেন। কেউ কেউ আসল ব্যবসার আয়কর ফাঁকি দেয়ার জন্য পত্রিকা বের করে নানান সার্কাসও করে থাকেন। পরে দেখা যায়- তাদের স্বপ্নের সাথে বাস্তবের ফারাক অনেক। তখন তাদের একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়ায় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এগুলোকে মিডিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয় নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন কম্যুনিটির অনেকেই। তাদের কাজ হলো কম্যুনিটিকে বিভ্রান্ত করা, হিংসা- বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়া। আবার কেউ কেউ সাইন বোর্ড কাজে লাগিয়ে অবৈধ পথে পয়সা উপার্জন করে অন্যদের দেখিয়ে দেয়ার নামে পত্রিকা বের করেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে অন্যকে ধ্বংস করা। তাদের কাছে সংবাদিকতা বা সংবাদপত্র শিল্প বড় কথা নয়- তাদের ধান্দা অন্য। তারা আসলে তাদের অবৈধ কাজগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য পত্রিকা বের করে থাকে। তারপর কয়েক মাস বের করেই হাঁফিয়ে উঠেন । অত:পর কর্মচারিদের বেতন না দিতে পেরে কর্মচারিদের হাতে পত্রিকা ছেড়ে দিয়ে মানে মানে কেটে পড়েন। ঐসব কর্মচারি বাস্তবে জীবন- জীবিকার তাগিদে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য কাজ করে থাকেন। প্রবাসে যারা সৎ সাংবাদিকতায় জড়িত ও সংবাদপত্রকে একটি শিল্প হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন– তাদের প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা সব সময় অব্যাহত রয়েছে। এতে সৎ সাংবাদিকরা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন।

বর্তমানে প্রবাসে পাঠক এবং দর্শকদের যে চাহিদা তাতে ধরে নেয়া যায় ২/৩ টি পত্রিকা এবং একটি টিভি মিডিয়া চলতে পারে। তারপরও এত ভুরি ভুরি পত্রিকা ও টিভি বের করার রহস্য কোথায়? অনেকে আছেন যারা নিজেদের আসল পেশাকে লুকিয়ে রেখে পত্রিকা বের করেন। এর মধ্যে কেউ আছেন ট্যাক্সি চালক, কেউ আছেন আতর ব্যবসায়ী, কেউ আছেন ডাক্তার, কেউ আছেন ফার্মাসিস্ট, কেউ আছেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, কেউ আছেন রিয়েলএস্টেট ব্যবসায়ী, কেউ আছেন কন্ট্রাকটর, কেউ আছেন দিন মজুর, কেউ আছেন দারোয়ান, কেউ আছেন এনজিও মালিক, আবার কেউ আছেন অন্য পেশায় নিয়োজিত। তারা তাদের আসল পেশায় সন্তুষ্ট নয় কেন? এখন দেখা যায়- রাস্তাঘাটে সকালের সাংবাদিক, বিকেলের সাংবাদিক, রাতের সাংবাদিক, মধ্যরাতের সাংবাদিক, চায়ের দোকানের সাংবাদিক, কেউ আছেন পার্ট টাইম সাংবাদিক, ডাইম সাংবাদিক, কেউ আছেন সিকি সাংবাদিক। নিউইয়র্কে এখন ফুলটাইম সাংবাদিক ১/২ টি পত্রিকায় ছাড়া দেখা যায় না। এই সব বিভিন্ন রং- বেরং

www.pathagar.com

পদবীর সাংবাদিকদের জন্য আসল সাংবাদিকরা অনুষ্ঠানে গিয়ে আসন পান না। নকল সাংবাদিকরা আয়োজকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন; কিন্তু তাদের পত্রিকায় কোন কিছুই লেখেন না। আবার ওদেরকে ঠিকই ভয়ে হউক বা অন্য কোন কারণে হউক এ্যাম্বাসী, কন্স্যুলেট, সোনালী এক্সচেঞ্জ বা মিশনের লোকজন অতিরিক্ত খাতির ও যত্ন করেন। অথচ যারা পেশার সাথে জড়িত তাদের খোঁজ খবর রাখা হয় না। বাংলাদেশ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আসলে সত্যিমিথ্যে মিশিয়ে কানভারী করা এদের নিত্যদিনের কাজ।

বর্তমানে মিডিয়া এবং সাংবাদিকদের সংখ্যা বাড়ার কারণে অনেকেই এখন দাওয়াত দিতে ভয় পান। কারণ কেউ একটি অনুষ্ঠান করলে সেখানে অতিথিদের চাইতে সাংবাদিকদের সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। আয়োজকদের অতিথির সাথে বাড়তি ৫০ জনের উপরে অর্ডার দিতে হয়। বর্তমানে সে ভয়ে অনেকেই সাংবাদিক সম্মেলন এড়িয়ে যান। সাংবাদিক নামধারী কিছু কিছু কলম মাস্তানও কম্যুনিটিতে আজকাল দেখা যায়। তাদের দাওয়াত না দিলে তারা বেজায় রাগ করেন এবং এক হাত দেখিয়ে নেয়ার ভয় দেখান। অনেকেই আছেন সাংবাদিক সেজে রেস্টুরেন্টে বাকি খেয়ে পরে বিল দেন না। এর মধ্যে কেউ কেউ আছেন ফুলবাবু সেজে অনুষ্ঠানে যান, আয়োজকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন- খেয়ে- দেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হন; কিন্তু অনুষ্ঠানের একটু নিউজও দেন না। অনেক সময় দিলেও উল্টা পাল্টা নিউজ দেন ডলারের বিনিময়ে- নিজ স্বার্থে। আবার অনেকে আছেন দাওয়াত না দিলেও তারা অনুষ্ঠানে চলে আসেন। একদিন একটি অনুষ্ঠানে একজন সাংবাদিক বলেই বসলেন- আপনারা আমাদেরকে মাঝে মধ্যে নিমন্ত্রণ করবেন এবং ভাল ভাল খাওয়াবেন তাতে করে আমরা আপনাদের নিউজ দেব। তার এই কথায় উপস্থিত অন্যান্য সাংবাদিকদের মাথা নোয়ানো অথবা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করা ছাড়া আর কী করার থাকে। একই অনুষ্ঠানে আরেকটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। আর সেটি হলো একজন সম্মানিত সম্পাদক একজন পার্ট টাইম সাংবাদিককে বলে বসলেন, আপনাদের মত পার্টটাইম সাংবাদিকরা শুধু খেতে আসেন, কোন নিউজ করেন না। আবার কেউ কেউ পয়সার বিনিময়ে দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে সত্যিমিথ্যে মিশিয়ে খবর পাঠিয়ে থাকেন। অথচ খবর নিলে দেখা যাবে তারা ঐ অনুষ্ঠানেই ছিলেন না।

প্রবাসে মিডিয়া বেশি হবার কারণে এবং সাংবাদিক নামধারী মাস্তানদের ভয়ে প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন এখন তাদের কাঙ্খিত পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দিতে শঙ্কিত হন। কথা প্রসঙ্গে একজন বিজ্ঞাপন দাতা বলেন, 'ভাই আমি ঠিকানায় বিজ্ঞাপন দিতে চাই'। বিজ্ঞাপন দেন তাতে অসুবিধা কোথায়? আপনি অর্থ দিবেন বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। তখন তিনি জানালেন, ঠিকানায় বিজ্ঞাপনটি বের হবার সাথে সাথেই সমানে বিভিন্ন পত্রিকা অফিস থেকে ফোন আসতে থাকে- ভাই আমাদের বিজ্ঞাপনটি দেন। যদি

www.pathagar.com

বলি দেব না, তখন বলে আপনি তাহলে ঠিকানাকে দিলেন কেন? ঠিকানায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি, উত্তর আমেরিকার ঘরে ঘরে আমার পণ্যের কথা, আমার সংগঠনের কথা পৌঁছে দেয়ার জন্য। তখন বলে আমাদের বিজ্ঞাপন না দিলে আমরা খাব কী? কেউ কেউ আছেন বিজ্ঞাপন না দিলে উল্টো নিউজ করার ভয় দেখান। তাদের কথায় মনে হয়- ঠিকানায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যায় করেছি বা মহা বিপদে পড়েছি। অনেক পত্রিকা রয়েছে তারা কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই বিনা অনুমতিতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দেয় এবং কখনো কখনো রাস্তায় পেলে বিল ধরিয়ে দেয়। পরে জিজ্ঞেস করলে বলেন, আমাকে কিছু একটা দিয়ে দিয়েন; কাজটি দেখলে মনে হবে যেন ভিক্ষা করার মানসিকতা। এই অপেশাদার লোকগুলো সাংবাদিকতার মত মহান পেশাকে কোথায় নিয়ে গেছে?

এই কম্যুনিটিতে অনেকেই আছেন পত্রিকাগুলোকে তাদের নিজস্ব মুখপত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চান। এরা নিজেকে আয়নায় দেখে না। কোন সংবাদ তাদের মনোঃপুত না হলেই তারা পত্রিকার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন। অবৈধ কর্মকান্ডের খবর পত্রিকায় প্রকাশ করলেই তাদের শরীরে যেন আগুন লাগে। তারা দল পাকাতে থাকেন সমাজের দুই নম্বর লোকদের সাথে নিয়ে। আর বাহন হিসাবে ব্যবহার করেন হলুদ সাংবাদিকদের। কিছু কিছু সাংবাদিক আছেন তাদের কাজ হলো নিজের চরকায় তেল না দিয়ে অন্যের কান ভারি করা, অন্যকে কুপরামর্শ দেয়া এবং সঠিক সাংবাদিকদের পথে বসিয়ে বাধার সৃষ্টি করা। কিছু কিছু সাংবাদিক আছেন বটতলার উকিলের মত প্রেস রিলিজ লিখে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে অন্য একটি ধান্ধা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু টিভি-সাংবাদিক রয়েছে, যারা দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন। ৫ শ থেকে ১ হাজার ডলার দিয়ে তাদের মাধ্যমে ছবিসহ খবর দেখানো হয় দেশে বা প্রবাসে।

প্রবাসে এখন ঢাকা থেকে বেশ কয়েকটি ভিজ্যুয়াল মিডিয়া তাদের কার্যক্রম সম্প্রচার করছে; যদিও তারা অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি। তারা আমেরিকায় আসার আগে মার্কেটও সার্ভে করেনি- যে কারণে তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা এখানে এসে কোন কিছু বাছ বিচার না করে- এমন কিছু লোককে তাদের সাথে যুক্ত করেছে তাদের নিয়ে এই কম্যুনিটিতে যথেষ্ট বিতর্ক ও নানা কথা রয়েছে এবং টিভির আড়ালে বিভিন্নভাবে তারা আদম আমদানি করে থাকে। এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন জামাতি যারা অবৈধ পন্থায় অর্থ উর্পাজনের সাথে জড়িত রয়েছেন। এখানে এসে তারা এমন কিছু কার্যক্রম শুরু করেছেন যা পেশার কার্যক্রমের সাথে মানায় না। অনেকেই প্রশ্ন করেন গ্রোসারী ও প্রেসরিলিজের এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে টিভিগুলো চলে কিভাবে? যে দেশে আমরা বর্তমানে বসবাস করি সেই দেশে যারা মিডিয়ার সাথে জড়িত তারা সৎ, নির্লোভ এবং

www.pathagar.com

এই পেশাকে আদর্শ এবং চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবী এবং ভিশনারী লোকজন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে সব মিডিয়া এখানে এসেছে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই কম্যুনিটিতে নানা প্রশ্ন রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশী একজন মিডিয়ার মালিক বলেছিলেন, এখানে আমার কোন লোকের প্রয়োজন নেই। ওরা শুধু এখানে গিরিঙ্গী করে, কোন কাজ করে না। তারা বিজ্ঞাপনের মার্কেটকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে যে রকম ঋণ খেলাপী রয়েছেন প্রবাসে বিজ্ঞাপনের বিল খেলাপীও রয়েছেন। কিছু কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা নতুন কোন পত্রিকা বা ভিজ্যুয়াল মিডিয়া এলেই বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। যত দিন পর্যন্ত তারা বিল না দিয়ে থাকতে পারেন ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞাপন চালিয়ে যান। অর্থ চাইলেই বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেন এবং অন্য মিডিয়ায় চলে যান। এমনও ভিজ্যুয়াল মিডিয়া রয়েছে যারা বিজ্ঞাপন নিয়ে অনেকটা ব্লাকমেইল করে থাকেন প্রবাসীদের সাথে। তারা বিজ্ঞাপনটি শুধুমাত্র আমেরিকায় কিছু লোকের কাছে সম্প্রচার করে থাকেন বাংলাদেশে তা দেখান না। অন্যদিকে কিছু কিছু নতুন বিজ্ঞাপনদাতা তাদের সুন্দর মুখখানি দেশে আত্মীয়- স্বজনকে দেখানোর জন্য টিভি মিডিয়াকে বেছে নেন। কিন্তু তারা জানেন না যে তাদের বিজ্ঞাপনটি দেশে দেখানো হয় না বা বেশি লোকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। আবার অন্যদিকে যদি কোন খবর প্রচার করে তখন ঐ ব্যক্তিরা ই- মেইল করে লোকজনকে জানান বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান টিভিতে আমার বা অনুষ্ঠানের খবর দেখানো হবে ঐ তারিখে- দয়া করে দেখবেন এবং অন্যকে বলবেন দেখতে। এতেই ধারণা করা যায় কত পার্সেন্ট লোক টিভি দেখছেন।

অনেকেই মিডিয়ার মালিক হয়েছেন সমাজে সম্মান পাওয়ার জন্য, এই পেশাকে সমৃদ্ধ করার জন্য নয়। তারা সমাজে নানাভাবে বিভেদ সৃষ্টি করছেন এবং যারা কষ্ট করে সুস্থ এবং সুন্দর মিডিয়া করার চেষ্টা করছেন তাদের কাজে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। প্রবাসে কেউ পত্রিকা বের করেন বাসার বেইসমেন্ট থেকে, কেউ পত্রিকা বের করেন বাড়ি থেকে, কেউ করেন গাড়ি থেকে, কেউ করেন বাসার এটিক থেকে, কেউ করেন বেড রুম থেকে। অনেকে আবার ঠিকমত প্রেসের বিলও দিতে পারেন না। এক প্রেস থেকে অন্য প্রেসে দৌড়-ঝাপ করেন। যে কারণে বার বার প্রেস পরিবর্তন করেন। এইভাবে পত্রিকা বের করার বা সম্পাদক হবার পেছনে রহস্য কোথায়? বিভিন্ন সময় অনেকেই বুদ্ধি- পরামর্শ দেন অন্যান্য সাংবাদিকদের– ঠিকানার বিক্রি কমাতে হলে আগের দিন, ঠিকানা যেদিন বের হয় বা পর দিন পত্রিকা বের করার জন্য। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়, যখনই কোন পত্রিকা বের হয় তখন ঠিকানা আরো বেশি বিক্রি হয়।

কম্যুনিটিতে অনেক লোক আছেন যারা ক্যাসিনোতে গিয়ে জুয়া খেলেন। হাজার

www.pathagar.com

হাজার ডলার খরচ করে অনুষ্ঠান করেন। হল ভাড়া করেন, বাংলাদেশ থেকে শিল্পী আনেন, সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া করেন। কোথাও তাদের অর্থের কমতি হয় না। শুধুমাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে এলেই তাদের পয়সা থাকে না। আবার কম্যুনিটির অনেক সংগঠনের নেতা আছেন যাদের বিশ্বাস করে বাকিতে বিজ্ঞাপন ছাপা হলে পরবর্তীতে তাদেরকে আর পাওয়া যায় না, তাদের পিছনে বছরের পর বছর ঘুরতে হয়। অনেক সময় ঝগড়া- ঝাঁটি পর্যন্ত হয়, সম্পর্ক নষ্ট হয়। পত্রিকাগুলো কি দাতব্যখানা?

পূর্বে কোন অনুষ্ঠানে অতিথি হতেন সমাজের সম্মানিত বা মেধাসম্পন্ন লোকজন, কিন্তু বর্তমানে কম্যুনিটিতে এমনও লোক আছেন যারা অবৈধ পথে পয়সা উপার্জন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চেয়ার কিনে অতিথি সাজেন। আবার অনেকে অনেক অনুষ্ঠানে অর্থ দিয়ে থাকেন নিজের নাম জাহির করার জন্য। এদের মধ্যে দু নম্বরী লোকদের পাশাপাশি অনেক মূর্খ শিক্ষিত লোকও আছেন। এই সব মূর্খ শিক্ষিত লোকজন সাধারণত কম্যুনিটির উন্নয়নে কখনো এগিয়ে আসেন না, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও নেই, কম্যুনিটির প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি ও প্রবাসীদের স্বার্থে কোন কমিটমেন্ট নেই; অথচ সুযোগ পেলেই তারা জ্ঞান দিয়ে বেড়ান। প্রবাসে অনেকে অনেকভাবে অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু এক ডলার খরচ করে তারা সপ্তাহে একটি পত্রিকা কিনতেও চান না। বাঙালিদের এমনিতেই পাঠ অভ্যাস বা জ্ঞান অর্জনের অভ্যাস কম। এমনও লোক আছেন যারা পত্রিকা না কিনে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ে চলে যান। মনে হবে যেন এটা কোন দোকান নয়- পাঠাগার। অনেক গ্রোসারীতেই সাইনবোর্ড লাগানো দেখা যায়- 'দোকানে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়বেন না'। দোকান মালিকদের সাথে আলাপকালে জানা যায়- যারা বিনা পয়সায় পত্রিকা পড়তে চান তারা এই কাজটি করেন। তাদেরকে নিষেধ করলেও শুনেন না- যে কারণে এই সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে।

আবার অনেকে রয়েছেন যারা বুধবার সকালেই খাতা কলম নিয়ে গ্রেসারী দোকানে হাজির হয়ে যান। তাদের কাজ হলো- সপ্তাহে এক ডলার দিয়ে পত্রিকা না কিনে ক্লাসিফাইড সেকশনের বিজ্ঞাপন দেখে নিজের প্রয়োজনীয় নাম্বারটি চুরি করে লিখে নিয়ে যাওয়া। আবার অনেকে সুযোগ বুঝে খাতা কলম না পেয়ে পত্রিকার দরকারি অংশটি ছিড়ে নিয়ে চলে যান। এই চুরির বা অনৈতিক কাজটি করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধে না। অথচ তারা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশে বসবাস করছেন।

বাংলাদেশী অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে আরো দেখা গেছে, যেই দিন পত্রিকাটি ডেলিভারী দেয়া হয় সেই দিন এক শ্রেণীর লোক কিছু কিছু দোকান মালিকের সহায়তায় পত্রিকাটি বাসায় নিয়ে যান এবং পড়া শেষ করে পরদিন পত্রিকাটি ফেরৎ দিয়ে যান। ফেরৎ দেয়ার দিন যদি কোন পত্রিকা বের হয় সেইটিও নিয়ে যান এবং পরদিন ফেরৎ দেন। এভাবে পুরো সপ্তাহ চলতে থাকে। ফ্রি পড়ার অভ্যাসের

www.pathagar.com

কারণেই তারা এই কাজটি করেন। আবার অনেক দোকানদার রয়েছেন যারা কোন কোন পত্রিকা পিছনে লুকিয়ে রাখেন। কোন কোন ডেলিভারিম্যান রয়েছেন যারা অনৈতিকভাবে এক পত্রিকার উপরে নিজেদের পত্রিকাটি রেখে যান। এক সহকর্মী একদিন অভিযোগের সুরে বললেন, গতকাল দেখলাম এই দোকানে কোন পত্রিকা নেই, কিন্তু পরদিন যখন ঐ দোকানে পত্রিকা দিতে গেলাম তখন দেখি কয়েকটি পত্রিকা রয়েছে। দোকানদারকে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলে- তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। অনেক ব্যবসায়ী আছেন পত্রিকাকে পণ্য হিসাবে দেখেন না। যে জন্য তারা পত্রিকাকে মাটিতে বা পেঁয়াজের বস্তার উপর রেখে দেন। অন্য ভাষার পত্রিকাগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখেন। এতে করে অনেকেরই দেশপ্রেম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অথচ এই পত্রিকার জন্যই তাদের দোকানে নানান জায়গা থেকে অনেক ক্রেতা আসেন এবং তারা ব্যবসাও করেন। এটা তারা বুঝেন কি না জানি না। কম্যুনিটিতে কিছু কিছু নতুন ব্যবসায়ী গজিয়েছেন তারা মাঝে মধ্যেই হুমকি দেয়ার চেষ্টা করেন পত্রিকা ওয়ালাদের তাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখা হলে। আসলে তারা বুঝেন না যে তারা কত দুর্বল। সমাজে ঐ সব কীর্তিমান মানুষের সম্পর্কে খারাপ কিছু লিখা যাবে না, বলা যাবে না, শুধু ভাল কথা লিখতে হবে। ভাল কথা থাকলেতো লিখবে পত্রিকাগুলো।

উত্তর আমেরিকায় একমাত্র শিল্প সংবাদ পত্র, যে শিল্পের ধরন একটু ভিন্ন। পত্রিকার মালিকরা প্রথমে বিনা পয়সায় দোকানে তাদের পত্রিকা দিয়ে থাকেন এবং দোকান মালিকরা পত্রিকা বিক্রি করে লাভ রেখে বাকি অর্থ দিয়ে থাকেন যা অন্য কোন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দোকান মালিকদেরকে উত্তর আমেরিকায় প্রথমে পয়সা দিয়ে পণ্য কিনে রাখতে হয়; কিন্তু পত্রিকার ক্ষেত্রে তারা পুঁজি ছাড়াই ব্যবসা করেন। তারপরেও পত্রিকা বিক্রি করে অনেকেই বিল দিতে চান না। ভাবসাবে মনে হয় তারা যেন পত্রিকার মালিকদের দয়া করছেন।

বাংলাদেশীদের মধ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, মালিকানা পরিবর্তন হতে দেখা যায় প্রায়শই। এই ক্ষেত্রেও পত্রিকার বিল নিয়ে জটিলতা দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানের নাম এবং মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা বলেন, আমরা তো পত্রিকার পূর্বের বিক্রিত বিল সম্পর্কে কিছু জানি না এবং এর দায়-দায়িত্বও আমরা নেব না; আপনারা আগের মালিকের সাথে যোগাযোগ করেন। কেমন তাদের মানসিকতা। দোকান নিবেন কিন্তু তার দায়- দেনার ভার নেবেন না, তা কি করে হয়? এই দেশে একটি প্রতিষ্ঠান কেউ কিনে নিলে সেই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়- দায়িত্ব নতুন মালিককেই নিতে হয়; টাকার অংকও যে বিশাল তাও নয়। এই দেশে থেকেও আমরা কিছু শিখতে চাই না। এ কেমন মানসিকতা?

প্রবাসে অনেক মিডিয়ার মালিক, সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক আছেন

www.pathagar.com

যারা একই সাথে কয়েকটি পত্রিকায় ভাড়া খাটেন জীবন-জীবিকার জন্যে। কিন্তু কেন? এর রহস্য কোথায়? এত বড় বড় চাকরি নিয়েও তাদের খ্যাপ মারার রহস্য কোথায়? অন্যদিকে সমাজের নতুন পয়সাওয়ালা যারা জাতে উঠতে চান বা সমাজের কিছু ধান্দাবাজদের সব সময় ঐ সমস্ত খ্যাপ মারার ওস্তাদ, সাংবাদিকরা বুদ্ধি -পরামর্শ দেন ভাই পত্রিকা বের করেন আমি কাজ করে দেব। পত্রিকা বের করলেও ভাড়াটিয়া সাংবাদিকদের পুনরায় সুযোগ- সুবিধা বাড়ে এবং অন্যান্যরা এদেরকে খ্যাপ মারা মালিক, খ্যাপ মারা সম্পাদক, খ্যাপ মারা নির্বাহী সম্পাদক এবং খ্যাপ মারা বার্তা সম্পাদক, ভাড়াটিয়া সম্পাদক, সাংবাদিক বলাই শ্রেয় বলে অনেকে মনে করেন। ঐ সমস্ত সাংবাদিক নিজেদের সম্পর্কে ও তাদের পত্রিকা সম্পর্কে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে এড এজেন্সীগুলোকে এত উঁচু ধারণা দেন, যা খুব সহজে মানুষ বুঝতে পারে। এমন কি ফেডারেল গভর্নমেন্ট এর সাথে প্রতারণা করে। যার জন্য অতীতে অনেকেই জেল খেটেছেন এবং সর্বস্ব হারিয়েছেন।

প্রবাসে কোন কোন পত্রিকা দলীয় রাজনৈতিক আদর্শে চলে। আবার অনেকে মিলে চাঁদা তুলে পত্রিকা বের করেন। তাদের কাছে সংবাদপত্র শিল্পের আদর্শ বড় কথা নয়- তাদের কাছে বড় কথা হলো দলীয় পারপাস সার্ভ করা। তাদের জন্ম হয় দলীয় মুখপত্র হিসাবে। যে কারণে জন্মের কিছু দিন পর মোহ কেটে গেলে বুঝতে পারেন এই শ্বেতহস্তী পোষা অসম্ভব। তাদের অবস্থা হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির মত। এই রকম আদর্শ নিয়ে জন্মের পরই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে সাপ্তাহিক নতুন প্রবাসী, সাপ্তাহিক কাগজ, সাপ্তাহিক আয়না , সাপ্তাহিক একাত্তর, সাপ্তাহিক বিদেশ বাংলা, সাপ্তাহিক কথা, সাপ্তাহিক হক কথাসহ আরোও। তারও পূর্বে অনেকগুলো পত্রিকা বন্ধ হয়েছে করুণভাবে। তবুও এর থেকে আমরা শিক্ষা নেই না। বর্তমানে প্রবাসের আরো কয়েকটি পত্রিকার প্রাণ নিভু নিভু করছে। আবার বাংলাদেশের কিছু কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের লোক তাদের খয়ের খাঁ দিয়ে প্রবাসে পত্রিকা বের করছেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পার্ট টাইম, হায়ারি সাংবাদিকের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এরা কিছু দিন পত্রিকা চালানোর পরে সাংবাদিকের বেতন দিতে পারেন না। তখন মালিক পক্ষ বলেন নিজের বেতন নিজে ম্যানেজ করেন। প্রিন্টের বিল দিতে না পেরে সুযোগ বুঝে এক জায়গা থেকে অন্যত্র কেটে পড়েন এবং পার্ট টাইম এবং হায়ারি সাংবাদিকদের মালিক বানিয়ে চম্পট দেন। কারণ তাদের কাছে পত্রিকা চালানোর মত অর্থ থাকে না। তখন তারা অন্য চিন্তা শুরু করেন। প্রবাসে কিছু লোক অবৈধভাবে টাকা রোজগার করে গরম দেখিয়ে জেল হাজতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছেন। পেশার বারোটা বাজিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে কর্মচারিদের পয়সা দিতে ব্যর্থ হয়ে তাদের কাছে পত্রিকা ছেড়ে কেটে পড়েছেন। তারপরেও পত্রিকাকে বাঁচানো যায়নি। সমাজে ঐ সমস্ত কুৎসিত, নোংরা মানুষগুলো আজ জায়গা খুঁজছে

www.pathagar.com

অন্যত্র আশ্রয় নেয়ার জন্য। হয়ত কোথাও আশ্রয় পেয়ে যেতে পারেন। এতে করে তারা এই পেশাকে ধ্বংস করে কর্মরত সাংবাদিকদের বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। বর্তমানে প্রবাসে বেকার সাংবাদিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। এই সব দু নম্বরী সাংবাদিক কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী লোকজনকে বুদ্ধি- পরামর্শ দেন পত্রিকা বের করার জন্য। পরবর্তীকালে ওদেরকে বিপদে ফেলে আরেক নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে কেটে পড়েন। কোন কোন সাংবাদিক আছেন যারা রেস্টুরেন্টে খেয়ে বিল দেন না। ওরা আবার টাকার বিনিময়ে নিউজ করেন। অনেকে নিউজ না করেও জায়গা দখল করেন। যারা এক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে টেলিফোন বুথে কাজ করতেন-তারা হয়ে গেছেন মিডিয়া মালিক। এরা সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এই পেশাকে হাইজ্যাক করেছে। নানা অপরাধের সাথে কিছু কিছু সাংবাদিক জড়িত; তারা মনে করে আইন তাদেরকে ধরতে পারবে না। কিন্তু তারা জানে না এদেশে আইনকে ফাঁকি দেয়া কঠিন, আজ হোক কাল হোক ওরা ধরা পড়বে।

নতুন পত্রিকা বের হলেই দেখা যায় নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন স্টেটে 'তাফালিং' পার্টির দৌরাত্ম্য। তাদের দৌরাত্ম্যে অনেকেই সমস্যার সম্মুখীন হন। অন্য পত্রিকাকে দেখিয়ে দেয়ার দাপটে তারা অনেক অনৈতিক কাজ করেন। অনেকে আবার এই সব তাফালিং পার্টির পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। তাদের লালন পালন করেন। অপরাধ করে ধরা পড়লে তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এবং নিজের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। এই সব তাফালিং পার্টির লোকজন বসের মনোরঞ্জন এবং মনোতুষ্টির জন্য মাঝে মধ্যে জলসার আয়োজন করেন। সেই সব জলসায় চলে অনেক অনৈতিক কাজ। জলসা থেকে কুড়ানো হয় সামুক। নতুন পত্রিকাটি নানা প্রলোভনের মাধ্যমে পুরানো পত্রিকার সাংবাদিক ও বিভিন্ন স্টেটের প্রতিনিধিদেরকে ভাগানোর চেষ্টা করে। কেউ কেউ সামান্য লোভে চলে গেলেও পরবর্তীতে তারা সবাই পথে বসেন। সমাজে কিছু লোক আছে যারা স্যুট- টাই পরে অন্যের কাছে ফুলবাবু পরিচয় দেয় ও নিজেদের সংস্কৃতির ধারক, বাহক হিসাবে উপস্থাপন করে। ঐ সমস্ত দুষ্ট চরিত্রের লোকদেরও সমাজে চিহ্নিত করা দরকার।

এই প্রবাসে প্রতিযোগিতার চেয়ে বেশি দেখা যায় প্রতিহিংসা। সংবাদপত্রে প্রতিযোগিতা থাকবে, প্রতিহিংসা নয়, মেধার প্রতিযোগিতা থাকবে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টিশীল, তীক্ষ্ণমেধাসম্পন্ন সৎ মানুষ এই পেশাতে যোগ দিবেন। এই পেশাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, এই শিল্পকে ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে, প্রতিহিংসার নয়। সমাজে পাঠকদেরও উচিত যারা সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে রয়েছেন, তাদের সহযোগিতা করা এবং অসত্য, অসুন্দর, অনৈতিক কাজকে বর্জন করা। আর যারা অসৎ উদ্দেশ্যে সংবাদিকতা পেশাকে কলংকিত করছে তাদের প্রতিহত করা। ■

www.pathagar.com

একুশ-বিপণনের নেপথ্যে

বাঙালির স্মরণকালের ইতিহাসে অমর একুশে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যমন্ডিত দিবস হিসেবে বিবেচিত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা মাতৃ ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে বুকের উষ্ণ রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে যে অবিস্মরণীয় গৌরবগাঁথা রচনা করেছেন কালের অগ্রযাত্রায় তা পাক-ভারত উপমহাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই মহান একুশ বর্তমানে নিছক বাঙালি বা বাংলাদেশীদের একক সম্পদ নয় ; এটি জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোরও অমূল্য সম্পদ। অনবদ্য কারণে প্রতি বছর বাঙালিদের মতো বিশ্বের ১৯১টি রাষ্ট্রও

www.pathagar.com

ভাষা শহীদের প্রতি হৃদয় নিঃসৃত শ্রদ্ধা নিবেদন ও একুশের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান একুশ উদযাপন করে থাকে। একুশের স্মৃতিচারণকালে অতীত পানে তাকালে আমরা দেখতে পাই- পলাশীর আম্রকাননে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলা মায়ের সিঁথির সিঁদুর ভাগীরথীর জোয়ারে ভেসে যাওয়ার ও বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাস্টার দা সূর্য সেন,প্রীতিলতা সেন, অবিরাম, ক্ষুধিরাম, তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহ প্রমুখের আত্মাহুতি এবং ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনসহ অসংখ্য আন্দোলনের ফলে অবশেষে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেছিল। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে বাদ দিয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের সাথে আলাপ-আলোচনার নামান্তরে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং সুকৌশলে পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করার আয়োজন পাকাপোক্ত করেছিলেন। কায়েদে আযম এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক যোগসাজশে বাংলাকে এমনভাবে বিভক্ত করলেন যাতে কলকাতা বাঙালিদের হাতছাড়া হয়ে গেলো এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে স্থানান্তরিত হল। সেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পরিণতি হিসেবে ভাষা, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী ১২শ মাইলের ব্যবধানের দুটি দেশকে নিছক ধর্মের বন্ধনে জোড়া লাগানো হলো। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, বড় লাট, প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান ও সদর দপ্তর, সকল কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় রাজধানী নিজেদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখার পরও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। তাই শাসন ও শোষণের ভিত পাকাপোক্ত করা এবং বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তথা অস্তিত্বকে চিরতরে নস্যাতের মানসে শুরুতেই তারা বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার পাঁয়তারা জুড়ে দিলো। তাদের হীন অভিসন্ধি ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বাঙালিরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলো এবং মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণের বজ্রকঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করলো।

তাই প্রথম গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যখন সদম্ভে ঘোষণা করলেন- উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা তখন সাথে সাথেই ছাত্র-শিক্ষক উপস্থিত জনতা সমস্বরে না না ধ্বনিতে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। গণ-দাবিকে উপেক্ষা করে পরের দিন ঢাকার ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানে জিন্নাহ পুনরায় একই ঘোষণা দিলে বাঙালির পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ ঘটলো। অবস্থার পটভূমিতে ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র ও সর্বস্তরের পেশাজীবীর সমন্বয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলো। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ সজীব আগ্নেয়গিরির রূপ পরিগ্রহ করলো। তাই ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানের এক সমাবেশে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিয়ে যেনো ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলেন। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেজিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ঢাকার অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকসহ সকল পেশাজীবী সম্প্রদায় চরম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের খালেক নওয়াজ খানের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভা শেষে মিছিল। মিছিল শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষে ৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট এবং একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র বাংলাদেশে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এদিকে গণরোষ ঠেকাতে এবং ভাষা আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্দ করার হীন উদ্দেশ্যে সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু জেল- জুলুম- হত্যাসহ যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ত্যাগ স্বীকারের দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করলো ছাত্রজনতা। ফলে শুরু হয়ে গেলো শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম, নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে বুলেট- বেনটের সামনে বুক টান করে দাঁড়াবার দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা। পাকিস্তানী শাসক চক্রের ধারণা ছিল তাদের রক্ত চক্ষুর শাসানি উপেক্ষা করে ভাষার জন্য বুলেটের সামনে দাঁড়াবার দুঃসাহস বাঙালির হবে না। কিন্তু চির আত্মত্যাগী ও মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালির সুযোগ্য উত্তরসুরীরা মাতৃভাষার জন্য জীবনবাজি রেখে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও কারফিউ ভাঙতে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের স্রোতের মতো রাস্তায় নেমে পড়ে। এদিকে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে গুলি চালনার নির্দেশ দেয়। সাথে সাথে পুলিশের নির্মম বুলেট ছিনিয়ে নিল সালাম, বরকত, রফিক, জাব্বার, সফিকসহ অগণিত তাজা প্রাণ। এই গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে সারা বাংলায় আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণ শুরু হয়, সমগ্র দেশবাসী বিদ্রোহ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে স্বৈরাচারি সরকার জনতার রুদ্র রোষের মুখে অসহায় হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হলো বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে।

মূলত একুশের এই অমর আত্মত্যাগ ও রক্তঝরা পথ ধরেই পরবর্তীতে বীর বাঙালি সামরিক জান্তা আইয়ুব খান, ৬ দফা আন্দোলন, উন সত্তরের গণ-আন্দোলন তথা অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন এবং ৭১-এর ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে এক সাগর রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অবশেষে ছিনিয়ে এনেছে রক্তিম সূর্য খচিত

www.pathagar.com

পতাকা সম্বলিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই একুশ আমাদের আত্মপরিচয়ের মাইলফলক, স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্বের সূতিকাগার এবং আবহমান বাংলার শাশ্বত সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের ধারক- বাহক ও কথক। তবে সম্প্রতি একুশ উদযাপন নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের হৈ হুল্লোড় এবং একুশ বিপণনের উদ্যোগ সন্দেহাতীতভাবে তীব্র সমালোচনার দাবি রাখে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাড়ম্বরে ও বর্ণাঢ্য আয়োজনে একুশ উদযাপন এবং নিছক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে শহীদদের স্মরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সেদিন বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা আত্মাহুতি দেননি। সেদিন তাদের চরম ও পরম আরাধ্য ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার চর্চা নিশ্চিত করা। তাদের রক্তঝরা সাগরে অবগাহন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও অদ্যাবধি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা স্থান করে নিয়েছে হলফ করে বলার সুযোগ নেই। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই শহীদ দিবসের স্মৃতিচারণ এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের হিড়িক পড়ে যায়। আবার শহীদ দিবসে পুষ্প অর্পণকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি, মারামারি, গুতোগুতি থেকে শুরু করে পেশীশক্তি প্রদর্শনের মহড়াও চলে সমান তালে। সমবেত কণ্ঠে আমার ভাইয়ের---ভুলিতে পারি গানটি গাইতে গাইতে খালি পায়ে শহীদ মিনারে পুষ্প নিবেদনের সময় দলীয় ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অকারণ বাড়াবাড়ি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক, না-কি তাদের আত্মার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নিদর্শন তা আমার মতো অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ঠেকে। সারা বছর শহীদদের পরিবারের খোঁজখবর না নেয়া, তাদেরকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার বেলায় সজ্ঞান উপেক্ষা, তাদের অসহায় স্বজনদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নিয়ে শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের জন্য সহমর্মিতা ও দরদ উথলে উঠার পেছনে অনেকের দৃষ্টিতে বিপণন ও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের দুরভিসন্ধি অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। সঙ্গত কারণেই বলতে হয়- শহীদদের নাম ভাঙ্গিয়ে যারা বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে বিন্দুমাত্র অবদান রেখেছেন- এমন কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না। তবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অমর ভাষা শহীদদের অতুলনীয় ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছেন বলে আমার বিশ্বাস।

যাহোক, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরা লাখো প্রতিকূলতার মাঝেও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সাড়ম্বরে উদযাপনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। আমার জানা মত নব্বইর

www.pathagar.com

দশকে হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রা উপেক্ষা করে নিউইয়র্কে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলাদেশ লীগের তৎকালীন সভাপতি ইলিয়াছ কবির, সাধারণ সম্পাদক এম এম শাহীন-এর নেতৃত্বে রাণী কবির, সাঈদ-উর-রব, এমাদ চৌধুরী, হাসিব চৌধুরী, কামাল ভাই, লাকী খালেক, বাবলা, ফেরদৌস খান, জনাব ফিরোজ,বানু, শাহীন চৌধুরী, সোহেল, সাইফুল ইসলাম রহিম প্রমুখ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ও বৈরি পরিবেশের সাথে পাঞ্জা লড়ে তারা কুইন্সের জন এফ মেরী পার্কে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের প্রথম আয়োজন করেছিলেন । শহীদ মিনার নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন শিল্পী খুরশিদ আলম সেলিম। নগ্ন পায়ে বরফ পদদলিত করে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ ও প্রভাতফেরীর পর দিনভর আলোচনা , সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় সবেধন নীলমণি নামে খ্যাত তৎকালীন বাঙালি মালিকানাধীন স্কাইল্যাইন রেস্টুরেন্টে। এর পরের বছর এম এম শাহীন ও অন্যান্যের সক্রিয় উদ্যোগে একই স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়। এ সময় শহীদ নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেন লেলিন। হাড়কাঁপুনে শীত উপেক্ষা করে এবং বরফ মাড়িয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও প্রভাত ফেরী শেষে দিনভর সেমিনার, আলোচনা ও সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় কমিউনিটির তৎকালীন মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত স্কাইল্যান রেস্টুরেন্টে। সেই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. খন্দকার আলমগীর ও কাজী জাকারিয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৌশিক আহমদ। পরবর্তীতে উত্তর আমেরিকায় কমিউনিটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে কখনো সম্মিলিতভাবে , কখনো এককভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হতে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে একুশ উদযাপনকে কেন্দ্র করে দেশে ও প্রবাসে বিভেদ-বিভক্তি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা গোটা কমিউনিটিকে দুশ্চিন্তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। মহান একুশ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি জাতীয় দিবসগুলো সম্মিলিতভাবে পালনের মাধ্যমে যেখানে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের কথা সেখানে আমরা ক্রম বিভক্তির শিকার হয়ে প্রায় অস্তিত্বশূন্য হয়ে পড়তে বসেছি। এক শ্রেণীর বাংলাদেশী এ সকল দিবসকে উপজীব্য করে দু পয়সা হাতড়ে নেয়ার ধান্ধায় মেতে উঠে বলে বাজারে গুঞ্জন শোনা যায়। তারা নিজেদের পছন্দমতো স্থানে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঘরোয়া পরিবেশে এ সকল জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানের নামে কমিউনিটিকে বিভ্রান্ত করছে এবং সুযোগ বুঝে কেউ কেউ মালপানি কামাচ্ছেন বলেও অনেক অভিযোগ উঠেছে। তাদের হাব-ভাব দেখলে মনে হয় তারা একুশ বিপণনের মাধ্যমে আত্মজাহিরে ও স্বার্থসিদ্ধির মহড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। ভুললে চলবে না- মহান একুশ

www.pathagar.com

যে বাঙালি জাতির শাশ্বত ও চির অম্লান অহঙ্কার সেই বোধটুকু যতো দিন সকল বাঙালির মধ্যে জাগ্রত না হবে ততোদিন আমাদের ক্রম অবক্ষয় অব্যাহত থাকবে এবং সেই অবক্ষয় কোনোক্রমেই ঠেকানো যাবেনা। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মন-মানসিকতা বা যোগ্যতা আমাদের না থাকলে তাতে আপত্তি নেই। তবে তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশে বা প্রবাসে স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টার মাধ্যমে শহীদদের আত্মাকে পীড়িত করার অধিকার কারো আছে বলে আমার মনে হয়না। ■

www.pathagar.com

তোরা যে যাই বলিস ভাই আমার সোনার চেয়ারটি চাই

প্রথমেই বলে নেই আমি কোন রাজনীতি করি না- তবে আমি একজন রাজনৈতিক সচেতন মানুষ বলে মনে করি। যে কারণে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করি বাংলাদেশের রাজনীতি। তারই সূত্র ধরে আমার এই লেখা। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৭ম শ্রেণীর একজন ছাত্র হিসেবে তখন অনেক বীভৎস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ স্বচোখে অবলোকনের সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি তখন স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছি, স্বাধীনতার যুদ্ধে বর্বর পাকবাহিনীর নানা অত্যাচার দেখেছি, স্কুলের জানালা দিয়ে জীবন্ত মানুষকে রাইফেলের বাট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করতে দেখেছি,জীপের পেছনে মানুষকে বেঁধে ক্যাপ্টেন দাউদের সদম্ভে গাড়ি

www.pathagar.com

চালানো দেখেছি, চাচাত ভাইকে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করতে দেখেছি, প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে মানুষকে পাখির মত হত্যা করতে দেখেছি। রাতে গুলি করে মেরে বন্ধুর বাড়ির কাছে রেল লাইনের পাশে আট-দশজনকে একই কবরে মাটিচাপা দিতে দেখেছি। গ্রামের হিন্দু বাড়িতে আগুন দিলে, প্রাণ রক্ষার তাগিদে আমাদের বাড়িতে পুকুরের দেয়াল টপকিয়ে আসার সময় আর্মি নির্মমভাবে গুলি করে একজনকে মারতে দেখেছি। আমি ১৯৭৫ সালের গণঅভ্যুত্থানে ক্যান্টনমেন্টে গুলি বিনিময় দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাসার পাশে মর্টার বসালে মা-ভাইদেরকে নিয়ে অসহায়ের মত দাদার বাড়িতে আশ্রয় নিতে দেখেছি । স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণ দেখেছি, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের চা, কাগজ এবং সোনালী আঁশকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সাথে পশুর মত আচরণ করতে দেখেছি, নীলকরদের মত শোষণ করতে দেখেছি। এরকম হাজার হাজার উপমা দেয়া যায়। এসব কারণেই পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে পিঠ দেয়ালে ঠেকার পর তা গণ-বিস্ফোরণ ও আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণে রূপ নেয়। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল- কোন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নয়, অধিকার আদায়ের স্বার্থে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। আমরা কেন স্বাধীনতা চেয়েছিলাম- স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের সেই আকাঙ্খা কী আদৌ পূরণ হয়েছে? সরাসরি যদি বলি তাহলে বলতে হয় আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে রয়ে গেছে আসমান যমীন ফারাক এবং বস্তুত আমরা একটি মানচিত্র পেয়েছি। তাছাড়া আর কী কিছু পেয়েছি? স্বাধীনতা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমরা কী এখনো পরাধীন নই? আমরা কী অর্থনৈতিক মুক্তি পেয়েছি? আমরা কী সামাজিক মুক্তি পেয়েছি? আমরা কী এখনো শাসকের হাতে শোষিত হচ্ছি না? আমরা কী ব্যক্তি স্বাধীনতা পেয়েছি? আমরা কি স্বাধীন দেশে মুক্ত মনে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা পেয়েছি? আমরা কী বাক-স্বাধীনতা পেয়েছি? আমরা কী সামগ্রিক অর্থে নিজেদের শৃঙ্খল মুক্ত করতে পেরেছি? স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা কী আমরা পেয়েছি? এ রকম হাজারো প্রশ্ন রাখা যেতে পারে বাংলাদেশকে নিয়ে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতি এবং হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা শুধু ভৌগোলিক অবস্থান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো, এর কাঙ্খিত সুফল সাধারণ মানুষ এখনো ভোগ করতে পারেনি, ভবিষ্যতে পারবে কি-না তাও বহুলাংশে অনিশ্চিত। কিন্তু কেন? এর জন্য দায়ী কে? মেজরিটি মানুষের

www.pathagar.com

মতামতকে উপেক্ষা করে প্রথমেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিদার হয়ে উঠলো একটি রাজনৈতিক দল। ২২ পরিবার থেকে জন্ম নিল ২২ হাজার পরিবার। এক লুটেরার কাছ থেকে জন্ম নিল হাজার লুটেরা। সর্বদলীয় মানুষকে নিয়ে সরকার গঠন করার কথা থাকলেও অন্যান্যদের উপেক্ষা করে নিজেদের লোকদেরকে নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করা হলো। অথচ ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-পেশা ও বয়স নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষই দেশপ্রেমের মহানমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাদের কাছে দল বড় ছিলো না, বড় ছিলো দেশ। কিন্তু স্বাধীনতার স্বঘোষিত দাবিদার রাজনৈতিক দলটি বেমালুম ভুলে গেলেন দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর যেখানে উচিত ছিল সবাইকে নিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করা, সেটা না করে শুরু হল ধরপাকড়, হত্যা, লুণ্ঠন, হিন্দুদের বাড়ি দখল করাসহ আরও কত কি? তার খেসারত জনগণ আজ পর্যন্ত দিচ্ছে। জাতিকে একত্র করার পরিবর্তে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতারা জনগণকে করেছেন বিভক্ত এবং নিজেরাও বিভক্ত হয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে সমাজে অরাজকতা, হিংসা, বিদ্বেষের বিস্তৃতি লাভ ঘটছে। এককথায় বলা চলে- আমাদের উত্তরণ ঘটেছে উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে। সেই আগুনে পুড়ে গোটা জাতি অদ্যাবধি খাক হচ্ছে। প্রথমে হোঁচট খেল বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা ও গণতন্ত্র। এরপর কী হলো- মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে স্বাধীন বাংলাদেশে কায়েম করা হলো- এক দলীয় বাকশাল। গঠন করা হলো ভিন্ন ধরনের বাহিনী। কণ্ঠরোধ করা হলো সংবাদপত্রের। দেশে শুরু হল বিভিন্ন অরাজকতা। পাকিস্তানী স্টাইলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনী নতুনভাবে চালাতে লাগলো বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন। জনগণের উপর নেমে আসে এই সব বাহিনীর জুলুমের স্টীম রোলার। প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ ছিলো না। যে টু শব্দটি করেছে তাকেই স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। রক্ষী বাহিনী দ্বারা নৃশংসভাবে খুন করা হল দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে। মূলত এখান থেকেই বিরোধের সূত্রপাত এবং সদ্য স্বাধীন বাঙালি আবারো অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। এক অন্যকে ঠেকাতে গিয়ে কল-কারখানায় আগুন দেয়া হল। অবশেষে অত্যাচার এবং বর্বর নির্যাতনে তরুণ সমাজ ও প্রতিপক্ষের পিঠ দেয়ালে ঠেকার পর জনগণ আবার গর্জে উঠল এবং নেমে আসলো রাজপথে। সদ্য স্বাধীন কোন দেশের মানুষ এত অল্প সময়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল বলে আমার জানা নেই। দেশে শুরু হল হত্যা। ক্ষমতা দখল- পাল্টা দখল। নিয়ম-নীতির কেউ তোয়াক্কা করত না। ফলে যা হবার তাই হলো। যদি সবাইকে নিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশে জাতীয় সরকার গঠন করা হতো তাহলে হয়ত এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। নির্মমভাবে পট পরিবর্তন হলো ক্ষমতার।

www.pathagar.com

পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতায় এসে স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা দিলেন। চালু করলেন বহু দলীয় গণতন্ত্র। জাতির মধ্যে আবারো প্রাণের সঞ্চার সৃষ্টি হলো। যিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন তার মধ্যে ছিল ভিশন। সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ এগিয়ে যেতে থাকলো উন্নয়নের দিকে। তার সময়ে মানুষ কিছুটা সুখ শান্তিতে থাকলেও ফাঁসিতে ঝুলানো হয় অনেক নেতাকে। যার বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকেও পরবর্তীকালে শেষ করে দেয়া হয়।

নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার মসনদে বসেন সামরিক জান্তা। আবারো গণ মানুষের অধিকার পদদলিত হতে থাকে। এই দুই রাষ্ট্র প্রধানের সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের আসল চেহারা ধরা পড়ে। টাকা এবং পদ দিয়ে তারা কিনে নেন রাজনৈতিক নেতাদের। তখন থেকে দেশে বেচা-কেনার রাজনীতি শুরু হয়। টাকার যুবকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেয় তাদের রাজনৈতিক আদর্শ। গঙ্গায় বিসর্জন দেন নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্রত। সামরিক জান্তার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র রক্ষায় আবারো রাজপথে নেমে আসেন। তাদের উপরে চালানো হয় বর্বরোচিত হামলা। কখনো কখনো শান্তিকামী আন্দোলনরত মানুষের মিছিলে তুলে দেয়া হয় ঘাতক ট্রাক। এ সময় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আন্দোলনরত দেশপ্রেমিকদের প্রাণ কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী সরকার মনে করেছিলো ক্ষমতার মসনদে চিরদিন বসে থাকবেন, কিন্তু তার সেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। গণ আন্দোলনে ভেসে গিয়েছিলেন সেই স্বৈরাচারি সামরিক সরকার। বাধ্য হয়েছিলেন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে। বাংলাদেশের মানুষ আবারো প্রমাণ করেছে রক্ত কখনো বৃথা যায় না। জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে এবং রক্তের হলি খেলা খেলে যে ক্ষমতায় থাকা যায় না তার মাজেজা বুঝতে পেরেছেন তৎকালীন স্বৈরাচারি সরকার। রক্তের সাগরে ভাসিয়ে নরপিশাচ পাকিস্তানী বাহিনী যেখানে দমাতে পারেনি বীর বাঙালিকে সেখানে তো স্বৈরশাসক নস্যিমাত্র। এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশ এবং গণতন্ত্র রক্ষায় পৃথিবীর আরো দেশের মানুষ তাজা রক্ত দিয়েছে বলে জানা নেই। অতঃপর গণতন্ত্র রক্ষা পেল, স্বৈরশাসকের বিদায় ঘন্টা বাজল। তবে স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেদের মধ্যে যে সমঝোতা সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে ক্ষমতার মোহে তা আর কেউ পালন করেননি। অপরাধী বিচারে শাস্তিভোগের পরিবর্তে প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মত রাজনীতি করতে শুরু করে এবং আমাদের দেশের জনগণের একটি অংশ এই অসৎ ব্যক্তির পিছনে দাঁড়ায়। এই অসৎ ব্যক্তিকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে বড় দুই দলকে টানাটানি করতে দেখা যায়।

পরবর্তীতে যে দুটো দল ক্ষমতায় এসেছে তাদের নিজেদের যোগ্যতা না থাকলেও

www.pathagar.com

বাবা বা স্বামীর দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। দেশকে যুগোপযোগী করে গড়ার একটা সুযোগ ছিল। উভয় দলের অভিজ্ঞ দাবীদার নেতারা নিজেদের ব্যর্থতা ও অপরিপক্কতা ঢাকার জন্য তাদেরকে সামনে রেখেছে মাত্র। দেশের কাজ না করে নেতারা দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের একান্ত ঘনিষ্ঠজনদের পূজো এবং বন্দনাতেই সময় অতিবাহিত করতে থাকলেন। তাদের নিজস্ব কোন ভিশন নেই। প্ল্যান নেই, প্রোগ্রাম নেই, পরিকল্পনা নেই, লক্ষ্য নেই। যে কারণে নিহত নেতাদের নানান দফা নিয়ে রাজনীতির মাঠে পুরানো বড়ি খাওয়ানোর চেষ্টা করতে থাকেন। সেই সাথে শুরু হয় মরা মানুষকে নিয়ে রাজনীতি। তাছাড়া এরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও এদের নিজ দলের মধ্যে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত আচরণে গণতন্ত্রের বালাই নেই। দলে নেতা যারা আছেন এদের অবস্থা অনেকটা ভেড়ার পালের মত। নেত্রী যাই বলেন, তারা তাই মাথা পেতে নেন। নেত্রী পদত্যাগের কথা বললে একযোগে সবাই পদত্যাগপত্র নেত্রীর হাতে তুলে দেন। এদের রাজনৈতিক কোন পরিকল্পনা না থাকার কারণেই জাতিকে দেয়ার মত কিছু থাকে না। সস্তা বুলি আউড়ে শুধু সময় নষ্ট করেছেন জাতির। তাছাড়া তারা কাজের পরিবর্তে সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন অবাধে করেছে। এদিকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো যাদের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারবে বলে ধারণা করে তাদেরকেই প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর আমাদের দেশীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা-নেত্রীরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এ সকল সংস্থার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। জাতিকে স্বাবলম্বী করার কোন পকিল্পনা এদের নেই। এরা বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কারণ বাঙালি জাতি যদি স্বাবলম্বী হয় তাহলে এদের সব জারিজুরি বেরিয়ে আসবে। নেতারা প্রতিবেশী দেশের উদ্দেশ্য হাসিল করতে গিয়ে নিজের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করে। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিদেশ থেকে যে অর্থমন্ত্রী ধার করে বেশি অর্থ আনেন তাদেরকে দেশে বলা হয় সবচেয়ে ভাল অর্থমন্ত্রী। আসলে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীরা মুদির দোকান চালানোর জন্য উপযুক্ত, দেশ চালানোর যোগ্যতা তাদের নেই বললে হয়ত বাড়িয়ে বলা হবেনা। শুধু অর্থমন্ত্রী কেন , অন্যান্য মন্ত্রীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আবার এক সরকার স্বৈরাচারি ও অনৈতিক কৃতকর্মের জন্য এরশাদকে জেলে রাখলেও পরবর্তীতে অন্য সরকার ক্ষমতায় এসে ক্ষমতায় টিকে খাকার লক্ষ্যে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাকে জেলখানার বাইরে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের স্বার্থের কারণেই আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের অপকর্মের কোন বিচার হয়নি। সব রাজনৈতিক দলের চরিত্র এক ও অভিন্ন। তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও লোক দেখানোর নামে মামলা হয়েছে, অতঃপর শেষ। শুধু কী তাই আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যাকান্ডগুলোর বিচার হয়নি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় ৪ নেতা, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ ছোট বড় নেতাদের হত্যাকান্ডের বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। বিচার নিয়ে রীতিমত লুকোচুরি চলছে; কিন্তু কেন বিচার হয়নি তার কোন সদুত্তর কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। মামলাগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন জটিলতা থাকলেও বিচারকার্য এত বিলম্বিত হবার কথা নয়। মূলত ১৯৯১ সাল থেকেই দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। মজার বিষয় হলো– যারাই গণতন্ত্রের কথা বলছেন, তারাই অগণতান্ত্রিক আচরণ করে যাচ্ছেন। ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে। যারাই নির্বাচনে হেরেছে তারাই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেছেন। সারা বিশ্বের পর্ববেক্ষকরা নির্বাচনকে সুষ্ঠু বললেও নির্লজ্জের মত আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা সেই নির্বাচনকে কারচুপির নির্বাচন বলে অভিহিত করেন। আবার উভয় দলের নেতা নেত্রীর মধ্যে কোন সৌহার্দ নেই। আবার সৌহার্দ না থাকলেও নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন। তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটাতে বিদেশ থেকে হায়ার করা প্লেয়ার দরকার হয়। তার পরও ঝগড়া মিটে না। এরা শুধু অবৈধ পথে জিততে চায়, হারতে চায় না। এরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করে। এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শোভা পায়, কিন্তু চরিত্রে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। এরা নিজেরা আইনের কথা বলে অথচ তারাই আইন মানেন না, অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দেন। সেই সাথে যারা নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন তাদের গায়েও বিভিন্ন ধরনের কালিমা লেপন করে দিতে তারা পিছ পা হন না। অথচ তাদের মনোনীত ব্যক্তিরাই নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন। যাকে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়, নির্বাচন শেষ হবার আগ পর্যন্ত তিনি থাকেন সবচেয়ে ভাল এবং নিরপেক্ষ মানুষ। নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেই হয়ে যায় কারচুপির নির্বাচন। আসলে এরা হলো হিপোক্রেট। এরা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে বলে দাবি করেন- কিন্তু বাস্তবে কী চিত্র দেখা যায়। এদের নিজেদের দলের মধ্যেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার প্রশ্ন উঠালেই তাদের কম্প দিয়ে জ্বর আসে। এরা যা বলেন, দলের অভ্যন্তরে সকলকে তা অধোবদনে ও বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হয়। দলের নেতা বা কর্মীরা এতই দুর্বল যে প্রতিবাদ তো দূরের কথা নির্জলা সত্যও সাহস করে উচ্চারণ করা বা টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস রাখে না। এরা মুখে এক কথা বলে, আর বাস্তবে প্রয়োগ করে স্বৈরাচারি মনোভাব। মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক হিসেবেও তাদের জুড়ি নেই। এদের মুখে যেন মিথ্যাই সারাক্ষণ শোভা পায়।

www.pathagar.com

বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও রাজনীতি থেকে অবসর নেননা। আবার অনেকেই দেশের সহজ সরল মানুষগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ওয়াদা দিয়ে ক্ষমতায় এসে তা আর বাস্তবায়ন করেন না। এরা যখন মুখে কথা বলেন, তখন তাদের হুঁশ থাকে বলে মনে হয় না। এটা শুধু দুই নেত্রীর বেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়– এটা দেশের পুরো রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আচরণের অন্যতম অংশ। নেত্রীরা যেমন মিথ্যা বলে থাকেন, নেতারাও মিথ্যা বলেন সমান তালে। বরং নেতারা কয়েক ডিগ্রী উপরে। আবার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এরা দেশের কাজ বাদ দিয়ে সারাক্ষণ তোষমোদে ব্যস্ত থাকেন নেত্রীদের। নেত্রীকে খোশ রাখার নিত্য-নতুন পন্থা উদ্ভাবনে তারা এতই ব্যস্ত থাকেন যে দেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ তাদের হয়না। নেত্রীকে তুষ্ট রাখতে গিয়ে তেল মর্দন করলে চলবে না, বিভিন্ন জেলা বা বিদেশ থেকে খাঁটি ঘি এনে মর্দন করতে হবে। তার সাথে টাকা পয়সা বাড়ি, কমিশন সহ অন্যান্য জিনিসও সাপ্লাই দিতে হয় বলে বাজারে গুঞ্জন রয়েছে। মোদ্দাকথা, নেত্রীর মনোরঞ্জন ও সন্তুষ্টির জন্য দলীয় নেতাদের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা কারও দৃষ্টি এড়ায়না। মনে হবে কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান। আবার এই সব নেতার আচরণ ও কর্মকান্ড পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এদের কোন আদর্শ বা চরিত্র নেই। চরিত্রবান লোকেরা অযোগ্যতার পরিচয় দেন নেতা-নেত্রীর তোষণে; আর চরিত্রহীন লোকেরা সবচেয়ে বেশি যোগ্যতার পরিচয় দেন ঐ সব নেতাদের মন যুগিয়ে চলার প্রতিযোগিতায়। দেশের রাজনীতি এদের হাতেই কুক্ষিগত। ক্ষমতার লোভে এরা ভোল পাল্টাতে ওস্তাদ। এমনও অনেক নেতা আছেন যখন যে দল সরকারে থাকবে তখন তারা সেই দলের সদস্য। দলের নেত্রীরাও এদেরকে উদ্বাহু বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানান। এদের কদর এত বেশি যে নিজে ফুল কিনে নিয়ে গিয়ে দলে যোগ দেয়। তারা চায়না নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠুক। নতুনদের কখনো তারা স্বাগত জানায় না বরং নেতৃত্বে জেঁকে বসার মানসিকতাই তাদের সচরাচর দেখা যায়। প্রয়োজন মত এদের ব্যবহার করে থাকেন লুডুর গুটির মত। যারা সারাক্ষণ দল পরিবর্তন করেন বেহায়ার মত- তাদের দাপট অনেক বেশি থাকে। দেশের রাজনীতি সব সময় অযোগ্য, মূর্খ, সামরিক-বেসামরিক আমলা, তোষামোদকারী, কালোবাজারি ও সন্ত্রাসীদের দখলে। কখনো মার্জিত, ভদ্র, জ্ঞানী-গুণী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা জায়গা করে নিতে পারেন না। রাজনৈতিক নেতারাই তাদের নিজেদের প্রয়োজনে সন্ত্রাসীদের সৃষ্টি এবং তাদের লালন করে। আর এই সব সন্ত্রাসীও সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দল পরিবর্তন করে থাকে- যে কারণে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। ধরা যাক পুলিশ একজন সন্ত্রাসীকে আটক করলো। সেক্ষেত্রে দেখা যায় তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য রাজনৈতিক নেতারাই থানায় টেলিফোন করে থাকেন। কারণ কি? অন্যদিক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বেফাস

www.pathagar.com

কথাবার্তা বলে থাকেন। সন্ত্রাসীকে ধরলে বলেন, ঐ দল ঘটনা ঘটিয়েছে আর অকারণে ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশে আমার দলের লোকদের পাকড়াও করা হচ্ছে। এভাবে আটক সন্ত্রাসী বিএনপির কর্মী বা আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবেই পরিচিতি পেয়ে যায়। এতে আসল সন্ত্রাসীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। সময় সময় নিরীহ লোকেরা অকারণ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হয়। নেতা-নেত্রীরা সব সময় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকের চাইতে অযোগ্য, অশিক্ষিত, সন্ত্রাসী, লোকদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করেন। প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায়– যারা সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি করে যা পায় তার একটি অংশ পার্টির তহবিলে বা অসাধু নেতাদের পকেটস্থ হয়। যে কারণে তারা সন্ত্রাসীদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন। বড় দলের মধ্যে কি পরিমাণ কর্মীরূপী সন্ত্রাসী রয়েছে- তা যদি নিরূপণ করে তাদের বিচার করা হতো তাহলে দেশে সন্ত্রাস অনেক কমে যেত। যারা সন্ত্রাসীদের লালন এবং পালন করে থাকে তারাও সন্ত্রাসী। শুধু সন্ত্রাসী বললে ভুল হবে এবং এরা বড় ধরনের সন্ত্রাসী। বাংলাদেশে যারা সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী তারা তত প্রভাবশালী মন্ত্রী বা এমপি। আগে এদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? তাছাড়া দলের মধ্যে নতুন কোন নেতৃত্ব আসারও কোন সুযোগ নেই- কারণ তোষামোদকারীরা নেত্রীর কাছাকাছি থাকার সুবাদে জ্ঞানীদের কাছে ভিড়তে দেন না, তাতে যদি নিজের পজিশনটি নষ্ট হয়ে যায়। নিজের পজিশন ধরে রাখার জন্য অথর্ব নেতারা নেত্রীকে সারাক্ষণ ভুল বুঝিয়ে এবং অন্যের বিরুদ্ধে গিবত গেয়ে থাকেন। তাতে করে নতুনদের সম্পর্কে নেত্রীর একটা খারাপ ধারণা জন্মে এবং অযোগ্য নেতার মনোবাসনাও পূর্ণ হয়। কিন্তু নেত্রী একটু চিন্তা করেন না যে আসলে ঘটনাটি কতটুকু সত্যি। মূলত নেতা-নেত্রীদের ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা নেই। এরা সব সময়ে কান কথা শুনতে অভ্যস্ত। কোন বাছ-বিচার না করেই তৈলমর্দণকারী নেতার কথাকে মসজিদের ঈমামের কথা মত ধর্মের মন্ত্র হিসেবে মেনে নেয়। তৈল মর্দণকারী নেতা যদি সত্যি কথা বলেন, তাতে না তার ভাগ-বাটোয়ারার হিস্যা কমে যায় এবং নেতৃত্ব না অযোগ্যতার কারণে নড়বড় হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে। বাংলাদেশের নেতা বা নেত্রীরা কোন নতুন নেতৃত্ব তৈরি হোক তা চান না। তারা সর্ব প্রথম বা সর্বশেষ, তাদের চাইতে এদেশে আর কেউ ভাল বুঝেন না বা জানেন না। আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, গলাবাজ এবং চোগলখোর নেতাদের তারা অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্ব দিয়ে দেন। তাতে করে তারা ব্রিটিশ আমলের জমিদারদের মত অন্যান্যদের সাথে আচরণ করতে থাকেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা যে স্বৈরতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক আচরণ করে থাকেন তা বেমালুম ভুলে যান। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত একই ধরনের লোকজন দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তারা দেশের কোষাগারকে লুটেপুটে খাচ্ছেন

www.pathagar.com

নিজেদের পৈত্রিক বা পূর্ব পুরুষদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ জ্ঞানে। কিন্তু তাদের কোন বিচার হচ্ছে না। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করে তারা ফুল বাবু সেজে বসে রয়েছেন, কিন্তু জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা তারা চিন্তা করেন না। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের সহজ সরল শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকজনের সাথে প্রতারণা করে আসছে। এই দু দলের কাছে বাংলাদেশের মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছে। নেতাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি অদ্যাবধি। তারা যে তিমিরে আছে– সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা নেতা, নেত্রী ও আমলাদের ছেলেমেয়েরা কাড়িকাড়ি অর্থ ব্যয়ে বিদেশে পড়াশুনা করছে। আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরছে। নেতারা দেশে বিদেশে বিশাল অট্টালিকা ও সম্পত্তির মালিক হলেও দেশের সাধারণ মানুষ এখনো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। অনেকেরই ভাগ্যে দু বেলা ভাত জোটে না। রাস্তা বা ডাস্টবিন থেকে কুকুরের খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে, শিশুরা স্কুলে না গিয়ে রাস্তায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হায়রে দেশের জনগণ। তারা যাকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে তারাই তাদের সাথে প্রতারণা বা বেঈমানী করেছে। কথায় আছে না যে যায় লংকা সে-ই হয় রাবণ।

দেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ কথাবার্তায় দায়িত্বহীনতার বড় পরিচয় দেন। সেই সাথে এক দল ক্ষমতায় গেলে অন্য দল তাদেরকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর অশুভ চেষ্টায় মেতে ওঠেন জনগণের দোহাই দিয়ে। তাতে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকুক বা নাই থাকুক। সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য এরা দেশ বিরোধী, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে থাকেন। তারা দেশের মধ্যে আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও এবং দেশের সম্পদ বিনষ্টের মহড়া চালান এবং বিদেশে এসে ক্ষমতায় যাবার জন্য দেশ বিরোধী মিথ্যা কথা-বার্তা বলে বেড়ান। ওদের কাছে দেশ এবং জনগণ বড় কথা নয়– ওদের কাছে ক্ষমতা হলো– বড় কথা। কবির ভাষায় বলতে হয়– তোরা যে যাই বলিস ভাই আমার সেই সোনার চেয়ারটি চাই। মজার বিষয় হলো, যারাই বিদেশে এসে দেশ বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কথাবার্তা বলেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয় শুধুমাত্র খেটে খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে। আইন শুধুমাত্র খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য; সমাজের উচ্চ বিত্তরা আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আজ পর্যন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। যে-ই ক্ষমতায় যাচ্ছে, সে-ই বিচার বিভাগের উপর নগ্ন প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। একটি স্বাধীন দেশে সবচেয়ে বড় সুযোগ ছিল নতুন করে সব কিছু সাজাবার; কিন্তু একবিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীর এই যুগেও ব্রিটিশ প্রণীত আইন এখনও দেশে বহাল তবিয়তে রয়েছে। দেশের জেলখানাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রায় জেলখানায় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ভীড়, সেখানে কোন সন্ত্রাসী বা গডফাদার নেই। যারা দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং অবৈধভাবে আন্দোলনের নামে দেশের সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেয় ও সম্পদ নষ্ট করে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না-এটার রহস্য আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। তাদের কাজ দেখে বুঝা যায় এদের স্বার্থ এক; বিদেশ ভ্রমণকালে দেশের প্রধানমন্ত্রীরা নামে বে-নামে ঐ সব সন্ত্রাসীদের সফরসঙ্গী করেন এবং তাদের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন। অথচ ও সব চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের জেলে থাকার কথা ছিলো। তা না হলে সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের যে হুমকি দেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। তিনি বলেন, ৩০ এপ্রিলের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তিনি হবেন বিএনপির চেয়ারপার্সন। কোন সুস্থ রাজনীতিবিদ এ ধরনের দায়িত্বহীন ও বেফাঁস কথা বলবেন আর তার বিচার হবে না, এটা কি করে সম্ভব। কোন দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র নিয়ে আব্দুল জলিল একথা বলেছিলেন। নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সংসদে না গিয়ে, সংসদ ভাতা নিয়ে অবৈধভাবে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো কতটুকু গণতান্ত্রিক। আপনাদেরকে জনগণ ভোট দিয়েছিল সংসদে গিয়ে আপামর জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে টেনে নামানোর জন্যে নয়। আব্দুল জলিল যে কথাটি বলেছেন, তাকে এক ধরনের বেসামরিক হুমকি বা ক্যু বলা চলে। দেশে যদি সামরিক ক্যুতে কেউ ব্যর্থ হতেন, তাহলে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হতো। কিন্তু হিসাব করলে দেখা যায়, আব্দুল জলিল দিনে-দুপুরে বুক উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তা না হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না কেন? তার এই ঘোষণার ফলে দেশে যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিলো, নষ্ট করা হয়েছিলো দেশের সম্পদ এবং সাধারণ মানুষের যে দুর্ভোগ হয়েছিলো এর দায়-দায়িত্ব কে নেবে? এই ঘোষণার সাথে যে শুধু আব্দুল জলিল দায়ী তা কিন্তু বলা যাবে না। এর সাথে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাও দায়ী এবং তার পেছনে কারা আছে তা খুঁজে বের করা দরকার। কারণ আব্দল জলিল তার অর্ডারই কার্যকর করেছিলেন। এরা জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে। এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গণতান্ত্রিক সরকারের এত ভয় কেন? বাংলাদেশের রাজনীতিবিদগণ সব সময় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় সর্বক্ষেত্রে। তারা অফিস আদলতে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়, তারা গলাবাজিতে বেশি অভ্যস্ত। নেতা-নেত্রীদের বেফাঁস কথাবার্তা বলার ফলে দেশে জনগণের মধ্যে চরম অস্বস্থিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এসব নেতা নেত্রী খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

একে অন্যকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। পরমত সহিষ্ণুতা কী জিনিস তা তাদের চরিত্রের মধ্যেই নেই। তাদের মন হিংসা বিদ্বেষে ভরপুর। এরা একজন অন্য জনকে সম্মান করতে জানে না। এদের লাগামহীন কথাবার্তা সারাদেশের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সংগঠনের সাধারণ কর্মীরা নেতা-নেত্রীদের পরোক্ষ নির্দেশে অতি উৎসাহে ধ্বংসাত্মক, কার্যকলাপ আরও বেশি করে। কারণ তারা ধরে নেয় নেতা-নেত্রী বলেছে। নেতাদের কথা না শুনলে অন্যান্যরা মনে করেন তাদের অবস্থান আরো নড়বড়ে হবে। যে দেশের নেত্রী বলে থাকেন, আর একটা লাশ পড়লে দশটা লাশ পড়বে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে থাকেন, আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছেন, সে দেশের এই ধরনের নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে সাধারণ জনগণ কী আশা করতে পারেন। এরা প্রকাশ্যে একজন আরেকজনকে অকথ্য ভাষায় গালামন্দ করলেও রাতে আসরের টেবিলে ঠিকই এক সাথে বসে ভাগবাটোয়ারা করে থাকেন। তারা একে অন্যের সাথে আত্মীয়তায় বন্ধনে আবদ্ধ হন। দিনে মুক্তিযোদ্ধা রাতে আবার রাজাকারের সাথে যোগাযোগ ও দোয়া চাওয়া-চাওয়ী হয়। এরা আসলে হিপক্রেট।

বাংলাদেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো- অযোগ্য নেতৃত্ব এবং নেতাদের নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। এদের কোন আদর্শ নেই। এমনকি সারা দেশের মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে ধর্মের কথা বলে সবচেয়ে খারাপ কাজগুলোও আমরা করে চলছি। এদের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতার জন্য তারা ডিগবাজির রাজনীতি করে। এরা যখন যার তখন তার। বাটার লাগানোতে সিদ্ধহস্ত এবং হটকারী ও কালোবাজারীরা আজ দেশের রাজনীতির কলকাঠি নাড়ছেন। এদের দাপটে কেউ নেত্রীর কাছে পৌঁছাতে পারেন না। আগে এক সময় দেখা যেতো শিক্ষিত এবং মেধাবী লোকজনই রাজনীতি করতেন। এখন আর শিক্ষিত এবং মেধাবী লোকজন রাজনীতিতে আসছেন না। রাজনীতিতে আসছেন যারা কালো টাকার মালিক, যারা সন্ত্রাসী এবং যারা মাসলের জোর দেখাতে পারেন। যারা তৈল মন্দনে ওস্তাদ। মজার বিষয় হলো নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার সময়ও কালোবাজারী এবং সন্ত্রাসীরা মনোনয়নে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন কমিশনের ভিক্তিতে। তারা বেচা-কেনা, বিভিন্ন ব্যবসায় কমিশন সংগ্রহ করেন। নেতা,নেত্রীরা কখনও কোনদিন অফিসে কাজ করেন না, নিয়ম-কানুন সমন্ধে কোন জ্ঞান তাদের নেই। তাই একদিন মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হলে ঐ প্রশাসন ফেল করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। অন্যদিকে ময়না পাখির মত বলে বলে সব চালানো যায়, কিন্তু দেশ চালানো যায় না। শিক্ষিত এবং পরীক্ষিত নেতারা দলীয় মনোনয়ন লাভে অবহেলিত হয়ে থাকেন। যে কারণে রাজনীতির উপর ভর করেছে অশুভ নেতৃত্ব এবং মেধা শূন্য হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস বাংলাদেশের রাজনীতিকে ক্যান্সারের মত আক্রান্ত করেছে। এই ক্যান্সারের যদি চিকিৎসা করানো না হয় তাহলে চরম মূল্য দিতে হবে। রাজনৈতিক নেতারাই এই ক্যান্সারের জন্মাদাতা। তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ এবং ক্ষমতার জন্যই সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেন ও লালন করেন। সন্ত্রাসী লালন করলে তাদেরকে আর জনগণের মতামতকে তোয়াক্কা করতে হয় না। মন্ত্রী ও এমপিদের ছেলেরা ভোট চলাকালীন সময়ে ভোটের বাক্স ছিনতাই করে। পুলিশ, এস পি, ডিসি, ওসিরা চাকরী হারানোর ভয়ে বোবা হয়ে যায়। কারণ একদল সন্ত্রাসী একজন নেতাকে অনেকগুলো ভোট দিতে পারেন। দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেখলে সরকার আছে বলে মনে হয় না। যে দেশে সন্ত্রাসীরা একজন আইন প্রণেতাকে মেরে ফেলতে পারে সে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? আইন প্রণেতাদের মেরে ফেলাতে কোন কর্তৃত্ব নেই। সরকারের উচিত রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত করা এবং সব রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিচার করা। প্রকৃত আসামী খুঁজে বের করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি করতে হলে পুলিশ বিভাগকে ঢেলে সাজাতে হবে। মান্ধাতার আমলের সিস্টেম বাদ দিয়ে অত্যাধুনিক টেকনিক শিখাতে হবে। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে সেমিনারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে যা শুধু পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে নয়। সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। পুলিশের সাথে কম্যুনিটির সুসম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক। আইনের সংস্কার করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ আমলের তৈরি করা আইন এখনো বাংলাদেশে চলছে। যা বিজ্ঞানের এই যুগে অনেকটা অচল। প্রয়োজনে পুলিশ বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়-পাশ করা দিশেহারা যুব সমাজকে কাজে লাগানো যেতে পারে; তাতে করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। তার আগে যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাবার পূর্বে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন ব্যুরো, রেডিও, টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসনের কথা বলে থাকে। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে অনন্তকাল মসনদে টিকে থাকা ও মসনদ আঁকড়ে রাখার স্বার্থে সেইসব নির্বাচনী ওয়াদা ভুলে থাকেন। সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না ; অচিরে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

একবার এক এমপিকে বলেছিলাম আপনি বাউন্ডেলের মত মন্ত্রীদের অফিস চষে বেড়াচ্ছেন কেন। উত্তরে এম পি সাহেব বললেন, ভাই ভিক্ষা করতে বের হতে হয়। যত বেশি হাঁটব ততবেশি ভিক্ষা হয়ত সংগ্রহ করতে পারব এলাকার জনগণের জন্য। আর যেটুকু ভিক্ষা করে সংগ্রহ করি তার ৪০% খেয়ে ফেলে দেয় যাদেরকে দায়িত্ব দেই তারা। এই দেশ এইভাবে চলবে। একটি দেশের শতকরা ৯০ ভাগ

www.pathagar.com

লোক অসৎ হলে চলবে কি করে? প্রতি উত্তরে বললাম, এমপি সাহেবের একটি অফিস নেই, স্টাফ নেই। আপনি তো মন্ত্রীদের কাছে জিম্মি, আপনি কি শিখবেন এবং শিখাবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মন্ত্রী, এমপি, জনাকয়েক মন্ত্রীর কাছে পুরো জিম্মি। তাদের গুড বুকে না থাকলে এলাকার জন্য কিছু পাবেন না; এতে আপনি বিরোধী দল, সরকারী দল বা স্বতন্ত্র দলের এমপি হোন না কেন তাতে কিছু যায় আছে না। সরকারী দল সব সময় দলীয় এমপিদের অধিক প্রাধান্য ও সুযোগ-সুবিধে দিতে এবং বিরোধী দলের এমপিদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চায় অর্থাৎ প্রত্যেক সরকারের সময় বিরোধী দলের এমপিদের এলাকার জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়। কোন কোন মন্ত্রী স্থান বিশেষ নিজেকে সর্বেসর্বা প্রমাণেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না। তারা হাবভাবে বোঝাতে চান- প্রধানমন্ত্রী কে? আমিই সর্বেসর্বা। আমার কাছে ধরণা না দিলে সব ধরনের বরাদ্দ বন্ধ। কিন্তু এই অযোগ্যরা একবারও নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করে না বা ইতিহাস থেকে শিক্ষাও নেন না।

সমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া। এক্ষেত্রে সুস্থ ও শিক্ষিত মানুষ যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে ভন্ড রাজনীতিবিদদের দিয়ে তা সম্ভব নয়। দুর্নীতিবাজ ও অদূরদর্শী রাজনীতিবিদরা দেশে সচিবদের দ্বারা অধিকাংশ সময় প্রভাবান্বিত হন। দুঃখের বিষয় হলো সচিব ডিকটেট করেন দেশের একজন মন্ত্রীকে। মন্ত্রীও তার কথা শুনতে বাধ্য থাকেন। কারণ তাদের দুর্নীতির সব কিছুই তো সচিবের হাতে ধরা পড়ে এবং সচিবরাও এতে ভাগ বসান। সুতরাং তারা সচিব এবং আমলাদের কাছে জিম্মি। মন্ত্রীরা যেহেতু দুর্নীতিবাজ সেহেতু সচিবরাও বিভিন্ন ধরনের এডভান্টেজ/ফায়দা নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে আমলারা মন্ত্রীদের মতই অযোগ্য। সুযোগ সন্ধানী আমলারা অযোগ্য মন্ত্রীদের বোকা বানিয়ে এবং নানা অনৈতিক কাজে সহযোগিতা করে নিজেদের অযোগ্যতাকে ঢেকে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে যাচ্ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই ব্যবস্থা নেয়নি। সর্বোপরি আমলারা নিজেদের বড় করার পরিবর্তে জাতিকে কল্যাণমূলক কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং রাজনীতিবিদরা এদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি একটি করে তার সমাধান করতে হবে। এই সব আমলা জনগণের দোহাই দিয়ে নিজেদেরকে বড় করা ছাড়া অন্য কিছু করে নি। আমলারা নিজেরা শুধু বড় হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমলারা ১ম, ২য় বা ৩য় হয়েছেন বলে শুনা যায়; কিন্তু ঐসব অথর্ব আমলা দেশের কোন মন্ত্রণালয়কে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কোন স্থায়ী রূপরেখা প্রণয়ন করে যেতে পারেননি। অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থে

www.pathagar.com

তারা গুলশান, বনানী, ধানমন্ডী, বারিধারায় হাল ফ্যাশানের বাড়ি তৈরি মহানন্দে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন ও ছেলে মেয়েদের বিদেশে পড়াশুনা করাচ্ছেন। এই সবের অর্থ কোথায় থেকে আসে? কেউকি একবার জিজ্ঞাসা করেছেন, ভাই সাহেব বেতনের সামান্য আয় দিয়ে কিভাবে এই আকাশ আড়াল করা বাড়ি বানিয়েছেন - দয়াকরে একটু জবাব দিবেন কি?

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এখন সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের ধর্মভীরু সহজ সরল মানুষগুলোকে বোকা বানিয়ে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ ধর্মের মিথ্যা লেবাস ও ফতোয়া দিয়ে ব্যবসা এবং নিজেদের আখের গুছিয়ে যাচ্ছেন। আর এটাকে পুঁজি করে একটি রাজনৈতিক দল ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার নীলনক্সা বাস্তবায়নের কাল্পনিক চিত্র আজো এঁকে যাচ্ছেন। তবে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু হলেও ধর্মান্ধ নয়। এ চক্রটি দেশে এবং বিদেশে বেশ সক্রিয়। তারা অব্যাহতভাবে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সরকার এদের বিরুদ্ধে নির্লিপ্ত। কেন সরকার নীরব, এর মাজেজা বুঝা বড় ভার। যে ধরনের বক্তব্য এবং বিবৃতি তারা দেশের বিরুদ্ধে দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে, এই অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করা যেত। সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে এদের সাহস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরা যে দেশের কত বড় ক্ষতি করছেন তা তারা নিজেরাও জানেন না। দেশমাতৃকার সাথে গাদ্দারি কোন সচেতন দেশপ্রেমিক মেনে নিতে পারেন না। সত্যি কথা বলতে কি কাজ দেখে মনে হয় এরা ১৯৭১ সালের রাজাকারদের চাইতেও জঘন্য। এদের নিন্দা জানানোর ভাষাও আমার জানা নেই। দেশের স্বার্থে এদের এই মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করা উচিত এবং সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। অন্যদিকে বাংলাদেশের কিছু কিছু লোক অন্যদের ধার করা সংস্কৃতিকে লালন করতে যেয়ে নিজেদেরকে খুব বেশি প্রগতশীল ভাবছেন; বাস্তবে এর কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা । মাইকেল মধুসূধন, ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ইংরেজ বনতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বনতে পারেননি। তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল নিজের ঐতিহ্যে।

বলতে লজ্জা লাগে স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও বাংলাদেশ ভিখারীর দুর্নামটি ঘুচাতে পারেনি। দুর্নীতিতে আমরা বার বার হ্যাট্রিক করেছি। যে দেশের সিংহভাগ রাজনীতিবিদ দুর্নীতিগ্রস্ত সেদেশে দুর্নীতি বন্ধ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। জনগণ যাদের উপর নির্ভর করছে, যাদেরকে বিশ্বাস করছে, তারাই পরবর্তীকালে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাছাড়া এ টু জি পর্যন্ত প্রতিটি লোক আজ ঘুষ ছাড়া কাজ করেন না। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আজ দুরারোগ্য

www.pathagar.com

ক্যান্সারের মত ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ভিখারী করে রাখার জন্য ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদ ও আমলারাই প্রধানত দায়ী। রাজনীতিবিদরা দেশের যেটুকু ক্ষতি করছেন, বাকিটুকু করছেন আমলারা। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এখন চোরে চোরে মাসতুত ভাই। এই দুটি চক্র ভাগাভাগি করে দেশের বারোটা বাজাচ্ছে। তারা বাংলাদেশের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে শুধু অন্তরায় সৃষ্টি করছে না বরং দেশটাকে অভাব-অনটনের অতলস্পর্শী সাগরে তলিয়ে দিতে সর্বদা তৎপর। দেশ স্বাবলম্বী হলে তাদের ভাগের পয়সা কমে যায় এবং রাজনীতিবিদদের কাছে জিম্মি দেশবাসী হয়ত বা আরও কিছু প্রত্যাশা করতে চাইবে। যে কারণে বাঙালিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের সমসাময়িক যে কয়েকটি দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ তাদের অবস্থান কোথায়, আর আমাদের অবস্থান কোথায়? যেখানে বাংলাদেশের উন্নতি হবার কথা সেখানে অথর্ব, অযোগ্য, মিথ্যাশ্রয়ী, অদূরদর্শী রাজনীতিবিদদের কারণে বাংলাদেশ ভিক্ষুকের জাতির কালিমাটি আজো ঘোচাতে পারেনি। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রযুক্তিগত ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশকে ভিখারীর জাতি থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার পারস্পরিক কুৎসা রটনা ও জেদাজেদির নমুনা দেখলে মনে হয় তারা পরস্পর সপত্নী। গ্রাম্য অশিক্ষিত সপত্নীদের আচরণেও এমন অভব্যতা ও নোংরামির নমুনা মেলা ভার। অথচ দেশের সর্ববৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও এই দু'নেত্রী একজন আরেক জনের সাথে কথা বলাতো দূরের কথা মুখ চাওয়া-চাওয়ী পর্যন্ত করেন না। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রই কী তারা দেখাচ্ছেন তাদের নেতা কর্মী ও দেশবাসীকে। তাদের কাছ থেকে এই তালিম নেয়ার কারণেই এক দলের কর্মীরা প্রতিপক্ষীয় দলের কর্মীদের প্রতি শোভনীয় আচরণ করতে ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন না। এর ফলে দেশে হিংসা, বিদ্বেষ ও সন্ত্রাসী ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দুই নেত্রী যদি একে অপরকে সম্মান না করেন, তাহলে গণতন্ত্র চর্চা হবে কী করে? তাছাড়া একজন তো এমন বিশ্রী ভাষায় কথা বলেন এবং মন্তব্য করেন যা শুনলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। অথচ তিনি হেসে হেসে নির্লজ্জের মত হরহামেশা এই কথা বলে যান। এই যদি হয় নেত্রীদের আচার-আচরণ, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তাদের কাছ থেকে কি শিখতে পারেন? এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এরা শুধুমাত্র ডক্টরেট ডিগ্রী নিচ্ছেন পয়সা দিয়ে কিনে, যোগ্যতা দিয়ে নয়। এদের মুখের চিকিৎসা করাতে হবে, না হলে এদের ভাষা ও বক্তৃতা শিখার জন্য স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। রাজনীতিবিদরা হীনম্মন্যতায় ভোগে।

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলাদেশ কী আদৌ স্বাধীন। যেভাবে আমরা মুরুব্বীবেষ্টিত হয়ে মেরুদন্ডহীনভাবে চলছি তাতে এই প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক নয় কী? বাংলাদেশ কিভাবে চলছে, দেশে কি হবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী-তা আজকাল নির্ধারণ করে দেন মুরুব্বীরা। আগে শোনা যায়, ঢাকাতে বৃষ্টি হলে ছাতা ধরা হতো মস্কোতে- এখন শোনা যায়, ঢাকায় বৃষ্টি হলে ছাতা ধরা হয় আমেরিকায়। কবে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবো? এটাও নির্ভর করছে দেশের সব রাজনীতিবিদের উপর। কারণ তাদেরকে বিদেশী তোষামোদী এবং নালিশ করার মানসিকতা বাদ দিতে হবে। দেশে যা হবে তার সমাধান দেশেই করতে হবে। মনে রাখতে হবে বিদেশে আমাদের বন্ধু থাকতে পারে, প্রভু নয়।

এ বাস্তবতা আমাদের ওভারকাম করতে হবে। এ দেশে আমরা কী একজন মাহাথির মোহাম্মদ ও নেলসন ম্যান্ডেলার মত দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতে পারি না। যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম। আমাদের যেন আর শুনতে না হয় কেউ কথা রাখেননি। প্রশ্ন হলো- কতদিন? ■

www.pathagar.com

ফোবানা ঃ দিনের আলোর মুখোশ পরা নেতাদের রাতের খেলা

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে ফোবানা সম্মেলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল- যার ধারাবাহিকতা আজো অব্যাহত রয়েছে বটে, কিন্তু জন্মস্থান ওয়াশিংটনে ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনে ফোবানার আদর্শ বিরোধী অনেক অনেক কাজ হয়েছে যা একটি লেখার মাধ্যমে শেষ করা যাবে না। এই ফোবানাকে নিয়ে প্রবাসে ও দেশে অনেক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। কোর্ট-কাচারি হয়েছে, আবার অনেক ভাল ভাল কাজও হয়েছে। তবে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির পর এবং কর্মকর্তাদের অদূরদর্শিতার কারণে ফোবানার যতটুকু এগিয়ে যাবার কথা ছিলো সেই পরিমাণ আগাতে পারেনি। ফোবানাতে বিভিন্ন সময়ে মুখোশপরা

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের দেশের ও বিদেশের অনেক নামী-দামী অতিথিরা এসেছেন। ফোবানাকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে স্বার্থের কারণে ভেতরে- বাইরে ষড়যন্ত্র হয়েছে, এক একজনের ব্যক্তিগত চক্রান্তে দখল করার মানসিকতার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। নানান কারণে ফোবানার আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা আজো অব্যাহত আছে। ফোবানাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত, সৎ, আদর্শবান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের যা ফোবানা কমিটিতে সচরাচর ছিলো অনুপস্থিত। ফোবানা কমিটির ব্যর্থতার কারণে আজ পর্যন্ত ফোবানা সাংগঠনিকভাবে দাঁড়াতে পারেনি। কমিটির সদস্যদের অজ্ঞতা, নিবুর্দ্ধিতা এবং কর্মকর্তাদের সুবিধাবাদী চরিত্র এর জন্য অনেকাংশে দায়ী বটে। আমার দেখা ফোবানার ভিতরে ও বাইরের কিছু কার্যক্রম এই ছোট্ট লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে রয়েছে ফোবানাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা-বিভক্তির কথা, দিনের আলোর নেতাদের রাতের খেলার কথা এবং চেয়ার পেলে সব ভুলে যাবার কথা, চেয়ার দখলের কথা, বিভিন্ন সময় ফোবানা থেকে বের হয়ে গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নেতা হয়ে পরবর্তীকালে ঐক্যের কথা। সমাজে ঐসব অনৈক্য সৃষ্টিকারীদের বার বার আমরা চিহ্নিত করেছি। তা সত্ত্বেও ফোবানা আসলেই আমার কাছে অনুরোধ আসে বসা দরকার, ঐক্য করার দরকার। তাদেরকে বলেছি আমাদের মধ্যে অনৈক্য নেই। আপনারা টাকা খরচ করে দেখুন কেমন লাগে। সমাজে ভাল কাজ করার চাইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা কঠিন।

ঠিকানা পত্রিকার সাথে জড়িত থাকার কারণে প্রবাস, দেশ ও বাঙালির চরিত্রের নানান দিক অবলোকনি করার সুযোগ পেয়েছি; কমিউনিটির উত্থান-পতনের কিছুটা হলেও নীরব সাক্ষী আমি। আজকের এই লেখায় আমি সব বিষয়ে আলোচনা করবো না; অভিজ্ঞতার আলোকে শুধুমাত্র ফোবানা সম্মেলন নিয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তাতে হয়তো কেউ কেউ ব্যথিত হবেন, আবার অনেকেই না জানা ভিতরের তথ্যগুলো জানতে সক্ষম হবেন। ফোবানা সম্মেলন শুরু হয়েছিলো ১৯৮৭ সালে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ওয়াশিংটন ডিসি। সেই সম্মেলনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক ইকবাল বাহার চৌধুরী ও সেক্রেটারি ছিলেন লেখক ওয়াহেদ হোসেইনী। সেই সম্মেলনে আমার কোন ভূমিকা ছিলো না। আমি শুধুমাত্র দূর থেকে দেখেছি বা জেনেছি। তবে প্রশ্ন জেগেছিলো কি আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ফোবানা বাংলাদেশ সম্মেলন শুরু করেছিলেন। কর্মকান্ড দেখে আমার মনে হয়েছে তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সঠিক ছিলো না। তাদের আদর্শ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যদি ঠিক থাকতো তাহলে আজকে ফোবানা নিয়ে এত বিবাদ-বিভক্তির সৃষ্টি হতো না। তখন প্রবাসে বাংলাদেশীদের সংখ্যা হয়ত কম

www.pathagar.com

ছিলো, কমিউনিটি হয়ত ছোট ছিলো, সেই দিক থেকে তারা ব্যাপকভাবে চিন্তা ভাবনা করে ফোবানার আদর্শ, উদ্দেশ্য বা নীতি ঠিকমত নির্ধারণ করেননি বা করতে পারেননি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য হয়ত মহৎ ছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৮৮ সালে দ্বিতীয় উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলনের আসর বসেছিলো বিশ্বের বাণিজ্যিক নগরী নিউইয়র্কের জ্যামাইকার থমাস এডিসন হাইস্কুলে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক। কনভেনরের দায়িত্বে ছিলেন- ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ,আর মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন- সৈয়দ টিপু সুলতান। সেই সম্মেলনেও আমি একজন দর্শক ছিলাম। আমি ওই সম্মেলনে দেখেছি জার্মান থেকে আগত একদল তরুণকে প্রতিবাদ করতে। তাদের প্রতিবাদের কারণ হলো- বাংলাদেশ সোসাইটির একটি অনুষ্ঠানে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তার উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা। তারা ভেলা এঁকে কার্টুনের মাধ্যমে জার্মান/বাংলাদেশ থেকে আসা বাংলাদেশীদের সম্পর্কে ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে কটুক্তি করেছেন এবং দেশ থেকে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। এই অনভিপ্রেত ব্যঙ্গাত্মক কার্টুনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল তরুণরা। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। তরুণদের সাথে তখন সমঝোতা করেছিলেন ডঃ ওয়াদুদ ভুঁইয়া। যে কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সোসাইটি সম্মেলন করতে পারে। না হলে হয়ত ঐদিন সম্মেলন হতো না।

তৃতীয় উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বস্টনের এম আই টির ক্রেস জি অডিটরিয়ামে ১৯৮৯। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড, বস্টন। চেয়ারপারসন ছিলেন প্রফেসর এ কে আবদুল মোমেন এবং জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন প্রফেসর নাসের আহমেদ। এই সম্মেলনে আমার যাওয়া হয়নি।

১৯৯০ সালে চতুর্থ উত্তর আমেরিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ডালাসে, ডালাস কনভেনশন সেন্টারে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস ও কো-হোস্ট হিসেবে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব হিউস্টন। কনভেনর ছিলেন আবুল কালাম এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন আবদুল্লাহ হাসান। এই সম্মেলনেও আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তবে লোকমুখে শুনেছি এই সম্মেলন নাকি খুবই সুন্দর হয়েছিলো।

পঞ্চম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন ১৯৯১ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জ্যামাইকার পি এস ১৩১ স্কুলে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক। কনভেনর ছিলেন আওলাদ হোসেন এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন ডাঃ মাঈনুল ইসলাম মিয়া। এই সম্মেলনেও আমি দর্শক হিসেবে

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলাম।

১৯৯২ সালে ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো শিকাগোতে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড। প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডাঃ মোহাম্মদ সিরাজুল্লাহ এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ছিলেন জাফর আশরাফ। এই সম্মেলনে আমার যাওয়া হয়নি। তবে শুনেছি কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে ।

তারপর আমেরিকার গন্ডি পেরিয়ে কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন ১৯৯৩ সালে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশনে অব টরেন্টো, অন্টারিও। চেয়ারম্যান ছিলেন শামসুল হুদা। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পরবর্তী বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে নিউজার্সীতে। নিউজার্সীতে তখন সংগঠনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বিরাজমান ছিল। তবে শর্ত থাকে সম্মেলন নিয়ে নিউজার্সী সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভক্তির নিরসন না হলে সম্মেলন একই বছর অনুষ্ঠিত হবে বস্টনে। তখন নিউজার্সীর কর্মকর্তারা চালাকি করে সম্মেলন আনার জন্য এমন ভাব দেখালেন যে, মনে হলো তাদের মধ্যকার বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। তারা শুধুমাত্র সম্মেলন আনার জন্য সাময়িক সমঝোতার নাটক করেছেন যা বুঝা গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে আসলেই সমঝোতা হয়নি। দু পক্ষের মধ্যে সম্মেলন নিয়ে বিরোধ আরো চরম আকার ধারণ করলো। এক পক্ষের সভাপতি ছিলেন ডঃ ছিদ্দিকুর রহমান; অন্য পক্ষের সভাপতি ছিলেন দেওয়ান শামসুল আরেফিন। এমনকি এ বিরোধ নিয়ে কোর্ট কাচারীর আশ্রয় নিতে হল দু জনকে। বিরোধ যেহেতু নিষ্পত্তি হয়নি, সেহেতু টরেন্টো সম্মেলনের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অষ্টম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন চলে যায় বস্টনে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৯৪ সালে। কনভেনর ছিলেন ডঃ শাহজাহান মাহমুদ এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন এম এইচ সাঈদ লিটন। এদিকে ডঃ ছিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে নিউজার্সীর একটি গ্রুপও সম্মেলনের নাম দিয়ে সম্মেলন করে এবং দেওয়ান শামসুল আরেফিন যোগ দেন বস্টন সম্মেলনে। একজন সংবাদকর্মী হিসেবে তখন আমি সত্যকে সাপোর্ট করা নিজের দায়িত্ব মনে করেছিলাম। ঠিকানা ও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বস্টন সম্মেলনকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করি। তখন থেকেই মূলত আমি ফোবানার সাথে পুরোপুরি যুক্ত হই। পরবর্তীতে ডঃ শাহজাহান মাহমুদ সাহায্যের কথা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ভুলে গিয়ে নানাভাবে ডিগবাজি খেলতে শুরু করলেন। তার ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বস্টন সম্মেলন থেকে পরবর্তী সম্মেলন দেওয়া হল মন্ট্রিয়লে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সেন্ট লরাকে। এর কনভেনর ছিলেন মোঃ আবু সাঈদ। তারা

www.pathagar.com

সম্মেলন করেন শেরাটন হোটেল টাওয়ার মন্ট্রিয়ল।

অপরদিকে নিউজার্সী থেকে সম্মেলন দেওয়া হল কানাডা মন্ট্রিলকে। কনভেনর ছিলেন ডঃ আবুল লায়েস শের। সেক্রেটারি ছিলেন মাসুম রহমান ও নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু। ডঃ শের এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে আলোচনা করে কোন মজা পাওয়া যায় না। তিনি বেশি গোঁয়ার্তুমি করেন। এমনকি তিনি লিয়াকত হোসেন আবুর সাথেও খারাপ ব্যবহার করেছিলেন এক পর্যায়ে।

আবু সাঈদের দেওয়া দশম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন নিউজার্সীতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউজার্সী। কনভেনর ছিলেন ডঃ জগলুল কবীর ও মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন লাজিমা মাহমুদ। অপরদিকে অন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফ্লোরিডায়। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা। কনভেনর ছিলেন ডঃ আবদুস সাত্তার খান এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন মোহাম্মদ এমরান। ডঃ জগলুল কবীরের সম্মেলন সুন্দর এবং সুষ্ঠু হলেও অপর দিকের অর্থাৎ ফ্লোরিডার সম্মেলনে কে বা কারা বোমা ফোটাল। ফলশ্রুতিতে প্রধান অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্যরা দৌড়ে প্রাণে রক্ষা পেলেন এবং সম্মেলনের সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

বিভক্ত সম্মেলনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের একাদশ উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলনের দায়িত্ব দেয়া হয় লসএঞ্জেলেসের বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়াকে। আমাদের (ডঃ কবীর) পক্ষ থেকে কনভেনর ছিলেন ডঃ জয়নুল আবেদীন এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ছিলেন হাদী হাসান ডিউক। লসএঞ্জেলেসের সম্মেলনের পূর্বে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। আমি যেহেতু সম্মেলনে সক্রিয় ছিলাম সেহেতু প্রস্তাবটি আসে অপর পক্ষ থেকে আমার কাছে। আমি কম্যুনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে সবাইকে নিয়ে নিউইয়র্কের মেরিয়ট হোটেলে বসি এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমঝোতায় উপনীত হই। সমঝোতার প্রথম শর্ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা যেখানে অর্থাৎ লসএঞ্জেলেসে সম্মেলন দিয়েছি– সেখানে যৌথভাবে প্রথম সম্মেলন হবে এবং পরবর্তী সম্মেলনে অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে আমরাও যোগ দেব। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লসএঞ্জেলেসে।

লসএঞ্জেলেস সম্মেলনে গেস্ট আনার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব আসে। এক পর্যায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আনার জন্য আমাকে প্রস্তাব দেয়া হল রাণী ভাবীর মাধ্যমে কনভেনর ডঃ জয়নাল আবেদীনের পক্ষ থেকে। আমি অনেকের

www.pathagar.com

সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে তাকে গ্রীণ সিগন্যাল দেই আনার জন্য। প্রায় রাত্রেই তিন লাইনে (রাণী ভাবী+ডঃ জয়নাল ও আমি) সম্মেলনকে সফল করার ব্যাপারে কথা বলতাম, প্রায়ই তাকে উপদেশ দিতাম। কিভাবে সম্মেলনকে আরও সুন্দর করা যায় তা নিয়ে আমার ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টার ইয়ত্তা ছিল না। সম্মেলনে গিয়ে বুঝতে পারলাম ডঃ জয়নাল আবেদীনের কথা ও কাজে মিল নাই। এরই মধ্যে সম্মেলনের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন মন্ত্রী জনাব আব্দুর রাজ্জাককে আনার জন্য। আমি বললাম অসুবিধা নেই, নিয়ে আসুন। সাথে সাথে এও প্রস্তাব করা হল- তিনি যাতে সম্মেলন উদ্বোধন করতে পারেন প্রধান অতিথি হিসেবে। আমি তখন বাধা হয়ে দাঁড়াই। আমি বলি বেগম খালেদা জিয়া ও জনাব আব্দুর রাজ্জাক একই মাপের নেতা নন। বেগম খালেদা জিয়া হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, চেয়ারপারসন একটি দলের। আর রাজ্জাক সাহেব হলেন, বর্তমান মন্ত্রী। তিনি বিশেষ অতিথি হয়ে থাকবেন আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রধান অতিথি হয়ে আসন অলংকৃত করবেন। এতে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মকর্তা মনে কষ্ট পেলেন, যার কারণে তারা পরবর্তীতে ষড়যন্ত্র করে যাতে এই সম্মেলন সার্থক না হতে পারে তার জন্য স্থানীয় তাদের কিছু বন্ধু-বান্ধবদের দিয়ে সম্মেলনের পার্শ্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বর্তমান এমপি এম এম শাহীন ঐ অনুষ্ঠানে গিয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন এবং বুঝান। সম্মেলনে রাজ্জাক সাহেব প্রধান অতিথি হয়ে না আসতে পারায় তারা আবার ১৯৯৯ সালে প্রধান অতিথি করে রাজ্জাক সাহেবকে নিয়ে এলেন আটলান্টায় এবং বিশেষ অতিথি হয়ে আসলেন ওবায়দুল কাদের। তখন আমি আবার সম্মেলনের সেক্রেটারি লিয়াকত হোসেন আবুকে বলি আওয়ামী লীগের রাজ্জাক সাহেব ও কাদের সাহেব আসলে সম্মেলনটি একটি গ্রুপের হয়ে যাবে। ব্যালেন্স করার জন্য বিএনপির একজনকে নিয়ে আসেন। তখন সিদ্ধান্ত হয় মেজর (অবৎ) আক্তারুজ্জামানকে আনার জন্য। ঐ সম্মেলনে উভয়ই গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন যা অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পূর্ব শর্তানুসারে ঐক্যের ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক। কনভেনর ছিলেন মোহাম্মদ আকতার হোসেন এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন খান। এই সম্মেলন ছিলো বিশৃঙ্খলার সম্মেলন। এই সম্মেলনে ঘটে চেয়ার দখলের মহড়া এবং আর্থিক অনিয়মের ঘটনা। সুনামের চেয়ে দুর্নামের ঘটনা ঘটে বেশি। বিভিন্ন অনিয়ম ও অর্থ কেলেংকারির কারণে নিউইয়র্কবাসীর সম্মানে প্রচন্ড আঘাত আসে। এই সম্মেলনের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৯৯ সালে যখন আটলান্টার জর্জিয়ায় সম্মেলন যায় তখন প্রথম দিকে সবকিছু ঠিকঠাক মতই চলছিলো। সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন ছিলো

www.pathagar.com

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব জর্জিয়া। কনভেনর ছিলেন মিন্টু রহমান এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন আবু লিয়াকত হুসেন। সম্মেলনের কাজ যখন পুরোদমে এগিয়ে চলছিলো, ঠিক তখনই সম্মেলনের বিরোধিতা করে একটি গ্রুপ সম্মেলনের নামে কাছাকাছি একটি হোটেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পূর্ব সিদ্ধান্তানুসারে নিউইয়র্ক থেকে সম্মেলন দেওয়া হয় জর্জিয়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনকে। ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিরোধপূর্ণ স্টেটে সম্মেলন না দেয়ার বিধিবদ্ধ আইন থাকা অবস্থায় নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচিয়ে আটলান্টার প্রতিনিধি হিসেবে তখন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন মোহাম্মদ জামান ঝন্টু, ডঃ আওয়াল ও ইউসুফ আলী। সংগঠনের নির্বাচন ঘনিয়ে এলে নির্বাচনে যারা জয়ী হবেন তারাই হবেন উক্ত সম্মেলনের কর্মকর্তা। ইতিমধ্যে মোহাম্মদ জামান ঝন্টু নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। ৬ জনের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবার কথা। তার মধ্যে ঝন্টু বাদ পড়েন। অপরদিকে মিন্টু ও আবু সাহেব নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি হিসেবে জয়ী হলে তারা কনভেনর ও সেক্রেটারি হিসেবে সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সময় তারা ঐ তিন কর্মকর্তাকে না নিলেও পারতেন। তারপরও তাদের সম্মান দেওয়ার জন্য অপর তিন কর্মকর্তা যারা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন নিউইয়র্ক সম্মেলনে অর্থাৎ ডঃ আউয়াল ও ইউসুফ আলীকে সম্মেলনের এবং নির্বাচনে পরাজিত জনাব ঝন্টুকেও কো-কনভেনর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতদ্সত্ত্বেও ঝন্টু সাহেব এক পর্যায়ে বেঁকে বসেন যে মিন্টু ও আবুকে সাহায্য করবেন না। ইতিমধ্যে ঝন্টু সাহেবকে নিউইয়র্ক থেকে বিএনপির কিছু লোক ইন্ধন দিতে শুরু করলেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি আলাদাভাবে একটি হোটেলে সম্মেলনের বিপরীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া আয়োজন করেন। সম্মেলনের পর উভয় গ্রুপের মধ্যে কোর্ট কাচারি করতে হয় এবং পরবর্তীকালে মিন্টু ও আবু গ্রুপ কোর্টে জয়ী হলে তাদেরকে আটলান্টা এক্সপো সেন্টারের খরচের টাকার অংশ দিতে হয়েছে। উত্তর আমেরিকা ফোবানায় কিছু কিছু কর্মকর্তা আবুকে ডিকটেট করতে শুরু করেন। আবু ঐসব কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন- 'ম্যারা আঙ্গিনামে তোমারা কিয়া কাম হ্যায়।' এই কথা শুনে ফোবানার কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা জনাব আবুর উপর ভীষণ ক্ষেপে উঠেন ও সম্মেলনের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। যদিও আবু একটু বেশি কথা বলেন, কিন্তু তিনি ফোবানার জন্য ভীষণ কাজ করেছেন যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

এর মধ্যে পুরনো মানসিকতাকে পুঁজি করে এবং নিজস্ব স্বার্থের কারণেই সম্মেলনে আবারো বিভক্তির কালিমা এঁকে দেয় ঐ চিহ্নিত গ্রুপ। ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত পুরোদমে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কনভেনর ও মেম্বার সেক্রেটারির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সাধারণ প্রবাসীদের সহযোগিতার কারণে। সম্মেলনের পূর্বে এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

জনাব আবু আমার ও ঠিকানার সাহায্য চাইলেন। আমি তাকে বললাম চালিয়ে যান, আমি আপনার সাথে আছি। এই সম্মেলনে ষড়যন্ত্রকারীদের পুরো মিশন ব্যর্থতায় পরিণত হয়। বলতে গেলে আমি ও আবু বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব থেকে ফোবানাকে মোটামুটি বাইরে নিয়ে আসি।

আমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রবাসে রাজনীতিমুক্ত সম্মেলন করা। সেই হিসেবে আমি জনাব আবুকে সাহায্য করেছি বিভিন্নভাবে। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনীতিবিদ যারা সুবিধা করতে পারছিলেন না তারা লেজ গুটিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময় ফোবানাকে রাজনীতির বাইরে দেখতে চেয়েছি। যারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন সম্মেলনে তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। এটা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভাল চোখে দেখেনি। উদ্দেশ্য ছিল একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফরম গড়ে উঠুক।

আটলান্টায় সম্মেলনে যখন বাংলাদেশ লীগের প্রতিনিধিত্ব করি তখন সবাই বলল নিউইয়র্কে সম্মেলন নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সম্মেলনের জন্য বাংলাদেশ লীগ তখন প্রস্তুত ছিলনা। অন্যদিকে আর্থিক দিক থেকে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সম্মেলন করার কোন অবস্থা ছিল না। আমি হুজুগে সম্মেলন নিউইয়র্কে নিয়ে আসি। ফোবানা কমিটির সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ২০০০ সালের সম্মেলনের দায়িত্ব পায়। আমি তখন বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার নির্বাহী সদস্য। লক্ষ্যণীয়, প্রবাস জীবনের শুরু থেকে আমি বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা নামক একমাত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম এবং একমাত্র ঐতিহ্যবাহী সংগঠন যা আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং ৯০-এর দিকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই। উল্লেখ্য, প্রবাসে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকাই একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কারণ বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রয়াত রাণী কবীরের অসুস্থতার কারণে ও অনেক কর্মকর্তাদের নিষ্ক্রিয়তার ফলশ্রুতিতে আমাকেই সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেক জায়গায় সক্রিয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। মূলত গোটা বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করতে হয় আমাকে। সম্মেলনের দায়িত্ব পাবার পর একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য সম্মেলন উপহার দেয়ার মানসে আমি শুভাকাঙ্খীদের সাথে শলা-পরামর্শ করি। ইচ্ছা করলে আমি সেই সম্মেলনের কনভেনর হতে পারতাম। কিন্তু আমি সব সময় পদে নয় কাজে বিশ্বাসী ছিলাম। আর তাছাড়া ১৯৯৮ সালের সম্মেলনে নিউইয়র্কবাসীর অনেক বদনাম হয়েছিলো, সেই বদনামকে ঘুচানোর মানসে সুন্দর সম্মেলনের স্বপ্ন দেখতে থাকি। মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ২০০০

www.pathagar.com

সালের সম্মেলনকে সফল করার জন্য আমাদের ছিলো একটি ড্রীম টিম। সেই ড্রীম টীমের ড্রীম যখন আমরা বাস্তবায়নের পথে এগুচ্ছিলাম, ঠিক তখনই জামায়াত সমর্থিত একটি পত্রিকার মাধ্যমে একটি কুচক্রী মহল নিউইয়র্ক থেকে আটলান্টায় না গিয়েই বলতে থাকেন, বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সভাপতি হলেন সেলি মুবদি। তিনি-ই সম্মেলন করবেন। ঐ কুচক্রী মহলের সাথে যোগ দেয় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি ২ নম্বর পত্রিকা। তারা সেলি মুবদিকে পুতুল বানিয়ে সভাপতি হিসেবে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করে কমিউনিটিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং সম্মেলনের নামে গোয়ালঘাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দেয়। সেলি মুবদির মত একজন বয়স্ক শিক্ষিত মানুষ এমন বাজে কাজ করতে পারে এটা আমার ধারণা ছিল না। যে চক্রান্ত তারা শুরু করেছিলো তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। সম্মেলনের নামে তারা কমিউনিটিতে চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাত, আদম ব্যবসার প্রচেষ্টাসহ কমিউনিটির লোকদের বিভ্রান্ত করে নানা অপকর্ম অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছে। তারা অসম্মানজনক কাজ করে প্রবাসীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করছে, সেই সাথে প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। সে যাই হোক ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আমাদের ড্রীম টীম প্রবাসীদের এবং বাংলাদেশের ইমেজ তুলে ধরার লক্ষ্যে রাত দিন কাজ করতে থাকে। সকল সংকীর্ণতাকে বাদ দিয়ে মিথ্যার সাথে আপোষ না করে সত্য প্রতিষ্ঠায় আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকি। সকলের অনুরোধকে উপেক্ষা করে কনভেনরের দায়িত্ব অন্যকে দিয়ে আমি চীফ কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করি। যাতে করে সবার সাথে লিয়াজোঁ রেখে সম্মেলনের কাজ তদারকি করতে পারি এবং কাছাকাছি থেকে দেখি যাতে সম্মেলনে কোন অনৈতিক কাজ না হয়। আমরা পুরো সাত মাস একটি অফিস নিয়ে সম্মেলনকে সফল করার জন্য রাতদিন কাজ করেছি। অনৈতিক বা অন্যের সম্মানে আঘাত হানে এমন কোন কাজ আমরা করিনি। যে কারণে আমি এককভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছি- যার বিরোধিতা কেউ করেননি। আমি এবং আমার ড্রীম টীম চেষ্টা করেছে দেশকে প্রবাসে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। আমার স্বপ্ন ছিলো সম্মেলনকে ব্যবসা হিসেবে দেখার জন্য। সম্মেলন আসলে সাধারণত কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের কাছে হাত পাতেন, যা দেখতে শোভন লাগে না। তার পর সম্মেলন থেকে যদি লাভ হতো উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের কোন ফান্ডে টাকাগুলো দিয়ে দেয়া বা প্রবাসের কোন ভাল কাজে লাগানো।

আমি লক্ষ্য করে দেখিছি, প্রায় প্রতিটি সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের অতিথি করে আনা হতো। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এইসব রাজনীতিবিদ সম্মেলনে এসে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতেন না। কোন পরিবেশে কি কথা

www.pathagar.com

বলতে হয় তা বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ জানেন কিনা সন্দেহ। তারা যেখানেই যান সেখানেই দলীয় বড়ি খাওয়ানোর চেষ্টা করেন সবাইকে। তারা বেমালুম ভুলে যান সবাই তাদের রাজনৈতিক রোগী নন। দলবাজি এবং দলীয় কাদা ছোঁড়াছুড়ির বক্তব্যের কারণে সম্মেলনে দেখা দেয় গন্ডগোল। অন্যদিকে আমরাও যারা প্রবাসে বসবাস করি, তার জানিনা অতিথিদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয়। একজনের সাথে অন্যজনের দ্বিমত হতে পারে, কিন্তু অন্যকে দাওয়াত করে এনে অশ্রদ্ধা করব কেন? যে কারণে আমরা ২০০০ সালের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেই কোন রাজনৈতিক নেতাকে সম্মেলনে আনা হবে না। আনা হবে একমাত্র মূলধারার রাজনীতিবিদদের; লক্ষ্য ছিলো মূলধারার সাথে দেশের প্রকৃত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং নতুন প্রজন্মের একটি সেতুবন্ধ গড়ে তোলা।

বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যারা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মুখ থেকে নানা সময়ই অভিযোগ শোনা যায়, তাদেরকে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয়নি, ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। এই অভিযোগগুলো হরহামেশাই শুনতাম। সে কারণে আমরা প্রতিটি ব্যাপারে সজাগ ছিলাম। যার সাথে যে কথা হয়েছে আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কেউ কোন অভিযোগ আমাদের ব্যাপারে করতে পারেননি ও করেননি। উপরন্তু অতিথিদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আমরা তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করেছিলাম নৌবিহারের মাধ্যমে। ২০০০ সালের সম্মেলনের সময় মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের বিলবোর্ডে বাংলাদেশের নাম মিলিয়ন মিলিয়ন লোক দেখেছেন। বিস্তারিতভাবে নিউজ আসে নিউইয়র্ক টাইমস, নিউজ ডে সহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যা অন্য কোন সম্মেলনের সময় আসেনি।

২০০০ সালের সম্মেলনটি ছিলো সম্পূর্ণরূপে একটি অরাজনৈতিক সম্মেলন। আমার ইচ্ছা ছিলো প্রবাসে দলাদলিমুক্ত, রাজনীতিমুক্ত একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যেখানে থাকবে না কোন মতভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং দলবাজি। সে লক্ষ্যে আমি এবং ঠিকানা কাজ করে যাচ্ছি। অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম করার লক্ষ্য হলো আমরা যারা রাজনীতি করি না বা কারো লেজুড়বৃত্তি করি না প্রবাসে তাদের কোন প্ল্যাটফর্ম নেই, দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের দাঁড়াবার কোন প্ল্যাটফর্ম নেই। তাই আমি চেষ্টা করেছি সব সময় একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার। ঠিকানা সব সময় একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মকে সাপোর্টও করে। অন্যদিকে ঠিকানা ছাড়া এই প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করানোও সম্ভব নয়। প্রবাসে কম্যুনিটির উন্নয়নে অধিকাংশ পত্রিকাগুলোর কোন ভূমিকা নেই সম্মেলনের ব্যাপারে। ঠিকানা সম্মেলনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে, এমনকি টাকা পয়সা দিয়েও। অন্যান্যরা সম্মেলনকে সাহায্য না করে বরং টাকা কামাতে চায় সম্মেলন থেকে।

www.pathagar.com

এটাই ঠিকানা ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য। ঠিকানা প্রভাব খাটিয়ে চাইলে অনেক সুযোগ নিতে পারে। ঠিকানার সাহায্য ছাড়া সম্মেলন করা প্রবাসে সম্ভব নয়। ঠিকানার বিপরীতে যারাই অনুষ্ঠান করেছিলেন তাদের অনুষ্ঠান ফ্লপ করেছে বরাবরই। আর ঠিকানার সাহায্যে যে সব সম্মেলন হয়েছে তাতে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটেছে। ঠিকানা প্রবাসে নিস্বার্থভাবে অনেককেই প্রচুর উপরে তুলেছে। যা দেখা গেছে পরবর্তীকালে ঐ সব উপরে উঠা মানুষগুলো ঠিকানার সাথে বেঈমানী করেছে। এমনকি ঠিকানার মাধ্যমে এই প্রবাসে যাদের আত্মপরিচয়, তাদের মধ্যে দু একজন ছাড়া বাকী সবাই ঠিকানার অগোচরে ঠিকানার গীবত গেতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ঠিকানার সাথে উঠাবসা করে অনেকেই অনেকভাবে লাভবান হয়েছেন। নিজেরা ঠিকানার মাধ্যমে আলোকিত হয়ে পরবর্তীকালে বেঈমানী করেছেন। আবার কয়েকজন দ্বৈত ভূমিকা পালন করে পরবর্তীকালে ধরা পড়েছেন। ঠিকানা থেকে সাংবাদিকতা শিখে ও ঠিকানার প্রোপার্টি চুরি করে প্রবাসে অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ প্রথমেই জেহাদ ঘোষণা করে ঠিকানার বিরুদ্ধে কিভাবে ঠিকানার গতিরোধ করা যায়। ঐ সকল মূর্খ জানে না যে, ঠিকানার জন্ম হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারীর শপথ নিয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। সেই শপথকে মনে রেখে ঠিকানার অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে ঐ সব অসৎ সাংবাদিক নামধারীদের দিনে এনে দিনে খেতে হয়। ঠিকানার অগ্রগতিকে রোধ করার জন্যে ঠিকানার দিন, ঠিকানার পূর্বে ও পরে পত্রিকা বের করে ঠিকানাকে রোধ করা যায়নি ও ভবিষ্যতেও যাবে না। ঠিকানা নিরপেক্ষ নয়, তবে ঠিকানা সবসময় দেশকে তুলে ধরার, প্রবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করার, সত্য ও সুন্দরের পক্ষে। যারা প্রবাসে সাংবাদিকতা করেন, তাদেরকে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়। অন্যদিকে সাংবাদিকদের গড়া সাংবাদিকতাকে বিভিন্ন জনের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন করে থাকেন অসৎ সাংবাদিক নামধারী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। ঐ অসৎ সাংবাদিক নামধারীরা পেশাকে তুলে ধরাতো দূরের কথা, সাংবাদিকতা ও সংবাদ পত্রের আড়ালে দিনরাত অসৎ কাজ করে যাচ্ছে, যা ইতিমধ্যে আস্তে আস্তে বের হতে শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। এইসব মুখোশ পরা লোকদের যত তাড়াতাড়ি কম্যুনিটি চিহ্নিত করতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি কম্যুনিটি লাভবান হবে।

আমাদের সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য, এমন কোন কাজ ছিল না যা কুচক্রী মহল করেনি। নিউইয়র্কে সাংবাদিক নামধারী কিছু সন্ত্রাসী ও সমাজের কিছু দুষ্ট লোক সম্মেলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং একের পর এক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা বোম থ্রেট (লেটার বোম) দেয়ার মত ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটিয়েছিল। আমেরিকান এ্যাম্বাসী ও স্টেট ডিপার্টমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভূয়া চিঠিও

www.pathagar.com

দিয়েছে এবং অতিথি আসতে বাধা দেয়ার চেষ্টাও করেছে। ভাল মানুষের লেবাসে আপাদমস্তক দুষ্ট আবরণে মোড়া ঐ দুষ্ট লোকগুলো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। তাদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমানে আমাদের অতিথিদের আসার সিটগুলো পর্যন্ত ক্যান্সেল করে দেয়। বাংলাদেশ বিমান পুরো টাকা নিয়েও আমাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করে। পরবর্তীতে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর সম্মানিত অতিথিদের স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশি টাকা দিয়ে টিকেট কিনে আমরা অন্য এয়ার লাইন্সে নিয়ে আসি। এভাবে সম্মেলন বানচালকারীদের বিষ দাঁত আস্তে আস্তে খসে পড়ে আমাদের ড্রীম টীমের দৃঢ়তার কাছে এবং মিথ্যার উপর যেহেতু তাদের বসবাস সেহেতু সত্যের কাছে তাদের পরাজয় ছিলো অবধারিত। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে কোন ধরনের চুক্তি সম্পাদন ছাড়াই জাহাজ ঘাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা মাকড়সার জালের মত যে ঠুনকো জাল বসিয়েছিলো সেই জালে মানুষকে আটকাতে পারেনি। অসত্যের, বিভ্রান্তির দেয়ালটি আপনা-আপনি খসে পড়ে। যে কারণে জনগণ কর্তৃক তারা প্রত্যাখ্যাত হয়। সুবিধা হয়নি চাঁদাবাজি। যারা টু পাইস কামানোর মতলবে ছিলেন তাদেরও পকেট ফুটো হয়ে যায়। ফুটো পকেটওয়ালাদের খপ্পরে পড়ে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী বিড়ম্বনা ভোগ করেন। যে কারণে জাহাজঘাট বা গোয়ালঘাট বা গুদারাঘাট যাই বলেন না কেন সেখানে থেকে তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে। অপদস্থ হয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান। জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুষ্ট লোকগুলো কিছুদিন বোরখা পরে থাকেন। অন্যদিকে মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ ও সফল সম্মেলন আমরা উপহার দিতে সক্ষম হই সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। ধাপ্পাবাজদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যারা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি তারা বাস্তবে কি হারালেন তা বোঝানো বড় মুশকিল।

অপরদিকে স্মরণকালের সর্বাত্মক সুন্দর ও সফল সম্মেলনের পাশাপাশি জনগণের তাড়া খেয়ে এস্টোরিয়ার হলে তালা দিয়ে ঐসব কুচক্রিদের পালাতে হয়েছে। জনগণ সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলে তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। ২০০০ সালের সম্মেলনের বিশেষ দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ গেস্টদের লিমোজিন সার্ভিস, হোটেল প্লাজাতে সংবাদ সম্মেলন, মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে সংবাদ সম্মেলন করা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিডি তৈরি ইত্যাদি। মেইন স্ট্রীম থেকে সবচেয়ে বেশি অতিথি আসেন এই সম্মেলনে। বাংলাদেশ ও ভারত থেকে ৩৫ জন সম্পাদক, গায়ক-গায়িকা নিয়ে আসা হয়। এমনকি আমেরিকান এ্যাম্বেসীর একজন কর্মকর্তাকে আনা হয়েছিল সম্মেলন স্বচক্ষে অবলোকন শেষে বাস্তব চিত্র কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরার জন্য। উক্ত সম্মেলন সফল করতে গিয়ে ঠিকানার তহবিল থেকে অনেক অর্থ খরচ করতে হয়েছিল। সম্মেলনের নাম ভাঙ্গিয়ে যেন তারা ফায়দা

www.pathagar.com

লুটতে না পারে তজ্জন্য সম্মেলনের পূর্বেই ঐসব কুচক্রি মহলকে কোর্টে নিয়েও আমরা পরাজিত করেছিলাম।

২০০১ সালের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কানাডার মন্ট্রিয়লে। স্বাগতিক সংগঠন হিসেবে ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মন্ট্রিয়ল। কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মকবুল হোসাইন মুকুল এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন ইকবাল কবির। এই সম্মেলনের সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম। তবে অভিযোগ ছিলো পূর্বের মত অর্থ ও চেয়ার দখলের।

২০০২ সালের ষোড়শ বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডালাসের ডালাস এক্সপো সেন্টারে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস। কনভেনর ছিলেন নূরুল আমিন চৌধুরী ও মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন হাসমত মবিন। এই সম্মেলনে আমি না গেলেও লক্ষ্য করি যে দুষ্ট চক্রটি এতদিন ফোবানা বাংলাদেশ সম্মেলনের বিরোধিতা করেছেন, বাংলাদেশ সম্মেলনের নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদাবাজির চেষ্টা করেছেন, বার বার ফোবানাকে বিভিন্ন সময় মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন, বলা যায় ফোবানা সম্মেলনের সবচেয়ে বড় বিরোধিতাকারী নাটের গুরুকে সম্মেলনের বর্তমান কনভেনর নুরুল আমীন ফোবানার রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে ফোবানা কমিটির নীতিমালাকে উপেক্ষা করে কপটাচারীর মত এলাকার পাশের বাড়ির লোককে মঞ্চে উঠিয়ে পুরস্কৃত করলেন। একজন দায়িত্বশীল লোক যখন এমন কাজ করেন তখন কেমন মনে হয়। কনভেনর নূরুল আমিন বুকে থেকে পিছনে ছুরি মারলেন ফোবানা কমিটির। আর তার মেম্বার সেক্রেটারি বিভিন্ন পত্রিকার বিলগুলো পরিশোধ করেন অনেক তিক্ততার পরে। আমার শুনে লজ্জা লাগলো ঐ পুরস্কৃত নাটের গুরুর সাথে আমাদের ফোবানার অনেক কর্মকর্তাকে একই মঞ্চে পুরস্কার নিতে শুনে। শুধু নুরুল আমিন না, ফোবানার নেপথ্যের অনেক কারিগরি ছিলেন ওই চক্রান্তের পিছনে।

২০০৩ সালের সম্মেলন যাবার কথা ছিল শিকাগো। কিন্তু সামান্য ভুল করার কারণে ফোবানার নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন মোতাবেক সম্মেলন চলে যায় মিশিগান। ২০০৩ সালে সপ্তদশ বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মিশিগানের ডেট্রয়েট অপেরা হাউজে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান। কনভেনর ছিলেন আকিকুল হক শামীম এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন কামরুল হুদা এবং শাফকাত চৌধুরী। এই সম্মেলনের কনভেনর আমাকে অনুরোধ করেন ফোবানার কার্যকরী কমিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্য। কিভাবে সম্মেলনকে সুন্দর ও সফল করা যায়। আমি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা সবাই মিলে চেষ্টাই করছিলাম। স্থানীয়দের মধ্যে বিরোধ মীমাংসারও চেষ্টা করি। নিজের পয়সা খরচ করে কয়েকবার ভ্রমণও করেছিলাম বিরোধ মীমাংসার জন্য। এক সময়

www.pathagar.com

নাজমুল হক হেলালের সাথে বিরোধের একটা সুরাহাও করেছিলাম। কিন্তু কনভেনরের হঠকারিতার কারণে তা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে এই সম্মেলনের কিছু কিছু কর্মকর্তা অন্যের প্ররোচণায় ও বুদ্ধিতে ফোবানা কমিটিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। সম্মেলনের তারিখ যত কাছে আসতে থাকে তাদের আচরণও পরিবর্তন হতে থাকে এবং ফোবানার নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে স্থানীয় কোন কোন কর্মকর্তা খারাপ আচরণও করে। যার জন্য ফোবানার কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে কনভেনর আকিকুল হক শামীমকে প্রকাশ্যে মাফ চাইতে হয়। ঐ সম্মেলনকে নষ্ট করার জন্য নিউইয়র্কের কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী মহল ফিন্যান্স করে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে ২৫০ জনেরও কম লোক সমাগম হয়। মিশিগান সম্মেলন যাওয়ার পর আমাকে অনেকে বললেন, সভাপতি কনভেনর হিসেবে উপযুক্ত নয়। আমি প্রতি উত্তরে বললাম সংগঠনের প্রতিনিধি আপনারা নির্বাচিত করেছেন। আমাদের করার কিছু নেই। তবে আগামীতে আপনারা সমাজে অসৎ, অশিক্ষিত, খোড়া ল্যাংড়া লোকদের নির্বাচিত না করে সমাজের ভাল লোকদের নির্বাচিত করুন। মিশিগানকে সম্মেলন দেয়ার বিশেষ একটি কারণ হল, মিশিগানে যে হারে লোক বসতি শুরু হয়েছে, তা উত্তর আমেরিকার মানুষের কাছে ঐ শহরটি ছিল অপরিচিত- তাকে পরিচয় করার জন্য সম্মেলন দেওয়া হয়েছে।

২০০৪ সালের অষ্টাদশ ফোবানা উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটনের ডালাস এক্সপো সেন্টারে। স্বাগতিক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক। কনভেনর ছিলেন এম আবু সোলায়মান এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন ডাঃ গোলাম এম ফারুকী। কনভেনর আবু এম সোলায়মান কয়েক বছর যাবত চেষ্টা করছেন সম্মেলন নেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি কোনভাবেই কাউকে রাজি করাতে পারছিলেন না। শেষমেষ আমাকে এসে অনুরোধ করেন। আমি তার আগ্রহ দেখে বয়স্ক মানুষ নির্বাহী কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের অনুরোধ করি তাকে সম্মেলন দেয়ার জন্য। সেই অনুযায়ী তিনি সম্মেলন পেয়েও যান। সম্মেলন পাওয়ার পরে তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ নবীকে ম্যানেজ করে অন্য সবাইকে ইগনোর করতে শুরু করেন এবং ফোবানার নিয়মনীতি বহির্ভূত কাজ শুরু করেন। এমনকি উক্ত সমিতির সাবেক সভাপতি ডঃ জাফরুল সম্পর্কে ভীষণ খারাপ কথা বলতে শুরু করেন। অন্যদিকে তার মনে রাখা উচিত ছিল ডঃ জাফরুল হল ফোবানার নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ, তিনি যদি না চাইতেন তাহলে আবু সুলেমান কোনভাবেই ফোবানা নিতে পারতেন না। বরং ডঃ জাফরুল অনেককেই বলেছেন যাতে ওয়াশিংটনে ফোবানা দেওয়া হয়। আবু সুলেমান তার সম্পর্কেও কটুক্তি করেছেন।

www.pathagar.com

আবু সুলেমানের মন কত ছোট তার একটি ঘটনা তুলে ধরলে তার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিষ্কার হবে। নিউইয়র্কে আসেন একবার প্রেস কনফারেন্স করার জন্য। এস্টোরিয়ার বনফুল রেস্টুরেন্টে আমন্ত্রণ জানানো হল সকল ফোবানার কর্মকর্তাদের ও নিউইয়র্কের সাংবাদিকদের। তিনি হঠাৎ করে পাক ঘরে ঢুকে বাবুর্চীকে বললেন, আমি সাংবাদিকদের টাকা দিব বাকীদের কাছ থেকে আপনারা টাকা নিয়ে নিবেন। হঠাৎ ফোবানার একজন কর্মকর্তা এটা শুনে জিজ্ঞাসা করলে পরবর্তীতে তিনি লজ্জা পান। ফোবানা কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা বিষয়টি জানার পর তীব্র প্রতিবাদ করলে সবার কাছে প্রকাশ্যে মাফ চান ও খাওয়ার টাকা পুরোটাই পরিশোধ করেন। ব্যাপারটি ছিল এ রকম- সবাই ছিলেন তার আমন্ত্রিত অতিথি। যদি খাওয়ার বিলের হিসাব আমি করি তাহলে দেখা যাবে আমার পকেট থেকে বিভিন্ন সময় একটি সম্মেলন করার টাকা চলে গেছে খাওয়া বাবত। কোনদিন হিসাব করার প্রয়োজন মনে করিনি। ছোট মানসিকতার লোক দিয়ে বড় কাজ কখনো সম্পন্ন হয় না। অন্যদিকে ফোবানা পাওয়ার পর তখন আর তিনি কাউকে চিনেন না। সম্মেলনের যে নীতি ও আদর্শ আছে সেই নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করেই নিজের স্টাইলে তিনি সম্মেলন করলেন। তার আত্মীয়-স্বজনকে স্টল দিয়ে ব্যবসা করলেন, কমিটিতে তার খয়ের খাঁদের ঢুকালেন এবং যারা বিরোধিতা করেছিলেন ফোবানার তাদের সঙ্গে আঁতাত করলেন ও ফোবানার স্বার্থ বিরোধী অনেক কাজ করলেন। ফোবানা বাংলাদেশ সম্মেলনের আগের রাতে কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো তার সাথে একমত পোষণ করে ফোবানার কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ নবীকে রাতের মধ্যে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে সবার সাথে বিদ্রোহ করলেন এবং রাতের সিদ্ধান্ত মানতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। চেয়ারম্যান চেয়ারের লোভে কমিটির অন্য সবার কথা ভুলে গেলেন। যে কারণে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হলেন। এদের মধ্যে আরেকজন হলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মীর চৌধুরী। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কথা– যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর গোপনে আবু সোলায়মানকে (ফুফা শ্বশুরকে) অবহিত করতে থাকেন। উপরে ভাব দেখাতে থাকেন তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পক্ষে। এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল অন্য রাজনীতি। ইতিমধ্যে ডঃ নবী কনভেনরের যোগসাজসে ফোবানা কমিটি নিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। এবারে চেয়ারম্যান হতে পারবেন না সুবাদে চেয়ারম্যান ডঃ নূরুন্নবী অনৈতিকভাবে অপরপক্ষ কনভনরের যোগসাজসে মিথ্যা-অস্তিত্ববিহীন নামসর্বস্ব সংগঠন সমানে রেজিষ্ট্রেশন করতে থাকেন, যা নিয়মমত মিটিংয়ে আগে জানানো হয়নি, মিটিংয়ে বসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব কিছু গোপন রাখা হয়। যা সচরাচর পূর্বেই জানানো উচিত ছিল। জানা গেছে তাদের নীল নক্সা

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন করার জন্যই তারা ফোবানা কমিটিকে তা পূর্বে জানাননি। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল আর সেটি হলো ২০০৩ সালে আমাকে মিশিগানে চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব এসেছিলো এবং আমি চেয়ারম্যানও হতে পারতাম। কিন্তু ডঃ নূরু নবীর অনুরোধের কারণে আমি তাকে পদটি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাকে যখন চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব আসে তখন ডঃ নবী আমার কাছে এসে আমাকে অনুরোধ করেন- রব সাহেব আমি আরেক বার চেয়ারম্যান হিসেবে থাকতে চাই- আপনি যদি সেক্রিফাইস করেন তাহলে আমি আবার চেয়ারম্যান হতে পারি। আমার যে চেয়ারম্যান হবার ইচ্ছা ছিলো না তা কিন্তু নয়। তারপরও ডঃ নূর নবীকে আমি চেয়ারম্যানের পদটি ২০০৩ সালে ছেড়ে দেই তার অনুরোধে। সেই হিসেবে ২০০৪ সালে সবার অনুরোধে আমি চেয়ারম্যান হবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। অকৃতজ্ঞ কনভেনর ও চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে গোপনে একজন প্রার্থীকে হঠাৎ করে দাঁড় করানো হলো। ভালো কথা। যদিও নির্বাচন হবার কথা ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকবার ওপেন ব্যালটে ভোট হলেও তখন ভোট করা হয় গোপন ব্যালটে। প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রত্যেক সংগঠন থেকে ২ জন করে নির্বাচিত করা হয় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সেই মোতাবেক ডালাস সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন আবদুল মতিন ও জনাব মোবিন করলেও নির্বাচনে দাঁড় করানো হয় সাইড লাইনে বসে থাকা নূরুল আমিন চৌধুরীকে; যা খুবই অনৈতিক। আমার বিরুদ্ধে ডঃ নূর নবীসহ অন্যান্যরা যে ষড়যন্ত্র করছিলেন তার প্রমাণ মিলে নির্বাচনের ভোট চলাকালীন সময়। একটি সংগঠনের দু জন প্রতিনিধির ভোট দেবার অধিকার থাকলেও ডঃ নূরু নবী দুই এর অধিক ব্যালট পেপার বার বার দিয়েছেন ভোট চুরি করার উদ্দেশ্যে যা ধরা পড়েছে একাধিকবার তিনি নিজে ভোট দানে বিরত থেকে সাধু সাজবার চেষ্টা করেছেন। সম্মেলনের দিন মিথ্যা সংগঠন রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে ভোট দিয়েছেন। এই নির্বাচনের সময় ফোবানার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবকে পাশে বসিয়ে রাখা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে কিছু বলতে দেয়া হয়নি। আবার অন্যদিকে অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যে, লোকটি অনেক কথা বলেন তখন তিনি নীরব ছিলেন কেন তাকে কি ম্যানেজ করা হয়েছে? ফোবানা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রশ্ন- এর পেছনেও কোন রহস্য আছে কি-না। সেই সম্মেলনে ষড়যন্ত্র করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তাদের ঐসব অনৈতিক কাজগুলো দেখে আমি নিজেই চেয়ারম্যান হবো কি বরং লজ্জা পেয়েছি যেখানে তাদের লজ্জা পাওয়ার কথা। সামান্য চেয়ারের জন্য নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধকে পদদলিত করে সমাজে তথাকথিত নেতা হিসাবে দাবিদার পরিচিত মানুষগুলো কি রকম জঘন্য খেলায় মেতে থাকেন তা জীবনে প্রথমবারের মত দেখার সুযোগ হয়। পরবর্তীকালে ড. নূর নবী বিভিন্ন জায়গায় কথা বলতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন আমার সাথে- আমি বলেছি আপনাদের মত সুবিধেবাদীদের সাথে আমার কোন কথা নেই। ড. নবীকে বন্ধু-বান্ধবরা বিভিন্ন জায়গায় অতিথি করে পাঠাতাম। এমনকি নিজেরা টাকা-পয়সা খরচ করে তার বিবাহ বার্ষিকীও পালন করেছি। যারা অক্লান্ত পরিশ্রম, আর্থিক ও মানসিক ত্যাগের বিনিময়ে ফোবানাকে বর্তমানের স্তরে উপনীত করেছেন অনৈতিকভাবে ওয়াশিংটনে ফোবানা কমিটিতে ফোবানার সাথে সম্পর্কবিহীন অবৈধ সংগঠনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভোটের ব্যবধানে তাদেরকে হারিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ফোবানার বিজনেস যারা জানেন না-বুঝেন না অর্থাৎ নবীন (মূর্খ) তাদেরকে কমিটিতে ঢুকানো হয়। ফোবানাতে যারা শ্রম দিয়েছেন ১০/১৫ বছর তাদেরকে বিদায় নিতে হল অসম্মানজকভাবে। ঐসব বিদায়ী সদস্যরা ফোবানাকে পাহারা দিতেন যাতে করে অন্যরা আদম আমদানী, চেয়ার দখল, পয়সা মারাসহ অন্যান্য অনৈতিক কাজ করতে না পারেন। ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ নবী মনে করতেন তিন চারশত টাকা খরচ করলে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হয়ে সম্মান পাওয়া যায়। আসলে সম্মান পাওয়ার জন্য টাকা খরচ করতে হয় না। টাকা দিয়ে চেয়ারে বসা যায়, ডিগ্রী কিনা যায় কিন্তু সম্মান পাওয়া যায় না, সম্মান অর্জন করতে হয় যোগ্যতা দিয়ে।

১৯৮৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত যে সব ফোবানা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে আমার জানা মত ১৯৯৯ জর্জিয়া ও ২০০০ সালে নিউইয়র্ক সম্মেলন ছিল সবচেয়ে স্বচ্ছ, বাকী সম্মেলনগুলো সম্পর্কে কম্যুনিটিতে কিছু কিছু কথা রয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে সম্মেলন কেমন হবে জানি না। তবে ভাল হবার সম্ভাবনা কম। আমরা আগামীতে ঐক্যের পরিবর্তে আরো বিভক্ত হব। আমরা যদি ফোবানার গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করতে না পারি, তাহলে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কাই বেশি। কমিটিতে দূরদর্শী লোকের অভাবে অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। সংগঠনের স্বার্থের চাইতে নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবণতা বেশি। সম্মেলনের পাশে বর্তমান চেয়ারম্যান নূরুল আমিনের পুরস্কৃত, সমাজের নাটের গুরুর স্থানীয় শিষ্য দিয়ে পাশে কাঙালি ভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। জনাব নূরুল আমিন ঐসব কলম সন্ত্রাসীদের পুরস্কৃত করলে ঐ কাঙালি ভোজে যেতে অসুবিধা থাকার কথা নয়। যদি ঐ রকম একটি ঘটনার সূত্রপাত হয় ফ্লোরিডায় তখন বুঝা যাবে নূরুল আমিন গংদের কেমন লাগে এবং পরবর্তীতে শুনেছি অন্যরা বাঙালি ভোজের আয়োজন করেছে।

সাঈদ-উর রবকে ফোবানার চেয়ারম্যান করলে ফোবানা আলোকিত হতো। ফোবানার চেয়ারম্যান হয়ে সাঈদ-উর রবের আলোকিত হবার কিছু নেই।

www.pathagar.com

বহুদিন আগে ডঃ নবীর এক বন্ধু আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন তাকে তোমরা চিন না। ডঃ নবী হলেন এমন এক চীজ তাকে যে পাত্রে রাখা যায় স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে তা তিনি নষ্ট করে দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং সাধু সাবধান। ফোবানা দীর্ঘজীবী হোক। ■

www.pathagar.com

ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সমস্যা কি মোড়লদের দাবার গুটি

মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চিকন একটি আলো আবার দেখা দিয়েছে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যান্ডের এনাপোলিসে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনাকে কেন্দ্র করে। আরব বিশ্বের অনেক দেশসহ বিশ্বের ৪৯টি দেশের প্রতিনিধি ঐ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্যালেস্টাইনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ ওলমার্ট একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন। পর্যায়ক্রমে উভয় দেশের মধ্যে শান্তির জন্য আলোচনা চলতে থাকবে। আমরাও আশা করছি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নতুন সূর্যোদয় ঘটবে যে সূর্য সারা বিশ্বেই শান্তির আলো ছড়াবে। তবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করার

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সংঘাত নিয়ে একটু পেছন ফিরে দেখা দরকার যা থেকে অনুধাবন করা সহজ হবে কেন এত দীর্ঘস্থায়ী ইসরাইল-প্যালেস্টাইন হানাহানি, সংঘাত, রক্তপাত, ধ্বংস এবং প্রাণহানী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের উদ্ভাবিত পারমাণবিক বোমার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অত্যাধুনিক অস্ত্রের মালিক তথা সমগ্র বিশ্বে সামরিক শক্তির দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হল। এদিকে জার্মানীর একনায়ক হিটলারের নির্বিচারে ইহুদি হত্যার জের ধরে সারা বিশ্বের তৎকালীন পরাক্রমশালী রাষ্ট্রগুলো ইহুদীদের পুনর্বাসনে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। অবশ্য তাদের এই সক্রিয়তার নেপথ্য কারিগর বা মূল নিয়ামক ছিল গ্রেট ব্রিটেন ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র। অবশেষে সারা বিশ্ব থেকে ইহুদীদের জড়ো করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল প্যালেস্টাইনে। অথচ ইহুদীদের তৎকালীন পরম হিতৈষী ও শুভাকাঙ্খী গ্রেট ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল গোটা বিশ্বের বৃহত্তর অংশ। বিশ্বের অন্য কোথাও ইহুদীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ না নিয়ে প্যালেস্টাইনকে চিহ্নিত করার পেছনে খোঁড়া যুক্তি হিসেবে দোহাই দেয়া হল ধর্ম এবং পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের। বিশ্ব মোড়লদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হল যে পবিত্র জেরুজালেমের উপর ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের রয়েছে সমান অধিকার। এখানে রয়েছে তিন ধর্মের অনুসারীদের প্রাচীন ধর্মীয় উপাসনাগার আল আকসা মসজিদ। এই ঐতিহাসিক মসজিদের সাথে হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত ইছা (আঃ) এবং সবশেষে মুসলমানদের মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত। তাই তিন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকই প্যালেস্টাইন তথা জেরুজালেমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও পুণ্য ভূমি হিসেবে জ্ঞান করেন এবং কেউই এই পবিত্র নগরী কোনক্রমে হাতছাড়া করতে রাজি নন। এতদসত্ত্বেও সরাসরি ইহুদীদের পক্ষ অবলম্বন করেই বিশ্বের পরাশক্তিগুলো প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দা মুসলিম ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে তাদের বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদ করে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র ' ইস্রায়েল' প্রতিষ্ঠা করল । এদিকে বাস্তুহারা প্যালেস্টাইনীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে পড়তে এবং উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হলেও ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক তথা বিশ্বের পরাশক্তিগুলো বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র বাস্তুহারাদের প্রতি ন্যূনতম মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শন কিংবা তাদের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টিদানের প্রয়োজনীয়তা বোধ না করে নব প্রতিষ্ঠিত ইসরাইলকে মধ্যপ্রাচ্যে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করে আধুনিক ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করতে লাগল। ফলশ্রুতিতে কালের অগ্রযাত্রায় মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া নামে কথিত ইসরাইল শুধুমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়নি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বড়

www.pathagar.com

ধরনের হুমকি হয়ে উঠল। অন্যদিকে বাস্তুহারা প্যালেস্টাইনীরা সর্বহারা ও অন্যের অনুকম্পা নির্ভর জীবনের গ্লানি বইতে বইতে এক পর্যায়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠল। তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল যে উদ্বাস্তু, পরাশ্রয়ী ও অন্যের অনুকম্পানির্ভর মানবেতর জীবন যাপনের চেয়ে মাতৃভূমি উদ্ধারে জীবন বিসর্জন করাই শ্রেয়। এতে শুধু শান্তি বিঘনিত হয়নি বরং পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য প্যালেস্টাইনীরা চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু করে। এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই অবশেষে তারা নিজেদের মহান নেতা প্রয়াত ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে বলতে গেলে অনেকটা খালি হাতে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মারণাস্ত্রের মোকাবেলা করতে লাগল। নিছক ইট-পাটকেল আর মনোবল নিয়ে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও মারণাস্ত্র মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত অগণিত স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টাইনীর তাজা রক্তে উষর আরবের মরুভূমি রঞ্জিত হতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ ৬০ বছরে অসংখ্য প্যালেস্টাইনীর তাজা রক্তের স্রোত বয়ে গেছে নিজের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে। আবার স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টাইনীদের চোরাগোপ্তা হামলায় ইহুদীসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণও অকালে ঝরে গেছে বিগত দিনগুলোতে। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাবে বিশ্বমানবতার প্রতিভূ যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো প্যালেস্টাইনীদের হৃত মাতৃভূমির পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং প্যালেস্টাইনীদের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতকে সন্ত্রাসীদের হোতা অভিধায় আখ্যায়িত করে সোচ্চার প্রচারণা চালাতে থাকে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মোড়লীপনায় কান না দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারে অটল সংকল্পবদ্ধ সর্বহারা প্যালেস্টাইনীগণ জীবন বাজি রেখে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ততদিনে মুক্তিকামী প্যালেস্টাইনীরা সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে আত্মঘাতি বোমা হামলার পথ বেছে নেন। ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে লালিত নিরীহ ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণ সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্টে বাস করেও প্রতিনিয়ত জীবন-ঝুঁকির সম্মুখীন হতে ও অহর্নিশ সন্ত্রস্ত জীবন যাপনে বাধ্য হন এবং মাঝে-মধ্যে চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হয়ে অকালে প্রাণ হারাতে থাকেন। অবশেষে অকালে ভবলীলা সাঙ্গ হওয়াদের স্বজন সিংহভাগ ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে প্যালেস্টাইনীদের ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করে কখনও মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেনা এবং তারাও শঙ্কিত জীবন যাপনের রাহুমুক্ত হতে পারবে না। ফলে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর আস্তে আস্তে টনক নড়তে লাগল এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বমোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ইয়াসির আরাফাতকে প্যালেস্টাইনীদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে হোয়াইট হাউজে

www.pathagar.com

আমন্ত্রণ জানান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে। এমন কি একদিন যারা তাকে সন্ত্রাসীদের হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল তাকেই শেষ পর্যন্ত শান্তির দূত হিসেবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করতে বাধ্য হল নোবেল কমিটি। এরপরও ইয়াসির আরাফাত ও স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। মৃত্যুর পূর্বেও বিশ্ব মোড়লদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ইয়াসির আরাফাতকে তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। নানা অজুহাতে প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু শিবিরে হানা দিয়ে অনেক নিরীহ প্যালেস্টাইনীকে হত্যা করা হয়েছিল। এমনকি জীবনের শেষ পর্যায়ে ইয়াসির আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে বলেও বাজারে চাপা গুঞ্জন রয়েছে। যাহোক, এত সব বৈপরীত্য সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্যালেস্টাইনী নেতাদের সাথে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীদের বেশ কয়েক দফা শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্যালেস্টাইন-ইসরাইল শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়াও বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ সকল শান্তি আলোচনার আহ্বায়ক বা পুরোধা ছিলেন সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণই যা থেকে বিশ্ববাসী সুস্পষ্টভাবে ধারণা লাভ করেছেন যে, প্যালেস্টাইন-ইসরাইল তথা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবি-কাঠি মূলত যুক্তরাষ্ট্রেরই মুষ্টিগত। যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে উক্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধানের ভিত্তিতে বিশ্ববাসীকে নানা অশুভ শক্তির অভিশাপ মুক্ত করতে পারে। স্মর্তব্য, জেরুজালেমের কর্তৃত্ব, জেরুজালেমকে ভাগাভাগি করে শাসন করা ইত্যাদি প্রশ্নে অতীতের শান্তি আলোচনাগুলো কখনো পুরোপুরি সাফল্যের মুখ দেখেনি। অতীতের সাফল্য-ব্যর্থতার আলোকে আবারও প্যালেস্টাইনী নেতা মাহমুদ আব্বাস এবং ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্প্রতি শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের এনাপোলিসে বিশ্বের ৪৯টি দেশের প্রতিনিধিদর উপস্থিতিতে। এবারের শান্তি চুক্তির সাফল্যের মুখ দেখতে হলে অবশ্যই কতগুলো জিনিসকে প্রাধান্য দিতে হবে। গাজা এলাকায় হামাসের নেতৃত্বকে অস্বীকার করা হলে, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় ইসরাইল কর্তৃক পশ্চিম উপকূল ও গাজা এলাকার দখলীকৃত ভূখন্ড সাবেক মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করা না হলে যতই জোড়াতালি দেয়া হোক না কেন মধ্যপ্রাচ্যে কস্মিনকালেও শান্তি ফিরে আসবেনা বলে আমাদের বিশ্বাস। আবার প্যালেস্টাইনকে কাগজে কলমে স্বাধীনতা দিয়ে তার আকাশ সীমা রক্ষার দায়িত্ব ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিলে কিংবা ইসরাইল থেকে বহিষ্কৃত বাস্তুহারাদের ইসরাইলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা না হলে কিংবা জেরুজালেমকে বিভক্ত করে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘ বা অন্য কোন বাহিনীর উপর ন্যস্ত করলে মূলত শান্তি আলোচনা বালির বাঁধের মত লোহিত সাগরে মিশে যাবে।

www.pathagar.com

আবার শান্তির নামে গোঁজামিলের চেষ্টা করা হলে এতে অশান্তিই চলে আসতে পারে। কারণ বিগত দিনগুলোতে জাতিসংঘ বিশ্বের নির্যাতিত ও নিগৃহীত রাষ্ট্রগুলোর অধিকার সংরক্ষণের পরিবর্তে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই বেশি ভূমিকা রেখেছে। তাই একদা সতী মায়ের সতী কন্যা অভিধায় ভূষিতা জাতিসংঘের প্রতি বিশ্বের নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আস্থা ও ভক্তি বর্তমানে অনেকটা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে বললে সত্যের তেমন অপলাপ হবেনা। বর্তমানে মনে করা হয় জাতিসঙ্ঘ বড় রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করে যাচ্ছে যা জাতিসঙ্ঘের নিয়ম-রীতির পরিপন্থী। এ সকল বাস্তবতার প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সজাগ দৃষ্টি রেখে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখলে হয়ত বা প্যালেস্টাইন- ইসরাইল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে বিশ্ব মুক্তি পাবে। অন্যথায় সব কিছুই অসার প্রতিপন্ন হবে। এবারে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রএবং মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দের ব্যাপক উৎসাহ এবং অংশগ্রহণ। তাই এক চোখা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যে প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সমস্যার সমাধান হবেনা তা অনেকটা হলফ করেই বলা চলে। এ সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বের পরাশক্তির অধীশ্বর রাষ্ট্রপ্রধানদের সজ্ঞান উপেক্ষা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যাকে জটিল আবর্তের মুখে ঠেলে দিতে এবং সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকীকরণে ইন্ধন যোগাতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাই সামগ্রিক বিচারে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় বিধায় উক্ত আলোচনা কালনেমির লঙ্কাভাগ কি-না তা ভবিতব্যের বিচার্য। প্যালেস্টাইনী রিফ্যুজিদের পুনর্বাসন এবং গাজায় হামাস গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ, ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইনের সীমানা নির্ধারণসহ নিরাপত্তা ও জেরুজালেমের আধিপত্য তথা প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তাকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমেই মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতে পারে। একই সময় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সাথেও ইস্রায়েলের সমস্যার সমাধান করতে হবে। কাউকে রেখে বা বাদ দিয়ে প্রকৃত সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে। এ ধরনের মৌলিক ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে ইতিপূর্বে বহুবার শান্তির জন্যে রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনটিই সফল হয়নি। কে কতটা ছাড় দেবেন এবং সে অনুযায়ী অন্যপক্ষ তা মেনে নেবেন কিনা ইত্যাদিও চিহ্নিত হতে হবে। আলোচনার টেবিলে সকলকে মুক্ত মন নিয়ে ভেতরের সকল কষ্টবোধকে উপস্থাপন করতে হবে। কেননা এ সংকট অনেক পুরনো। তাই এর সাথে জড়িয়ে গেছে বহুবিধ ঘটনা। সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ। এই সিটিকে ঘিরেই বারবার সংঘাতের বিস্তৃতি ঘটেছে। কেননা এ সিটিতে অবস্থিত পবিত্র স্থানগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মুসলমান, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অনুভূতি-আবেগ। ইতিপূর্বেকার শান্তি-

www.pathagar.com

সমঝোতায় অবশ্য জেরুজালেমকে ভবিষ্যত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র এবং ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে মেনে নেয়ার কথা ছিল। এতেও কোন সমাধান ঘটেনি, অধিকন্তু নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে উভয় শিবিরে। ইসরাইলের সুবিধাভোগীদেরকে না সরিয়ে কীভাবে পূর্ব জেরুজালেমকে প্যালেস্টাইনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে-এ প্রশ্নের জবাবও সংশ্লিষ্টরা দিতে পারেননি। এছাড়া জেরুজালেম যদি উভয় রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হয় তাহলে কে কীভাবে সেখানে বিচরণ করবে? এই দুই রাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্রের কূটনীতিকরাই বা কীভাবে সেখানে অবস্থান করবেন-এ প্রশ্নও প্রকট আকার ধারণ করেছিল। জেরুজালেমের থিঙ্কট্যাঙ্ক হিসেবে খ্যাত ট্রুম্যান ইন্সটিটিউটের প্রধান ইয়েটজ্যাক রেইটার বলেছেন, প্যালেস্টাইনীদের দৃষ্টিতে জেরুজালেম হওয়া উচিত সকলের জন্যে অবাধ বিচরণ ভূমি। পক্ষান্তরে ইসরাইলীরা মনে করেন যে, সেখানে কোন সীমানা না থাকায় জেরুজালেম সবসময়ের জন্যেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ১৯৬৭ সালে জেরুজালেমের পূর্বাঞ্চল ইসরাইলীরা জবর-দখলের আগে যেমন একটি ভূখন্ড ছিল, ঠিক তেমনটি অর্থাৎ অখন্ড জেরুজালেম দেখতে চান ইসরাইলী এবং প্যালেস্টাইনীরা। শান্তি প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার সময় আর্থিক ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ এবং ইসরাইল-প্যালেস্টাইন নিয়ে কর্মরত একটি টিমের সমন্বয়ে গঠিত এইক্স গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্যালেস্টাইন রিফ্যুজিদের পুনর্বাসনসহ অন্যান্য খাতে ৫৫ থেকে ৮৫ বিলিয়ন ডলার লাগবে। যে কোন সমঝোতায় এ অর্থের বিকল্প নেই। কিন্তু কোত্থেকে আসবে এ অর্থ সেটিও কেউ বলতে পারছেন না। সমঝোতার ক্ষেত্রে ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইনের সীমান্ত সম্পর্কেও ঐকমত্যের আবশ্যকতা রয়েছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের আগের অবস্থাকে ধরে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন কেউ কেউ। অপরদিকে পশ্চিম তীরের কোন কোন ব্লকে ইসরাইলীদের বসতিকে অক্ষুণ্ন রেখে তার পরিবর্তে প্যালেস্টাইনকে অন্য অংশ ছেড়ে দেয়ার মনোভাব থাকতে হবে সমঝোতার চুক্তিতে। সমঝোতায় ইসরাইলীরা যেমন তাদের স্বার্থকে সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর থাকবে, ঠিক তেমনিভাবে প্যালেস্টাইনীরা নিজেদের ন্যায্য হিস্যা থেকে সরে দাঁড়াবেন না-এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসরাইলীদের ধারণা, নিরাপত্তার ব্যাপারটি মূল বিষয়। এছাড়া প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে কখনোই আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটবে না বলেও মনে করেন ইসরাইলীরা। ২০০৫ সালে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইলীরা সরে যাবার পর সে ভূমিকে প্যালেস্টাইনীরা ইসরাইলে রকেট হামলার জন্যে নিরাপদ আস্তানায় পরিণত করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। তাই সমঝোতা অনুযায়ী এমন কোন স্থান তারা ছাড়তে রাজি নন, যাকে পুনরায়

www.pathagar.com

আক্রমণের অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয়-এমন নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকতে হবে সমঝোতা স্মারকে।

প্রেসিডেন্ট বুশের আহবানে এনাপোলিসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনের শেষদিন ২৮ নভেম্বর ২০০৭ ওয়াশিংটন ডিসিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ইসরাইল প্রজেক্টের অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ ওলমার্টের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা কর্নেল মিরি আইসিন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, একমাত্র দু' স্টেটের ভিত্তিতেই সমস্যার সম্মানজনক সমাধান সম্ভব। তিনি দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের আলোকে উল্লেখ করেন, ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের পূর্বশর্ত হচ্ছে জেরুজালেমের উপর আধিপত্য কে পাবে তা নিরূপণ করা। প্রয়োজনে জেরুজালেমকে দু'টুকরা করতে হবে এবং প্যালেস্টাইন রিফ্যুজিদের পুনর্বাসনে শতাধিক বিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা করতে হবে-এছাড়া কোন ধরনের শান্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে না। একইসাথে সংশ্লিষ্টদের ঐকমত্যে উপনীত হতে হবে যে, ভবিষ্যত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পশ্চিম উপত্যকায় কতটুকু পেলে ইসরাইলীরা সন্তুষ্ট হবে। জেরুজালেমকে বিভক্ত না করেই যদি উভয়ে ঐক্যমতে উপনীত হতে পারে তাহলে জেরুজালেমের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে সে ব্যাপারেও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রাখতে হবে। শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে বৈঠক চলতে থাকবে। সে সময় এসব ব্যাপারকে গুরুত্ব দেয়া জরুরী বলে সংশ্লিষ্টরা মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন প্যালেস্টাইনীরা দেখছেন তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা, পূর্ব জেরুজালেম-যা ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সময় থেকেই ইসরাইল দখল করে রেখেছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় দ্য ইসরাইল প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জেনিফার ল্যাজলো মিজরাহি আরব-ইসরাইল সংঘাতের কারণগুলো তুলে ধরেন। ইসরাইলীরা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ১৯৪৭ সালে। ঐ বছরের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ ভোট দেয় ইসরাইলকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পক্ষে। সে ভোটে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে পৃথক করার সাথে একমত হতে পারেনি আরব রাষ্ট্রগুলো। শুধু তাই নয়, আরব রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবকরা আরব লিবারেশন আর্মি নামে জোটবদ্ধ হয় এবং ইসরাইলের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। এ অবস্থায় ইসরাইলীরা ১৯৪৮ সালের ১৪ মে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সে সময় মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ট্র্যান্সজর্দান এবং ইরাকের গেরিলারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসরাইলের বিরাট একটি ভূখন্ড দখল করে নেয়। তবে সেই দখল বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। অবশেষে ১৯৪৯ সালের জুলাইয়ের মধ্যে গেরিলাদের সাথে ইসরাইলের একটি সমঝোতা হয় যে তারা অস্ত্র ব্যবহার

www.pathagar.com

করবে না। এর আগেই ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার ১% অর্থাৎ ৬৩৭৩ জন মারা যায়। এরপর পুনরায় মারদাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার। থেমে থেমে নানা কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই রয়েছে। ফলে উভয়পক্ষে অসংখ্য মানুষ অকালে মৃত্যুর কোলে ঝরে পড়েছেন। অনেকে হারিয়েছেন বসতবাড়ি। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে মিশর প্যালেস্টাইন ফেদায়ি গেরিলাদের ট্রেনিং দিয়ে ইসরাইল আক্রমণ করতে পাঠায়। এই আক্রমণের ফলে ইসরাইলের অসংখ্য লোক মারা যায় ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সময় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রচুর মালামাল আটকে পড়ে সিনাই পেনিনসুয়েলাতে। সেই জন্য দুই দেশ ইসরাইলকে সুয়েজ খাল দখল করে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল ও সিরিয়ার বর্ডার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ৬ দিনের যুদ্ধ হয়। তখন মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের একশ হাজার সৈন্য ও নয়শত ট্র্যাঙ্ক সিনাই পেনিনসুলোতে পাঠান এবং জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রত্যাহার করে উভয় দেশের মধ্যে নৌ চলাচল বন্ধ করে দেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝে ইসরাইল প্রথমে মিশরকে আক্রমণ করে এবং পরবর্তীতে সিরিয়া ও জর্ডানের আর্মিদের পরাজিত করে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গোলানহাইটস দখল করে নেয়। অন্য দিকে ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলে। এক পর্যায়ে মিশরের আক্রমণের জবাব হিসাবে ইসরাইল হেয়ার আক্রমণ করে। ১৯৭৩ সালে ইয়ামকাপুর যুদ্ধে মিশর ও সিরিয়া পুনরায় ইসরাইলকে আক্রমণ করে। সিনাই গোলানহাইটস এলাকায় উভয়দেশের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইল ভ্রমণ করেন। কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের সাথে শান্তির জন্য আলোচনা হয় দুই দেশের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের পর সেটি ছিল কোন আরব রাষ্ট্র প্রধানের প্রথম ইসরাইল সফর। সে সফরও সফল হয়নি। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাম্প ডেভিডে ১২ দিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছে। সে সময়েও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ইসরাইলের সাথে মিশরের। চুক্তির বিষয়বস্তুতে ২টি শর্ত ছিল। প্রথম শর্তে ছিল গাজা ও পশ্চিম তীরে প্যালেসটাইনীদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা চালু ও অন্যটিতে ছিল ইসরাইল-মিশরের মধ্যে শান্তি চুক্তি যা ইসরাইলের সিনাই থেকে সৈন্য প্রত্যাহার। ১৯৭৯ সালের ২৬ মার্চ পূর্ব চুক্তি মোতাবেক দুই দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়। ইসরাইল ১৯৬৭ সালে যুদ্ধের পূর্বে তারা অবস্থান নিবে এবং সৈন্য ও ক্যান্টনমেন্ট প্রত্যাহার করবে। অন্যদিকে আরব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা মিশর-ইসরাইলের সাথে একা চুক্তি করাকে ভালভাবে নেয়নি। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ সালে আরব সন্ত্রাসীরা প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে। এ হত্যাকান্ডের পর চুক্তির কাজ আর অগ্রসর হয়নি। ১৯৮২ সালে প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের মধ্যে লেবানন নিয়ে হালকা যুদ্ধ হয়। সিরিয়ান সৈন্যরা লেবাননের পক্ষাবলম্বন করে। এরপর ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৪ সালেও সংলাপ হয়েছে শান্তির লক্ষ্যে। ১৯৮৯ সালের ১৪ মে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক সামির ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক রবিন শান্তির পক্ষে কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। যার মধ্যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্যালেস্টাইনের নির্বাচন ও নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশ শাসন করে স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯১ সালের অক্টোবর ৩০ থেকে নভেম্বর ১ তারিখের মধ্যে স্পেনের মাদ্রিদে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ইসরাইলের সাথে জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে আলোচনা হয়। এতে ইসরাইল প্রথমে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে পরে সবার সাথে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনার কিছুটা অগ্রগতি হয়। মাদ্রিদ শান্তি চুক্তির ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর অসলোতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রবিন ও প্যালেস্টাইনী লীডার ইয়াসির আরাফাত একে অন্যের সাথে হাত মিলান এবং উভয়য়ের মধ্যে চুক্তি হয় ইসরাইল প্যালেস্টাইনকে ও প্যালেস্টাইন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিবে। অন্যদিকে ১৯৯৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মাদ্রিদ শান্তি চুক্তির আলোকে ইসরাইল জর্ডানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রকাশ্য বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন জর্দানের বাদশা হুসেন এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রবিন। সে সময় শান্তির লক্ষ্যে তারা বেশ এগিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা যুদ্ধ হতে বিরত থাকার সংকল্পও ব্যক্ত করেন। এরপর ওসলোতে ১৯৯৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা নিয়ে সম্পাদিত এ চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইলীরা কীভাবে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা থেকে সরে যাবে সেটিও উল্লেখ করা হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে প্যালেস্টাইনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের সাথে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামীন নেতানিয়াহুর একটি চুক্তি হয় হেবরুন থেকে ইসরাইলী সৈন্য সরে আসার ব্যাপারে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরেকটি বৈঠক হয়। সেখানে ওসলো চুক্তির বাস্তবায়ন না হওয়ার নেপথ্য প্রসঙ্গ স্থান পায়। সে বৈঠকে অংশ নেন ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বরাক। সে বৈঠকে এ দু'নেতা দৃঢ়মত পোষণ করেন যে ২০০০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। এ সময়সীমার মধ্যেই ইয়াসির আরাফাত এবং শারম্ এল শেখ ২০০০ সালের ১১ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের মধ্যস্থতায় ক্যাম্প ডেভিডে আরেকটি বৈঠকে মিলিত হন। সে বৈঠকে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইলের সমস্ত

www.pathagar.com

সৈন্য সরিয়ে নেয়ার কথা হয়। এছাড়া পশ্চিম তীর থেকেও ৯৫% ইসরাইলী সৈন্য সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে দু'নেতা ঐকমত্যে উপনীত হন। যদিও শেষ পর্যন্ত কোন চুক্তিনামা ছাড়াই বৈঠকটি শেষ হয় এবং বিল ক্লিন্টনের শান্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু তবুও একেবারে নিভে যায়নি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া। হোয়াইট হাউজের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটলেও ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সংকট নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাথাব্যথা কমেনি। ২০০২ সালের মার্চে বৈরুতে সমবেত আরব রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেন ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সংঘাত অবসানের। ঐ বছরের ২৪ জুন প্রেসিডেন্ট বুশও তাঁর ভাষণে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি নতুন মহাপরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। বুশের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যস্থতায় প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন মাহমুদ আব্বাস। এভাবেই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে অনেকের মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটায়। নানা কারণে বুশের শাসনামলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ে। বিশেষ করে মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ মুসলিম বিশ্বকে সজোরে নাড়া দেয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান ছদ্মাবরণে বিশ্বের অতি প্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ইরাককে ধ্বংস করেছে বরং পৃথিবীতে মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে আরো দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে স্বদেশে সাধারণ মানুষের দারিদ্র এবং দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। বড় দেশগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছোট দেশের তুলনায় অনেক বেশি। বুশ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর বরাবরই ইসরাইলের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কংগ্রেস, সিনেট ও প্রশাসনে অনেকেই আছেন যারা ইসরাইলের প্রতি খুবই দুর্বল ও অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেশে বিদেশে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছেন। বড় দেশ হিসেবে পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় রাখা ও শান্তির বাণী শুনানোর পরিবর্তে যুদ্ধে বিশ্বাসীদের আনাগোনা বেশি ছিল বুশের চারদিকে। বুশের সাথে নানা বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কারণে প্রথম টার্মের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল কলিন পাওয়েল স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে ডক্টর কন্ডোলিসা রাইস দায়িত্ব নেন। ডঃ রাইস চার বছরের শেষে এসে বাস্তব সমস্যা অনুধান করতে পেরে প্রেসিডেন্ট বুশকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এতে বুশ কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। ইতোমধ্যে ডঃ রাইস মধ্যপ্রাচ্যে অনেকবারই যাওয়া আসা করেন এবং নেতৃবৃন্দের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা করেন। তার প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও সার্থক হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতি পৃথিবীর অনেক দেশ ও মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। বিদায়ের পূর্বে

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট বুশ সত্যিকার অর্থে মধপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান চাইলে তাকে অবশ্যই একচোখা পররাষ্ট্র নীতি বর্জন করে উভয় দেশের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন পূর্বক মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধান করতে হবে। তাতে বর্তমান বিশ্বের সমস্যার কিছুটা সমাধান হলেও হতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বে প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে; অন্যথায় নয়। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বোঝা অনেক কঠিন বিশেষত বুশগংদের ২০০৪ সালের জুন মাসে শ্যারন ও আব্বাস বৈঠকে মিলিত হন জর্দানে। শ্যারন অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন প্যালেস্টাইন থেকে ইসরাইলী সৈন্যদের সরিয়ে নেয়ার। আব্বাসও ঘোষণা করেন যে, ইসরাইলীদের উপর হামলা কিংবা তাদের ব্যাপারে ঘৃণার মনোভাব প্যালেস্টাইনীদের মধ্যে আর থাকবে না। কিন্তু অভিযোগ করা হয় যে, শান্তির প্রত্যাশা ধুলিসাত হয়ে যায় ঐ বছরেরই আগস্টে। আর এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় প্যালেস্টাইনীদের জেরুজালেমে আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে। এ বছরের ১৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্যারন আরেকটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ইসরাইলী মন্ত্রীসভা সে পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়। গাজা এবং পশ্চিম তীরে বসবাসকারী ইসরাইলীদের সরিয়ে নেয়ার সংকল্প ব্যক্ত করা হয় নতুন এ পরিকল্পনায়। ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে শ্যারন সাক্ষাৎ করেন প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট আব্বাস, মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক এবং জর্দানের বাদশা আব্দুল্লাহ্‌র সাথে। আব্বাস এবং শ্যারন অঙ্গিকার করেন যুদ্ধ বিরতির। ঐ বছরেরই আগস্টের ১৫ থেকে ২৩ তারিখের মধ্যে ইসরাইলী সৈন্যরা পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা থেকে তাদের সকল নাগরিককে সরিয়ে নেয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় এ ঘটনাটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলে ইসরাইলীরা দাবি করেছিল। কিন্তু ইরান সমর্থিত হিযবুল্লাহ্ গ্রুপ ইসরাইলে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনার ফলে সে উদ্যোগও মাঠে মারা যায় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। হিজবুল্লাহ গ্রুপের আকস্মিক হামলায় ইসরাইলীরা পরাজিত হয় এবং তাদেরকে ভাবিয়ে তোলে নতুন ভাবে চিন্তা করার। এরপর এ বছরের ১ এপ্রিল ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ ওলমার্ট পুনরায় আরব শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন দিয়েছেন। রিয়াদে ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত আরব লীগের সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে ইহুদ ওলমার্ট স্বাগত জানিয়েছেন। ২৫ জুন ওলমার্ট সাক্ষাৎ করেছেন শ্যার্ম এল-শেইখ, আব্বাস, মোবারক এবং কিং দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ্‌র সাথে।

এভাবে প্রতি বছরই নানা উদ্যোগ নেয়া হয় মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানে। উভয় দেশের মধ্যে যদি আলোচনা হতো তাহলে হয়তো সমস্যারও একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারতো। শান্তির সমঝোতা কিছুটা এগুলেও অন্যদিকে অনেকটা পিছিয়ে যায়। কিন্তু কোনটিই সফলতার মুখ দেখেনি। শান্তির জন্যে যারা কাজ করছেন তারা আবার সচেষ্ট হয়েছেন-এটাই সুখের ব্যাপার। সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবে

www.pathagar.com

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি বলেন, অস্ত্র দিয়ে জোর খাটিয়ে বা ভীতি প্রদর্শন করে নয়, আলোচনা এবং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ইসরাইল-প্যালেস্টাইন দুই রাষ্ট্রের ভিত্তিতে স্থায়ী মধ্যপ্রাচ্য সংকটের অবসান ঘটাতে হবে। তাহলেই স্থায়ীভাবে সমস্ত সংকট কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে।

মোড়ল রাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসার জন্যে বর্তমান বিশ্বের দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে যারা নিজেদের দাবি করছেন তাদের মনে যদি শুভবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত না হয় তাহলে ইসরাইল-প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে নিকট ভবিষ্যতে দুই দেশের আরো অসংখ্য নিরীহ মানুষকে বলি হতে হবে যা শান্তিকামী মানুষদের কোনক্রমেই কাম্য নয়।

সভ্য দাবীদার মোড়লরা নিজেদের দেশকে নতুনভাবে সাজিয়েছে অন্যদেশে যুদ্ধ বাধিয়ে । অন্যদিকে ৬০ বছরের পৃথিবী অনেক আধুনিক হয়েছে। নিজেরা যুদ্ধ করে একে অন্যকে মেরেছে। ধ্বংস হয়েছে প্রচুর সম্পত্তির। তার জন্য হিংসা বিদ্বেষ পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে আলোচনা করে প্রচুর সময় ও অর্থ নষ্ট হয়েছে। ঐ এলাকাতে আণবিক অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের অস্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছে। কিছুতেই কিছু কাজ হয়নি। উভয় দেশের প্রতিনিধিরা গোয়ার্তুমি করলে অনন্তকাল যুদ্ধ চলবে। তাই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নতুন করে চিন্তা করার সময় এসেছে। উভয় দেশের প্রতিনিধিরা অন্যের দাবার গুটি না হয়ে নিজেরা নিজেদের সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে সমাধানের পথে পা বাড়াবেন বলে সচেতন মহল মনে করে। ■

www.pathagar.com

শাসক বদলালেও শোষণ বদলায়নি

বাঙালির সহস্র বছরের ইতিহাসে ২৬শে মার্চ সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিবস হিসেবে স্বীকৃত। একাত্তরের ২৫শে মার্চের ভয়াবহ কালো রাতে অতর্কিত আধুনিক সমরাস্ত্র ও মারণাস্ত্র সজ্জিত পাকবাহিনী বাঙালি জাতি এবং বাংলার অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ঘুমন্ত-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব বাঙালি শুরুতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন হয়ে ছুটোছুটি করলেও অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার বজ্রকঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে এরই ধারাবাহিকতায় সাবেক বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাবাহিনীর সদস্য, ইপিআর,

www.pathagar.com

পুলিশ-আনসার, ছাত্র-শিক্ষক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সকল পেশা ও স্তরের বাঙালি জড়ো হয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এরপর পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধারের নিমিত্তে ভারতের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ শেষে জীবন বাজি রেখে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূলত ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ ২৩ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, দীর্ঘকালীন হতাশা, বঞ্চনা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদির চির অবসান এবং বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর বিষ দাঁত ভেঙে দেয়ার মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির অপ্রতিরোধ্য কামনা-বাসনার বহিঃপ্রকাশ। পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভাগরথীর তীরবর্তী পলাশীর আম্রকাননে বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতার কিংবদন্তী নবাব সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয়ের মাধ্যমে বাঙালিরা পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আর সেই জিঞ্জির ও রাহুমুক্তির সংগ্রামে কালের অগ্রযাত্রায় অনেক বীর বাঙালির উষ্ণ রক্তে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলা জননীর সবুজ প্রান্তর বারবার রক্ত বসন পরিধান করেছিল। পরাধীনতার গ্লানিবহ জীবনের ইতি ঘটাতে গিয়ে সময়ের অগ্রযাত্রায় মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা সেন, বীরশ্রেষ্ঠ তিতুমীর, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, পীর দুদু মিয়া, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানীগণ, বাংলা মায়ের অগণিত দামাল ছেলে হাসি-মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। বাঙালির এই আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি মানার আগেই বাঙালিদের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীতে কংগ্রেসের দাবির মুখে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গবঙ্গ আইন আবার রহিত করেছিল। এভাবে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনে বাঙালি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। পরিশেষে আত্মত্যাগী-দেশপ্রেমিক বাঙালির রক্তস্রোতে অবগাহন করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক যে স্বাধীন ভূখণ্ডের অভ্যুদয় ঘটেছিল তা ছিল প্রকারান্তরে বাঙালিকে নতুন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার ভিন্নতর সংস্করণ।

সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল পাকিস্তানী শাসকচক্র। আবহমান বাংলার স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও মূল্যবোধকে চিরতরে নস্যাতের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে তারা বিসমিল্লাতেই বাঙালিদের মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়ার অপকৌশলে মেতে উঠলো। পাকিস্তানের বড় লাট কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ও পরবর্তীতে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সদম্ভে ঘোষণা করলেন- উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে

www.pathagar.com

প্রতিবাদের ঝড় উঠলো মানি না মানি না। জিন্নাহর ঘোষণার রেশ ধরে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও পল্টন ময়দানে এক ভাষণে চড়া গলায় ঘোষণা করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। নাজিমুদ্দিনের এ ঘোষণা বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগের কাজ করে এবং সাথে সাথেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ঢাকার অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিক্ষোভ- সমাবেশ ও ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের খালেক নওয়াজ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে মিছিল বের হয় ও মিছিল শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষে ৪ ফেব্রুয়ারি পুরো ঢাকা শহরে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ঠেকাতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্মঘট পালনের বজ্রকঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। ফলে সংঘর্ষ ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। তার পরের ইতিহাস আলোচনা অনেকাংশে মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প বলার সামিল। মায়ের ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত ও নাম না জানা বঙ্গ জননীর দামাল সন্তানরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে যে বিরল ইতিহাস রচনা করেছিল তা মহাপ্রলয়ের আগ পর্যন্ত বিশ্বের যে কোনো ত্যাগ-তিতীক্ষা ও আত্মাহুতির ইতিহাসকে নিশ্চিতভাবে হার মানিয়ে দেবে। মূলত ৫২-এর মহান আত্মবিসর্জনের রক্তঝরা পথ ধরেই পর্যায়ক্রমে বীর বাঙালি পাকিস্তানের শাসন ও শোসণের বিরুদ্ধে আন্দোলন–সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অনাপোসকামী বাঙালি ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই উন্মাদনা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে হামিদুল হক শিক্ষা কমিশন বাতিল, ৬৬-এর ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন ও ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। মূলত উন্নয়নের নামে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থকরী ফসলের রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় রাজধানী ইসলামাবাদের শ্রীবৃদ্ধি , সামরিক বেসামরিক শীর্ষ পদে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একচ্ছত্র আধিপত্য, দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ-আন্দোলনের মুখে শোচনীয়ভাবে বিদায় নিতে হয়। উন্নয়নের দশক উদযাপনকারী আইয়ুবকে।

আইয়ুব শাহীর অবসানের পর সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের চরম যুগসন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত ৭০-এর এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন বীর বাঙালির অনড় সঙ্কল্পেরই প্রমাণ বহন করে। নির্বাচনোত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যখন পাকিস্তানি শাসকরা টালবাহানা শুরু করে তখন বাঙালিরা তাদের দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পারে। তাই নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গোটা প্রশাসন অচল করে দেয় এবং বিশ্ববাসীর নিকট পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের আসল স্বরূপ তুলে ধরে। এতো কিছুর পরও শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে বাঙালিরা পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলোচনায় অংশ নেয় এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রত্যাশা করে। কিন্তু আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মাধ্যমে যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্নের পর ইয়াহিয়া পাক হানাদার বাহিনীকে ঘুমন্ত-নিরীহ বাঙালি নিধনে লেলিয়ে দিয়ে পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টোসহ ঢাকা ত্যাগ করে। ভুট্টোই মূলত পাকিস্তান ভাঙার নেপথ্যের কারিগর। জল্লাদ ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানি নরপশুরা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণে ঢালাও নরহত্যাসহ সোনার বাংলাকে পুড়ে শ্মশানে পরিণত করতে তৎপরতা চালায়। জলজ্যান্ত মানুষকে গাড়ির পেছনে বেঁধে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালনা, হিন্দু জ্ঞানে আমার নিরীহ বৃদ্ধ প্রতিবেশীকে অযথা গুলি করে পাখির মতো বধ করাসহ পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অসংখ্য ঘটনা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। পাক বাহিনীর সে সকল নৃশংস ও পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা মনে পড়লে আজো এ বর্ণনাতীত ভয়ে আমার শরীর শিউরে উঠে, অজানা শঙ্কায় অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। নিতান্ত সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করতে হয়-নানা চেষ্টার পর বঙ্গবন্ধু অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে বিশেষ প্রস্তুতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে ৭ই মার্চের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে যারা যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর কারাবরণের পর দিশেহারা জাতিকে হঠাৎ কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর জিয়া জীবনবাজি রেখে স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেন তা জাতির জীবনে নতুন দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। তখনই সমগ্র জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাক হানাদারদের অবাধ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারত থেকে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ শেষে গাদা বন্দুক নিয়ে কেচকা মার শুরু করে মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের চোরাগোপ্তা হামলার মুখে এশিয়ার সিংহ হিসেবে খ্যাত পাকিস্তানের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী অল্পদিনেই নাস্তানাবুদ হতে থাকে। নৈতিক মনোবল হারিয়ে তারা বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়। এতেও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে ৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ৯৬ হাজার বর্বর পাক হানাদার বাহিনী বাঙালিকে পাশ কাটিয়ে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এভাবে ৩০ লাখ বাঙালির আত্মাহুতি ও ২ লাখ মা-বোনের

www.pathagar.com

সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে বীর বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে রক্তিম সূর্যখচিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্মর্তব্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সামরিক বাহিনী সরাসরি সহযোগিতা করেছিল। তবে রাজনীতি সচেতন অনেকের বিশ্বাস ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির পরই ভারত পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। তাই ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে পুরাতন প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। যাহোক, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পূর্ব পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি কোনোটাই তৎকালীন নেতাদের ছিল না বলে অনেকের বিশ্বাস। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে তাদের আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও দক্ষতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরও জনগণের প্রতি সহমর্মিতার অভাবে স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায়নি। পারস্পরিক বুদ্ধি-পরামর্শ ও সহযোগিতার স্থলে রাজনীতিকগণ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব না কমিয়ে উত্তরোত্তর ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছি, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি অনুশীলনের পরিবর্তে প্রতিহিংসা ও হত্যার রাজনীতি অনুসরণ করেছেন। দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির স্থলে অন্যায়ভাবে নিজেরা বড় হয়েছি। দেশে ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়েছে। আমরাই ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মের নামে, সংস্কৃতির নামে, সুশীল সমাজের নামে দেশ ও দেশবাসীকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছি। জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে বাঙালি-বাংলাদেশী, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ, সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু ইত্যাদির ধুঁয়া তুলে জাতিকে অনবরত বিভক্ত করে চলছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিদের নিতান্ত একটা ক্ষুদ্রতর অংশ বিরোধিতা করলেও মোট দেশবাসীর সিংহভাগই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তাই দীর্ঘ ৩৭ বছরের ব্যবধানে যারা স্বাধীনতার সপক্ষীয় শক্তি বলে নিজেদের জোরেশোরে প্রচার করতে চায় এর পেছনে তাদের অতীতকে আড়াল করার কোনো হীন উদ্দেশ্য আছে কি-না তা যাচাইয়ের দাবি রাখে। পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি– স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের সততা ও দেশপ্রেমের অভাব এবং অর্থের বেসামাল লোভ স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সুফল জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গতিশীল, দূরদর্শী ও যুগোপযোগী নেতৃত্বের অভাবে এবং কিছুসংখ্যক নেতা-আমলার অবৈধ অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিবর্তে জনগণের দুর্ভোগ তুঙ্গে উঠেছে। হাতে গোনা কয়েকজন রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে অঢেল

www.pathagar.com

অর্থের মালিক বনলেও সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের চাকা অনবরত পশ্চাৎগামী হয়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত প্রান্তিকে, প্রান্তিকরা ভূমিহীন ছিন্নমূল পরিবারের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

এদিকে ক্ষমতার হাত বদলের বেলায় জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের দাবিকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করলেও কার্যত প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এবং নেতাই তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতার নিদর্শন রাখতে পারেননি। আবার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে যারা পরিবর্তনের ঢেউ বইয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তারাও অর্থ-বিত্তের লোভে এবং অন্যায়ের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে অন্যায়কারীর রক্ষাকবচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে জাতীয় জীবনে যাবতীয় দুর্ভোগ ও অনাসৃষ্টি স্থায়ী পালঙ্ক পেতে বসেছে। এই সূচিভেদ্য অন্ধকার ও ঘোর অমানিশার কবল থেকে জাতিকে উদ্ধারের জন্য একজন সৎ, খাঁটি দেশপ্রেমিক, দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উপসংহারে বলতে চাই, স্বাধীন বাংলাদেশে শাসক বদলালেও আমাদের মধ্য থেকে নব্য একটি শোষক দল তৈরি হয়েছে। তারা কারা? তারা তো আমাদেরই একজন। অনেক সময় তাদের কার্যকলাপ কাছ বা দূর থেকে দেখি, কিছু বলি না। অনেক সময় বুঝি কিন্তু প্রকাশ করি না। তাদের কার্যকলাপে মনে মনে ঘৃণা জন্মায়। নিজেকে সংযত রেখে তাদের কাজে লজ্জা পাই- পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝেও না বোঝার ভান করি। আমরা যারা সত্যের কথা বলি, ধর্মের কথা বলি, সাধারণ জনগণকে নীতিবাণী শোনাই, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সমাজে পরিবর্তন এনে দিতে চান বা বলেন- তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি লক্ষ্য করেছি অসহায় জনগণের চাইতে। ব্যক্তি স্বার্থে জনগণ ও দেশকে ঠকাই। এ সব থেকে উত্তরণ করতে হলে একজন আদর্শবান মানুষের বড় প্রয়োজন আজ দেশের জন্য। যারা অতীতেও লোভ সংবরণ করে জাতির জন্য কিছু করে গেছেন তাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, ড. মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, ড. মাহাথিরের মতো আরও অনেকেই। তারা মরে গেলেও নিজেদের কর্মের মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। ■

www.pathagar.com

১/১১ আশীর্বাদ না অভিশাপ

কোন দিকে যাচ্ছে দেশ: উত্তরণে না আরো সংকটে

সত্য কথা বলতে আজকাল দ্বিধা জাগে। এখন সত্য এবং আলোরও শত্রু দেখা যায়। বরং অন্ধকারের চেয়ে বেশিই। তাই অন্ধকার দূর করতে সত্য বলা জরুরী হলে কখনও কখনও দ্বিধায় ভুগি। পাছে লোকে কিছু বলে কি-না। তারপরও কাউকে না কাউকে তো কথাগুলো বলতে হবে।

প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ, দেশটির অস্তিত্ব থাকলেও জনগণ যে ভালো নেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে দেশটি অর্জন করতে গিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ- শিশু-বৃদ্ধকে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, সেই দেশটি আজ এক পাথর চাপা দুঃসময়ের মুখোমুখি, সারা দেহে লেপ্টে রয়েছে ঘোর অন্ধকার। চারদিকে বিষাক্ত

www.pathagar.com

নিশ্বাস। দেশে এখন সত্য বলা পাপ, ভয়ংকর অপরাধ। কিন্তু বিদেশে স্বাধীনভাবে লেখা যায়, বলা যায়- কোনো একটি জায়গা থেকে রাতে টেলিফোন আসে না, কেউ ভয়ও দেখায় না বা অস্ত্রের মুখে রাতে তুলে নিয়ে অত্যাচার করে না। দেশে সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিয়ে কথা বলা বা পাশে দাঁড়ানো মহাবোকামী। সব কিছুর আজ উল্টো যাত্রা। রাজনীতি নির্বাসিত। রাজনীতিবিদ কারান্তরালে। যারা ছিলেন প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক কর্মচারি, প্রজাতন্ত্রের দেখভালের শান্ত্রী- তারা আজ রাষ্ট্রপরিচালনার কর্ণধার। বর্তমানে জনগণের রাষ্ট্রের কোনো মূল্য নেই। রাজনীতিবিদদের বিভ্রান্ত করে, এক পক্ষ বা দলকে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে নিজেদের সামনে আসার পথ যারা তৈরি করেছেন। অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে শাসক হিসেবে তাদের আসার কথা ছিল না কোনোভাবেই। অথচ একাধিকবার সেই দুর্ভাগ্য বাংলাদেশকে বরণ করতে হয়েছে। একশ্রেণীর সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্রের সীমাহীন লোভ ও আকাংখার বেদীমূলে সংবিধান এবং মানুষের মৌলিক অধিকার বারবার বলি হয়েছে। এখন তাদের সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে তথাকথিত সুশীল সমাজ। এর পেছনে রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতা, একগুঁয়েমীপনা, অরাজনৈতিক সুলভ আচরণ, ব্যর্থতা ও লোভ-লালসা কম দায়ী নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই জনগণের সঙ্গে বারবার প্রতারণা করেছেন এবং বারবার যারা তাদের বধ করেছে, জনগণের স্থলে তাদেরকেই কাছে টেনে নিয়েছেন, আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার ফলে রাজনীতিবিদরা যেমন বারবার প্রলোভন ও ধোঁকায় পড়ে নিজেদের জন্য বিপদ ডেকে এনেছেন- তেমনি মানুষের পিঠেও স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের চাবুক পড়েছে। জনগণ ও শাসক, জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে ফারাক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপন্ন-বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষের জনজীবন।

দেশে আজকের যে পরিস্থিতি সেটাও অতীতের সেই রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা, কিছু উচ্চভিলাষী সেনা কর্মকর্তা ও বেসামরিক আমলা, সুশীল টিকিধারী কিছু সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী চক্রেরই অতীত কর্মের পুনরাবৃত্তির যৌগিক ফসল। জনজীবনেও তাই একই রকম প্রতিক্রিয়া- চারদিকে হাহাকার, বাজারে আগুন। মানুষের সংবিধানস্বীকৃত অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। দেশের স্বার্থকে বাদ দিয়ে মিডিয়াগুলো সত্যকে চাপা দিয়ে অসত্যকে বার বার প্রচার করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু কিছু মিডিয়াতে ভালো কাপড়-চোপড় ও আতর মাখিয়ে কিছু লোককে উপস্থাপন করা হয়। অসত্যকে সত্য হিসেবে চালানোর জন্য। মিডিয়া সত্য কথা বলতে ব্যর্থ হলে দেশে গণতন্ত্র কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না। জরুরী অবস্থার নামে গণতন্ত্র, রাজনীতি গৃহবন্দী। কে যে দেশের প্রকৃত শাসক, মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। ১/১১ যে আশার বাণী শুনিয়ে একদল দেশটির শাসন ক্ষমতায় সওয়ার

www.pathagar.com

হয়েছিলেন, তা আজ অপসৃয়মান। বুশের ৯/১১ এর অজুহাতে ইরাক আক্রমণের বিষয়টি যেমন আজ আমেরিকান জনগণসহ বিশ্ববাসীর সামনে পরিষ্কার, তেমনি ১/১১ এর বিষয়টিও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে বসেছে বাংলাদেশের মানুষের সামনে। আজ তাই ১/১১ নিয়ে বিদেশী ও দেশের মানুষের সীমাহীন সন্দেহ, অবিশ্বাস, অনাস্থা।

দেশের পত্র-পত্রিকা এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বড় অংশই এ ব্যাপারে চুপ। তাদের মুখে স্বার্থের ঠুলি নাকি রিম্যান্ডের ভীতি জানি না, তবে একবার আমি আমার সীমিত জ্ঞানে কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম দেশের পত্র-পত্রিকায়। তাতে সহযোগিতা মেলেনি। অন্যদিকে ওরা আমাকে চিনেও না, কারণ দেশ ছেড়েছি বহু আগে। আমার লেখা যতোই ভালো বা মন্দ হউক এতে কিছু আসে যায় না। কারণ পত্রিকাগুলোর নিজস্ব কিছু সীলমারা লেখক রয়েছে। যারা অন্তত সুনিপুণভাবে সত্যকে পাশ কাটিয়ে নিজের মতো বিষয়গুলোর উপস্থাপন করে। অন্যদিকে ওরা জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কোনো দলের লোক? কার পক্ষে লিখেছেন? আমার পক্ষে হলে তাড়াতাড়ি দেন, না হয় অন্যদিকে যান; কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আমি ত কোনো দলের ওকালতি করতে যাইনি। অন্যদিকে, যে দু-একজন লেখাটি দয়া করে ছাপিয়েছেন তারাও নিজের প্রয়োজনের অংশটুকু রেখে বাকীটুকুতে ইচ্ছে মতো কাঁচি চালিয়েছেন। যাক পেছনের কথা না বলে আসল কথায় আসি। আমি যা বিশ্বাস করি, তাই বলার চেষ্টা করি। সত্য কথা বললে জানি, অনেক বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এমন কি শুভাকাংঙ্খীরাও ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। লেখাটি কার পক্ষে যাবে না যাবে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো সত্যকে তুলে ধরা। ছোট বেলা শিক্ষকবৃন্দের মূল্যবান উক্তি ছিল- সর্বদা সদা সত্য কথা বলিবে। সেই কথাগুলো স্মরণ করেই আমি কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলার তাড়না বোধ করছি। সত্য কথা বলতে গেলে যদি চিন্তা করি কার লাভ বা কার ক্ষতি হবে, তাহলে প্রকৃত পক্ষে আসল সত্য বলা যাবে না। আজ দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে, নতুনভাবে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলাম। কাউকেই শত্রুজ্ঞান করা বা প্রতিপক্ষ ভাবা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। মূলত সহজাত বশংবদ প্রবৃত্তি বশে আমরা ভিনদেশীদের মুখনিঃসৃত বাণীকে কিংবা ভিন দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপানো বার্তাকে উদ্বাহু বাড়িয়ে বেদবাক্য জ্ঞানে গ্রহণে উন্মুখ। অথচ নিজেদের কারও অমূল্য বাণীকে আমলে নিতে আমাদের চরম অনীহা। প্রকৃত দেশপ্রেমের অভাবে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও আমাদের বিন্দুমাত্র বাধে না। আবার আত্মসমালোচনার পরিবর্তে পরচর্চায় আমরা সিদ্ধহস্ত। তদুপরি নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে আমরা অন্যকে হেদায়েত করতে গিয়ে শৃঙ্খলাবোধ পদদলিত করে সর্বক্ষেত্রে দেশের

www.pathagar.com

বারোটা বাজাচ্ছি।

দেশের প্রকৃত মালিক জনগণ কিনা, দেশ পরিচালনার প্রকৃত শক্তি রাজনীতিবিদরা কিনা, জাতীয় সংসদ জনগণের সমস্যা সমাধানের স্থান কি-না, বন্দুক দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করা ঠিক কি-না। প্রশ্নের একটি মীমাংসা হওয়ার তাগিদ থেকেই এতো কথা বলা। আজ আবারও মুক্তিযুদ্ধের নামে জাতিকে বিভক্ত করে যারা ফায়দা লুটতে চাচ্ছেন, যারা বিদেশী শক্তির ইশারা ইংগিতে কখনো পর্দার অন্তরালে থেকে, কখনো সামনে এসে গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করছে, জাতির উন্নয়নে স্থবিরতা এনে দিয়েছে। দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে এসে সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুনভাবে লেখার চেষ্টা চলছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছে, মুক্তিযুদ্ধের নিঃসঙ্গ সারথি তাজউদ্দিন আহমদকে পর্দার অন্তরালে ঠেলে দিয়ে, সে সবের পরিণতি কী হয়েছে এবং এবারও কী হতে পারে তার আগাম সতর্কতাই এ লেখার পেছনে উদ্দেশ্য।

সুজলা -সুফলা- শস্য-শ্যামলা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। প্রকৃতির রূপসী কন্যা অভিধায় আখ্যায়িত বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার ও আসাম প্রদেশ; পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরা, আসাম ও বার্মা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার। ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান এবং এক সময়ের বিশ্বের শস্যভান্ডার হওয়ার সুবাদে বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি বহির্বিশ্বের লুটেরার দৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে যুগে যুগে। স্মরণাতীত কাল থেকে আবহমান বাংলার রূপৈশ্বর্য ও সম্পদের মোহনীয় হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে আর্য, অনার্য, আরব- অনারব, মগ, ঠগ, বর্গী, মোঘল, ব্রিটিশ নির্বিশেষে অগণিত হানাদার কখনো শাসকের বেশে, কখনো বন্ধুর বেশে, কখনো ব্যবসায়ীর বেশে, আবার সময় সময় লুটেরার রুদ্র মূর্তি নিয়ে বার বার বাংলাদেশে হানা দিয়েছে এবং যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে বাংলাকে নিঃস্ব করার চেষ্টা করেছে।

প্রকৃতির রুদ্র-রুক্ষ ভয়াল মূর্তি ও প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসযজ্ঞকে উপেক্ষা এবং বহিঃশত্রুদের আঘাতকে প্রত্যাঘাতে ফিরিয়ে দিয়ে বঙ্গমায়ের সন্তানেরা নিজেদের বিধ্বস্ত মাতৃভূমির পুনর্গঠনে বার বার কোমর বেঁধে লেগেছে এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে বঙ্গজননীকে আবার অমরাবতী ও তিলোত্তমার তিলক পরিয়ে দিয়েছে। তাই বাংলার প্রতি যেমন প্রকৃতির নির্মমতা ও হানাদারদের পাশবিক হামলার ইয়ত্তা নেই, তেমনি বাংলা মায়ের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধনে এবং বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় দেশবাসীর চরম আত্মত্যাগ ও শৌর্য-বীর্যপূর্ণ কর্মকান্ডের সীমা-পরিসীমাও নেই। বিশ্ববরেণ্য পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং অন্যান্য পরিব্রাজকের বর্ণনা থেকে প্রাচীন

www.pathagar.com

বাংলার যে চিত্র পাওয়া যায় তা যুগপৎ অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। প্রাচীন বাংলার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের বর্ণনাকালে ইবনে বতুতা নাকি একে মর্ত্যের স্বর্গপুরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সকালে বীজ বপন করে বিকালে ফল লাভের কাহিনী- বর্তমান বিশ্বে অবিশ্বাস্য হলেও প্রাচীন বঙ্গ জননী তার হৃদয় ভান্ডার উজাড় করে দিয়ে এভাবেই নিজ সন্তানদের সুখৈশ্বর্য নিশ্চিত করেছিল। স্বল্প পরিশ্রমে এত বিপুল পরিমাণ ফসল ঘরে তোলার সুবাদেই প্রাচীন বাংলার সিংহভাগ জনগোষ্ঠী কাব্য-সাহিত্য- সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চায় অধিকাংশ সময় ব্যয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই যুগে যুগে অগণিত কবি, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক সাধক ও সংস্কৃতি সেবকের অবদানে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকাচারের ভান্ডারও শস্য-সম্পদের ভান্ডারের মতো অকল্পনীয় সমৃদ্ধ। পদ্মাবতী মহাকাব্য খ্যাত মধ্য যুগীয় মহাকবি আলাওল এবং অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মরণাতীত কালের সংস্কৃতির সাথে সাথে যুগে যুগে হায়েনাদের দ্বারা বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রও পাওয়া যায়। মগ জলদস্যুদের হাতে পিতাসহ মহাকবি আলাওলের ধরা পড়ার ও তার পিতার নিহত হওয়ার করুণ কাহিনী, জলদস্যুদের নৃশংসতা ও বর্বরতার বিমূর্ত ভাষাচিত্র হয়ে থাকবে মহাপ্রলয়ের আগ পর্যন্ত। তবে সহস্র অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হামলার পরও দেশমাতৃকার প্রতি বঙ্গ সন্তানদের মমত্ববোধ ও আনুগত্য ছিল রীতিমতো আকাশ আড়াল করা। তাই তারা নিজেদের সীমিত শক্তি ও সামর্থ নিয়ে বর্বর হানাদারদের মোকাবেলায় কখনও পিছপা হয়নি এবং দেশমাতৃকার প্রয়োজনে জীবনবাজি রেখে বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো মরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বঙ্গ সন্তানদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর নজির বাংলার ইতিহাসে মিলেনা। তাই বাংলার আপামর জনগোষ্ঠী যুগের পর যুগ তথা স্মরণাতীত কাল থেকেই মহাবীর শশাঙ্ক, উত্তরাপথ স্বামী, বারো ভূইয়া শ্রেষ্ঠ ঈসা খাঁ, মীরমর্দন, মোহন লাল, মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা সেন, অভিরাম, ক্ষুদিরাম, তীতুমীর, ১৮৫৭ সালের বীর সিপাহীগণ, ফকির মজনু শাহসহ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীরদের স্মরণ করে আসছেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে। পাশাপাশি মীরজাফর, উমি চাঁদ, জগত শেঠ, রায়দুর্লভসহ বাংলা মায়ের কুলাঙ্গারদের প্রতি অবর্ণনীয় ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশ করে আসছেন যুগের পর যুগ ধরে। বলা যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উপমহাদেশ বিশেষ করে বাঙালিদের বিদ্রোহ তীব্র হতে থাকে স্বাধীনতার দুর্দমনীয় আকাঙ্খায়। এরপর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলন, গান্ধীর অসহযোগ ও ভারত ছাড় আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সাল। ব্রিটিশের বিদায়, ভারত- পাকিস্তানের অভ্যুদয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বে।

www.pathagar.com

তবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঊষা লগ্ন থেকেই বাঙালিদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নানা বিমাতাসুলভ আচরণে বিক্ষুব্ধ বাঙালিরা নানা সময় প্রতিবাদমুখর হয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে গিয়ে বাংলা মায়ের প্রতিবাদী দামাল ছেলেরা বুকের উষ্ণ রক্ত বইয়ে দিয়ে যে ইতিহাস রচনা করেছে, বিশ্বের অন্য কোনো জাতির পক্ষে এই ধরনের ইতিহাস রচনা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। পরবর্তীতে নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাঙালিরা ফিল্ডমার্শাল আইয়ূব খানের মার্শাল-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন বাতিল আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা, ১৯৬৯ সালে ১১ দফা আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান এমন কি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের ন্যায্য দাবির প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন কিংবা সহমর্মিতা প্রকাশ করেনি। বরং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এক হাত দেখিয়ে দেয়ার জন্য সমস্ত অমানুষিক কার্য সম্পাদন করে যায়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ, তখনকার সময়ে ধর্ম-বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের আত্মত্যাগের কাহিনী বিশ্বের যে কোনো স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশের গৌরবগাঁথাকে সন্দেহাতীতভাবে হার মানিয়ে দেয়। মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণকে পুঁজি করে এশিয়ার সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে ও চোরাগোপ্তা হামলায় পুরোপুরি কাবু করার পর ৯৬ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা ছিল বিশ্বের নতুন বিস্ময়।

যাহোক, সামান্য সম্পদ ও জ্ঞান দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন , প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার কাজে রাজনীতিবিদ ও সামরিক বেসামরিক আমলাসহ সবাই সাময়িকভাবে কিছুটা অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন যা দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহল চটজলদি লুপে নেয়। মূলত স্বাধীনতা অর্জনের পর নেতারা নিজেদের মোহ ত্যাগ ও সর্বাত্মক কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে যেখানে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় নতুনভাবে দেশ গড়া এবং সাজানোর কথা ছিলো, সেখানে তাদের অনেকেই অনভিজ্ঞতা ও সততার ভান করে জাতীয় জীবনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে বাদ দিয়ে নিজেদের মতো ইতিহাস রচনা করতে এবং নিজেদের আখের গোছাতে শুরু করলেন; পরবর্তীকালে অন্যান্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। তাই প্রকৃতির ধ্বংসলীলার সাথে কৃত্রিম খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি করে প্রশাসনকে চরম বেকায়দায় ফেলে দেয়ার ঘটনা ঘটাতে দেখা যায়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও কলকারখানায় চলে জ্বালাও পোড়াও-এর রাজনীতি। দেশে অবাধে চলতে থাকে

www.pathagar.com

হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ। সদ্য স্বাধীন দেশে রাজনীতিসহ সংবাদপত্রের বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে চলে একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব। আওয়ামীলীগের বদলে করা হলো বাকশাল। যা জনগণ সহজে মেনে নিতে পারেনি। সদ্য স্বাধীন দেশে আবারো শুরু হয় অরাজকতা ও নৈরাজ্য। কিছু কিছু ছাত্রনেতার আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিমত করার কারণে জাসদের জন্ম হয় এবং তারা শুরু করে হত্যার রাজনীতি। এমনকি সেনাবাহিনীতে লে. কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মূলত তখন থেকেই দেশে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়। নানা তুচ্ছ ঘটনাকে পুঁজি করে সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী উচ্ছৃঙ্খল সদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করার মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি করে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর বঙ্গবন্ধুরই ঘনিষ্ঠজন হিসেবে স্বীকৃত খন্দকার মোস্তাক রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণ করেন। জেলে নির্মমভাবে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের নামে বার বার সেনা অভ্যুত্থানে অনেক দেশপ্রেমিক সৈনিকের তাজা রক্তে বাংলার মাটি ও সেনাঘাটি রঞ্জিত হয়। দেশের মানুষ যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত ও দিশেহারা অবস্থা বেগতিক দেখে বন্দিদশা থেকে ছুটিয়ে এনে তখন জেনারেল জিয়াউর রহমানকে দায়িত্ব দেয়া হয় রাষ্ট্রপরিচালনার। দেশ শাসনে অনভিজ্ঞ জেনারেল জিয়া প্রথমেই চেয়েছিলেন আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার এবং শুরু করেছিলেন জাতিকে নানান কাজের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে। অল্প দিনের মধ্যে জিয়া খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মাঝে মধ্যে দেশের কৃতি ছাত্রদের সাথে কথা বলেন। সৃষ্টি হয় মানুষের মধ্যে প্রেরণা ; দেশে এক দলীয় শাসনের পরিবর্তে বহু দলীয় গণতন্ত্র চালু হলো, দেয়া হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এমন কি তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। ইরাক- ইরানের দীর্ঘদিনের যুদ্ধ বন্ধের মধ্যস্থতা করে সফল হন যা বিশ্বের অন্য কোন নেতা বা দেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে ও বিদেশে নেতৃত্ব দেয়া জিয়ার এই সব কর্মকান্ড বড় ভাইদের অর্থাৎ দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। তারা চাননি বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াক বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সদ্য স্বাধীন দেশের কোনো নেতা নেতৃত্ব দিক। সেনাবাহিনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল অফিসার ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে যেই নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করে, ঠিক একই কায়দায় বিদেশীদের প্ররোচনায় উচ্চাভিলাষী সেনাবাহিনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল অফিসার স্বাধীনতার ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে মধ্য রাতে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে। মৃত্যুর পর মরদেহ ঢাকায় সংসদ ভবনে নিয়ে আসা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক মহান নেতার জানাযায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে হত্যা ও খুনের রাজনীতি তখন থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক

www.pathagar.com

রূপ পেতে থাকে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নৃশংস খুনের পর বর্ষীয়ান নেতা বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে উচ্চাভিলাষী সেনাপ্রধান লে: জেনারেল এইচ এম এরশাদ অবৈধভাবে তাকে বন্দুকের নলের মুখে বর্তমানের মতো নানা অভিযোগের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সামরিক আমলাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ভিতকে সুদৃঢ় করেন। সামরিক বাহিনীর লোকদের অযাচিতভাবে বেসামরিক প্রশাসনের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়ায় বেসামরিক আমলারা ব্যাপারটি সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। যাহোক, এরশাদের লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও নারী কেলেঙ্কারির ইতিহাস দেশবাসীর অজানা নয় বলে আমার ধারণা। এরশাদ অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে প্রায় দশ বছর বন্দুক দিয়ে দেশ শাসন করেছেন। তার সময় থেকেই রাষ্ট্রের সমস্ত নিয়ম-কানুন ও জাতীয় মূল্যবোধে চরম আঘাত এসেছে। এরশাদের যাবতীয় অবৈধ কর্মকান্ডে সহায়তা করেছেন তৎকালীন সুবিধেবাদী কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা। নীতি-আদর্শহীন কিছু সংখ্যক লেফাফা দুরস্ত লোক সর্বদা তৈরি থাকেন বরযাত্রী হওয়ার জন্য। আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে জনাব এরশাদের যাবতীয় কুকর্মের ভরাডুবির মুষ্টিলাভ হিসেবে দেশের স্বার্থান্বেষী ও সুবিধেভোগী রাজনীতিকদের চরিত্রের বিভিন্ন নোংরা দিক জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। এরশাদের অবৈধভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ চলতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্রকে কবর দিতে গিয়ে ডাঃ মিলন, নূর হোসেনসহ অনেককেই হত্যা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ ছাত্রদের ওপর ট্রাক তুলে দিয়েছিলেন। দলে ভেড়াতে ব্যর্থ হয়ে দেশের অনেক বরেণ্য রাজনীতিবিদকে বন্দুকের জোরে জেলে পুরেছেন ও নানা প্রলোভনের মাধ্যমে নিজের দলে ভিড়িয়েছেন। এরশাদের এই অবৈধ কাজকে বাংলাদেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দল ও তার নেতারা অর্থের বদৌলতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। না হয় বহু পূর্বে এরশাদকে জনতা তাড়িয়ে দিতো, এরশাদের নষ্টামিতে অতিষ্ঠ সকল দলের রাজনীতিবিদ ৯০-এর গোড়ার দিকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করলেন যে এরশাদকে তাড়ানো ছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুন: প্রতিষ্ঠিত হবে না; তখন সবাই একত্রে আন্দোলন শুরু করলেন। জনতার তাড়া খেয়ে তাকে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে দিয়ে ভাগতে হলো। এমন কি বোরকা পরে তার মন্ত্রিরা পালিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো যে শর্তে একত্রে আন্দোলন করলো, আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলে, পরবর্তীকালে ঐ শর্তের ধারে কাছে না গিয়ে পূর্বের মতো রাষ্ট্র পরিচালিত হলো। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একের প্রতি অন্যের আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকার ফলে নির্বাচনকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য

www.pathagar.com

জন্ম হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি বোগাস সিস্টেমের। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সুবিধেভোগী বিভিন্ন মহল থেকে সংগৃহীতদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি জয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। বিরোধীদল শুভেচ্ছা জানানোর পরিবর্তে নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ এনে শেখ হাসিনা আবারও সরকারের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। অবশ্য এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময় বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি নির্বাচন উত্তরকালে হালে পানি পায়নি। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মধ্যকার ক্ষণিকের গড়ে ওঠা সম্প্রীতির বন্ধনের স্থলে আবার দলীয় স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হয়। ৯০-এর গণ-আন্দোলনের চুক্তিনামা যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিফলিত হতো তাহলে ১৫ বছর পর এভাবে আবার জনগণকে চিন্তা করতে হতোনা। একই সাথে আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্বশীল বিরোধী দলীয় নেত্রীর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে সুবিধাবাদী ওঁৎপাতা সামরিক ও বেসামরিক আমলারা রাজনীতির নামে তাদের কাঁধে ভর করেন এবং রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের পথকে সুগম করেন। কালক্রমে সুবিধাভোগী সব আমলা ও জেনারেলরা রাজনৈতিক ময়দানে এতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন যে উভয় দলের প্রধান নিজেদের দলীয় ত্যাগী ও ভূয়োদর্শী নেতাদের থেকে বহুলাংশে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিত্য নতুন সামরিক ও বেসামরিক সচিব-জেনারেলদের দলে ভেড়ানোর প্রতিযোগিতায় মরিয়া হয়ে উঠেন। তাদের এই অর্বাচীনসুলভ প্রতিযোগিতার কারণে রাজনৈতিক ময়দানে ও রাজনীতি চর্চায় যে ভয়াবহ শূন্যতা দেখা দেয়, তারই শোচনীয় পরিণতিতে বর্তমানে দুই নেত্রী আসামীর কাঠগড়ায় বললে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে চাকরি জীবনে থাকাকালীন সময়ের খোঁজ নিলে দেখা যাবে সামরিক- বেসামরিক আমলারা রাজনীতিবিদদের চাইতে সম্ভবত বেশি দুর্নীতি করেছেন। সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন এবং দুর্নীতি করে সব সময়ই তারা পার পেয়ে গেছেন; আইন তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করার সুযোগ পায়নি। তাদের দুর্নীতির হিসাব (নেবার সুযোগই বা কোথায়?) নেবে কে? নিজেদের মধ্যে শত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সামরিক-বেসামরিক আমলারা এক অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ এবং একে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে রাজনীতিবিদদের দূরদর্শিতার অভাবে পরস্পরকে শত্রু জ্ঞান করেন। রাজনীতিবিদরা সারা জীবন কষ্ট করে জনগণের জন্য কাজ করে থাকেন। কিন্তু তাদেরকে নানা দুর্নীতির অভিযোগে ঐসব আমলারাই পরবর্তীকালে জেলে ভরে রাখেন। রাজনীতিবিদরা যদি পূর্বেই সতর্ক ও সচেতন হতেন এবং রাষ্ট্রের নিয়ম কানুনগুলো ঠিক করে রেখে যেতেন তাহলে

www.pathagar.com

দেশের অবস্থা আজ এমন হতো না বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। নেতারা যদি জনকল্যাণমূলক রাজনীতি করতেন এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন তাহলে তাদের এবং দেশের উভয়ের অবস্থা ভিন্নতর হতো। রাজনীতিবিদরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত না হয়ে আমলাদের দ্বারা সচরাচর পরিচালিত হয়েছেন বিধায় আক্কেল সেলামী হিসেবে বর্তমানে কারারুদ্ধ রয়েছেন। কন্ট্রাকটারি, আদম ব্যবসা, জুয়া, মদ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সংসদে বসে ঝগড়া-ঝাঁটি না করে যদি দেশের কথা ভাবতেন ,নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতেন, জনগণের কথা বলতেন, তাহলে আজ হয়তো তারা জেলের বাইরে থাকতেন; জনগণও তাদের বিপদে পাশে থাকতেন। আর যে সব সামরিক ও বেসামরিক আমলা গাছেরটাও খেয়েছেন এবং তলারটাও কুড়িয়েছেন তারাই হয়ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বর্তমানে জেলে থাকতেন। বললে অত্যুক্তি হবেনা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদের আশেপাশে যেখানে সৎ মেধাসম্পন্ন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের স্থান পাওয়ার কথা নেতানেত্রীরা সেটা না করে সকল মেধাহীন, অথর্ব সুবিধাবাদী লাঠিয়াল ও নিজেদের আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত ছিলেন সব সময়। কাজেই তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বা দিতে পারেননি জাতিকে। রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীদের দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতার সুযোগে দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থে লালিত-পালিত সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল সদস্য বন্দুক উচিয়ে নানা অছিলায় দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মহড়া শুরু করে দেন। তারা নির্বাচিত সরকারকে প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা না করে বিতর্কিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসে নেপথ্যে কলকাঠি নাড়িয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে থেকে ঘোলাটেতর করে তোলেন; তারপর রাজনৈতিক সংস্কার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার মুখরোচক সস্তা বুলি আউড়ে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অন্যদিকে রাজনীতি সমঝদার , দূরদর্শী ও ভূয়োদর্শীদের ধারণা দেশের সেনাবাহিনী ও স্বার্থান্বেষী মহল স্বদেশী, বিদেশী তথাকথিত সুশীল সমাজের ছদ্মাবরণে রাজনীতিবিদদের কাঁধে বন্দুক রেখে বিভিন্ন সময় নানা অঘটনে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং সমস্ত দায় দুই নেত্রীসহ রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করার চূড়ান্ত আয়োজনে তৎপর রয়েছেন। সেনাবাহিনী সম্পর্কে বর্তমানে মানুষের ধারণা সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনাবাহিনীর এক সদস্যের পশ্চাদদেশে এক জনের সজোরে ফ্লাইং কিক, দ্বিতীয়টি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার থেকে ফেরার পথে সংস্কারবাদী নেতা সাবেক সেনা প্রধান লেঃ জেঃ মাহবুবুর রহমানকে জুতা পেটা করার দৃশ্য। এটা

www.pathagar.com

থেকে সকলেরই আঁচ করা দরকার সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের গভীরতা। কিন্তু কেন এমন হলো? জনগণতো সেনাবাহিনীর সদস্যদের আপনজন এবং আপন ভাবতো। সেনা বাহিনীকে নিয়ে জনগণ গর্ব করতো। নিজে না খেয়ে তাদের ভরণ- পোষণ করাতো।

সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলতে হয়- বাংলাদেশের জনগণ প্রয়োজনে ভাঙ্গে কিন্তু মচকায়না। তাই যাবতীয় দোষ রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মসনদে টিকে থাকার দিবাস্বপ্ন দেখলে সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জিত হলেও হতে পারে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশবাসী সামরিক জান্তাকে কখনো স্বীকার করে নেবে না। কারণ এই জনগণই জেনারেল আইয়ুব, ইয়াহিয়া, মুনায়েমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে এবং দেশ স্বাধীন করেছে। তাই ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ার আগেই মানে মানে জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রতি সদয় অনুরোধ জানাচ্ছি। উচ্চাভিলাষীদের স্বার্থের কারণে এমনিতেই সেনাবাহিনী সম্পর্কে জনগণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। থাকার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লোভ সংবরণ করে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের উচিত জনগণকে প্রতিপক্ষ না ভেবে সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে শীঘ্রই দূরত্ব কমিয়ে আনা। তা না হলে ভুল বুঝাবুঝি সময়ের ব্যবধানে হয়ত বা ভয়াবহ রূপ নেবে এবং ভবিষ্যতে একটা বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে। অপমান, বঞ্চনা, অর্থনৈতিক শোষণ, দুঃশাসন, মুক্তভাবে চলার পথে বাধা, মুক্তভাবে প্রেম করার পথে বাধা, মায়ের ভাষায় কথা বলতে না দেয়া, অন্যায়, অপমান ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বাঙালি বিভিন্ন সময়ে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করেছে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে; কিন্তু কোনো কিছুতেই লাভ হয়নি। বরং উল্টো বাঙালিদের উপর আরো নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছে বিভিন্ন সময়ে। তারই পরিণতিতে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ নিরীহ বাঙালির প্রাণহানী এবং ২ লাখ মা- বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাঙালি স্বাধীনতা এনেছিলো। যে আশা- আকাঙ্খা নিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো জনগণের সেই আশা- আকাঙ্খা আজো কি পূরণ হয়েছে? পূরণ যদি না হয়ে থাকে এর কারণ কী? এর জন্য দায়ী কারা? এদেশে এখনতো পাকিস্তানিরা নেই। বর্তমানে বাঙালিরাই বাঙালিদের শাসন করছে। এখনতো অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভালো হবার কথা ছিলো, শান্তিতে থাকার কথা ছিলো। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসের কথা ছিল। তবে সমস্যা কোথায়? যে ত্যাগ- তিতীক্ষার বিনিময়ে বাঙালিরা বিজয় অর্জন করেছিলো, সেই বিজয়ের সুফল সাধারণ বাঙালিরা ভোগ করতে না পারলেও স্বাধীন দেশে গুটিকতক স্বার্থান্বেষী চক্র বিভিন্ন কলা- কৌশলে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করে চলছে। দেশে ২২ পরিবারের

www.pathagar.com

পরিবর্তে অন্যায়ভাবে নতুন ২২ হাজার পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। তাতেও অসুবিধে নেই। এরাত আমাদেরই একজন। জনগণের ভালোবাসা ও ইচ্ছাকে পদদলিত করে বিভিন্ন সময়ে শক্তি ও বন্দুক দিয়ে হলেও সকল সুযোগ- সুবিধা উপভোগ করছেন স্বার্থান্বেষীরা। এরা সব সময় জনগণের দোহাই দিয়ে নিজে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হৃষ্টপুষ্ট করেছেন। অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়েছেন এবং সরকারের সম্পদ ও খাস জায়গা চরের মতো জবর দখল করেছেন। সরকারী জমি দখল করে নিজেদের বা আত্মীয়-স্বজনের নামে সাইনবোড লাগিয়েছেন। তাদের কালো হাত সর্বত্র বিরাজ করেছে। অথচ সাধারণ জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার সুযোগ লাভের আশা- আশাই থেকে গেল, ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না। অত্যাচারি সাবেক পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠির পরিবর্তে দেশে বাঙালি নব্য একটি শোষক গোষ্ঠি তৈরি হলো। গরীব জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস ও কথার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে শোষণ- শাসন- নির্যাতন করতে লাগলো নতুন করে। সুবিধাবাদীরা রাষ্ট্রীয় শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। শক্তি ও সামর্থহীন জনগণ নানা মতে বিভক্ত ও দুর্বল হতে লাগলো। যার ফলে গরীব জনগণ আরো গরীব হতে শুরু করলো। আরো প্রকট আকার ধারণ করলো। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গরীবে পরিণত হলো, অন্যদিকে এক শ্রেণীর লোক ধনী থেকে আরো ধনী হতে থাকলো। কৃষকের ভান্ডার পূরণের পরিবর্তে শূন্য হতে শুরু হলো। ছাত্রদের ভবিষ্যত জীবনের নিশ্চয়তা নেই। শ্রমিকের শ্রমে ফেঁপে ফুলে কালোবাজারি, অসৎ ব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা বড় হতে শুরু করলো। শিক্ষকরা স্কুলে না পড়িয়ে বাসায় পড়াতে শুরু করলেন। শিক্ষক, ছাত্র, জ্ঞানী-গুণীব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ দেশে নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখে বিদেশে পাড়ি জমাতে থাকলেন। শিক্ষকরা নিজের চাকরিতে মন না দিয়ে বাইরে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজে জড়িয়ে পড়ে টাকা আয় করতে শুরু করেন এবং রাজনৈতিক কর্মীর মতো নিজেরা বিভক্ত হলেন। জনগণ রয়ে গেল যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই। পর্যায়ক্রমে সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিতে শুরু করলো। এমন একটি প্রতিষ্ঠান ও এলাকা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে অবক্ষয়ের ক্ষত নেই। স্বাধীনতার পর যাদের বিজয় অর্জিত হওয়ার কথা ছিলো, জীবন নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিলো, ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষণ ও স্বাধীনভাবে যাদের পথ চলার কথা ছিলো, স্বাধীনভাবে কথা বলার কথা ছিল, শিশুদের জমিতে হাল চাষ, ভিক্ষা ও অপ্রাপ্ত বয়সে চাকরি করার পরিবর্তে স্কুলে থাকার কথা ছিলো– তাদের দিকে ক্ষমতাবান তথাকথিত গণতান্ত্রিক লেবাসধারী শাসকদের তাকাবার সময় কোথায়? কাজেই জনগণের বিজয় অর্জনের পরিবর্তে বাঙালি কিছু সুযোগ সন্ধানী স্বার্থান্বেষী মহলের বিজয় অর্জিত হলো। বিজয়ের সুফল জনগণের পরিবর্তে ভোগ করলো সুবিধেবাদী

www.pathagar.com

শোষক ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই।

স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশকে নিয়ে ভেতরে/ বাইরে দেশী- বিদেশী গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এজেন্সী মিলে ষড়যন্ত্র করে আসছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এই ষড়যন্ত্র ছিলো, পরেও ছিলো, এখনো আছে এবং থাকবে ভবিষ্যতেও। এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কখনো থেমে থাকেনি, সব সময় সচল ছিলো। ঐ চক্রটি সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বাংলাদেশকে নানান ধরনের চক্রান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। যার ধারাবাহিকতা দেশে এখনো বিদ্যমান। ওরা চায় না বাংলাদেশের মানুষ স্বাবলম্বী হোক, স্বদেশে জনগণ নিজের পায়ে দাঁড়াক। যে কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দেশী- বিদেশী চররা মিলে একটার পর একটা কৃত্রিম পরিস্থিতি তৈরি করে বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে । সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করেছে জনগণকে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিদেশ পাঠিয়ে তারা স্কুল- কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার পরিবর্তে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে, কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে, ধর্মে ধর্মে ও মানুষে মানুষে ব্যবধান বাড়িয়েছে। তারা কখনও বন্ধু কখনও বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আগেকার দিনে বন্দুক-কামানের জোরে দেশ দখল করা হতো। আধুনিক যুগে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সেগুলোর প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানে দখলের ধরন পাল্টেছে। এই চক্রটি সুনিপুণভাবে বিদেশীদের সহায়তায় দেশের ভিতরে থাকা তাদের প্রতিনিধিদের দিয়েই এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এমন কি রাজনীতিবিদরা একে অন্যকে বিশ্বাস না করে, নিজেদের সমস্যা সমাধান না করে বিদেশী রেফারীদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছে। লজ্জা সরম বাদ দিয়ে অন্যদেশের লোকদের নিজেদের ও অভ্যন্তরীণ সমস্যায় নাক গলাতে আহ্বান জানিয়েছে। পরবর্তীতে নানা উছিলায় সুযোগ নিয়ে ঐ সকল লোক চক্রান্ত করেছে। যাতে বাংলাদেশ নামক দেশটিকে অকার্যকর করা যায়। দেশকে অকার্যকর করার শ্লোগান বহু পূর্ব থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো দেশে এবং বিদেশে যাতে সদ্য স্বাধীন দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়নের লেবাস পরিয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি পৌছা যায় এবং সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। বার বার আমাদের ছোট্ট সোনার বাংলাকে নিয়ে দেশী- বিদেশীরা মিলে ষড়যন্ত্র করেছে। দেশটি যখনই দাঁড়াতে চায়- তখনই দেশী-বিদেশী চক্রগুলো মিলেমিশে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করতে থাকে। গণতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টিকারীদেরকে গণতন্ত্রের ধারক- বাহক কিছুই বলা যায় না। কারণ তারা দেশের ভিতর বিভিন্ন আবরণে নানা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করবে। সচেতন দেশবাসী যদি দেশী বিদেশীদের এই ষড়যন্ত্রকে সময়মতো প্রতিহত করতে না পারে তাহলে এতো রক্ত, এত সম্ভ্রম, এতো বিসর্জন

www.pathagar.com

দেয়ার দরকার বা কী ছিলো?

প্রচলিত ধারণা মতে দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র পাকানোর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে দেশবাসী কখনও স্বাবলম্বী না হয়ে পরাশ্রয়ী জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এই ষড়যন্ত্রের কথা কিছু কিছু সাধারণ জনগণ বুঝলেও বাংলাদেশে অবস্থানকারী সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদী বাঙালি চররা বুঝতে চায় না। কারণ তাদের কাছে দেশ, সমাজ, জনগণ, স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই। দেশের চেয়ে তারা নিজেদের স্বার্থকে সব সময় বড় করে দেখে। স্বাধীন দেশে দেশী- বিদেশী চক্র মিলে দেশকে অন্যের করদ রাজ্য বা সিকিম- ভূটান বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কুটকৌশলে। সেই সব সুবিধেভোগী বেঈমানদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের সে প্রচেষ্টা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে চেষ্টা করতে তাদের অসুবিধা কোথায়? ষড়যন্ত্রকারীদের মনে রাখতে হবে বাঙালি স্বাধীনচেতা জাতি। কারও করুণায় দেশ স্বাধীন হয়নি। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে বাঙালি স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। দেশটি যখনই উন্নতির দিকে যাচ্ছিলো তখন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ স্বার্থান্বেষী মহলের টার্গেটে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। তারা দেশের ভিতর নানামুখী খেলা শুরু করেছে। সংবিধান বর্তমানে নজরবন্দী। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। আধুনিক যুগে আইনের পরিবর্তে রাষ্ট্র শাসনের হাতিয়ার হিসেবে বন্দুকের নলকে বেছে নেয়া হয়েছে। মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে আইনের অপব্যবহার করে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে বর্তমানে বিদেশীদের মনোনীত সরকারই দেশ চালাচ্ছে। জনান্তিকে প্রকাশ দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। নানামুখী সমস্যায় জনগণ দিশেহারা। দেশের ভিতর যারা বাংলাদেশের মানচিত্রকে খামচে ধরার চেষ্টা করছে, তাদের অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। দেশের ভেতর এই খোলসপরা লোকগুলো কারা? কোথায় ও কোনো কোনো সংস্থায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বাইর করা দরকার। দেশের ভেতর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু কর্মচারি রয়েছে যারা লজ্জা শরম নির্বাসন দিয়ে, নানা লোভ-লালসার মোহাবিষ্ট হয়ে দেশের নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করে, এরা কারা? জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ভেতর কোনো বিশেষ সংস্থার কর্মচারিকে কারা লালন পালন করছে? কারা সরকারের অবৈধকাজগুলোকে সংবিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে বৈধ করতে চায়। কারা অবৈধ সরকারের পক্ষে টিভি ও সংবাদপত্রে সাফাই গায় এই লোকগুলো দিনের আলোতে গণতন্ত্রের কথা বলে, সময়ে- অসময়ে সুন্দর সুন্দর বাণী সাধারণ জনগণকে শোনায়। সুট টাই পরে মিডিয়ায় উপস্থিত হয়। মাঝে মধ্যে স্বল্প পরিসরে সেমিনার- সিম্পোজিয়াম করে, জনগণকে তোয়াক্কা না করে ছোট্ট ঘরে আশে- পাশে কিছু বিদেশী ও বর্তমানে সামরিক বাহিনীর কিছু লোক বসিয়ে রাখে। নিজেরা খুশীতে গদ গদ করে, ভাবে জাতে উঠেছে। বিদেশী

www.pathagar.com

অর্থে লালিত পোষ্যরা তাদের স্থানীয় মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে তাদের অমৃতবচন প্রচার করে থাকে। উন্নয়নের কথা বলে, অর্থাৎ যে সস্তা কথাগুলো বললে সাধারণ মানুষকে ঠকানো যাবে বা বিপদগ্রস্ত করা যাবে, সেই কথা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। বাজারে চাপা গুঞ্জন রয়েছে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশী মিডিয়ার সাথে জড়িত সাংবাদিকদের অধিকাংশই কোনো কোনো অপরাধের সাথে জড়িত। এমনকি, অবৈধ পথে অর্থ কামিয়ে বড় বড় মিডিয়া হাউজগুলো করেছে। তাদের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় দেশপ্রেমের বড় অভাব। ওদশের স্বার্থের চাইতে নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে। ঐসব মুখোশপরা বেইমানদের শীঘ্রই শূলে চড়ানো উচিত। সাংবাদিকরা সৎ হলে একটি জাতিকে তার লেখনীর মাধ্যমে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। অন্যদিকে সাংবাদিকরা অসৎ হলে জাতিকে তার খেসারত দিতে হয় যা বর্তমানে দেশে ও প্রবাসে প্রতীয়মান।

বাংলা কখনো গরীব ছিলো না। স্মরণাতীত কাল থেকে পর্যায়ক্রমে বিদেশী হায়েনারা, ব্রিটিশ ও সর্বশেষ পাকিস্তানিরা বাংলাদেশকে অবাধে লুণ্ঠন করেছে সময়ে অসময়ে। বর্তমানে সভ্য দাবীদাররা এক সময় অসভ্য ছিলো। তারা বিভিন্ন দেশ লুট করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে বর্তমানে নিজেদের অনেক কিছু ভাবে এবং অন্যকে জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করে। সহজে তাদের অতীত ভুলে গেছে। বাঙালির অর্থে পাকিস্তানীরা তাদের দেশ গড়েছে। স্বচক্ষে দেখা, স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্যের নাম করে বন্ধুর বেশে ভারতীয়রাও বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ অবাধে লুণ্ঠন করেছে। বাংলাদেশে যাদেরকে আমরা নিজের আপন মনে করেছি, যাদেরকে জনগণ বিশ্বাস করেছে, যারা কৃষক- শ্রমিকের রক্তে লালিত পালিত, যাদের দায়িত্ব ছিলো কৃষক- শ্রমিককে রক্ষা করার, যারা বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করবে, যাদেরকে জনগণ নিজের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে ভরণ পোষণ করিয়েছে, যাদের নিয়ে বাঙালি গর্ব করে, যাদেরকে বিশ্বাস করে, আপন ভেবে সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে তারাই বিদেশীদের পরিবর্তে এখন দেশে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যেখানে জনগণের প্রয়োজনে বাংলাদেশের সংবিধান, সরকারের শাসন ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা সমুন্নত রাখার পরিবর্তে বার বার গণতন্ত্রের পথে হস্তক্ষেপ, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও অপচয়। এবং বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তাতেও বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে কোনো কারণে সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে সরাসরি সংঘাত বেধে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিভিন্ন অজুহাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। সাধারণত সেনা বাহিনীর লোকেরা একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বসবাস করে থাকেন। যার জন্য তারা জনগণের চাইতে অধিকতর সুযোগ সুবিধা উপভোগ করে থাকেন। জনগণের সাথে থাকে তাদের দূরত্ব। বিদেশী আক্রমণ ও দেশের

www.pathagar.com

কোনো জরুরী অবস্থায় সরকার ডাকলে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে তাদেরকে ডাকতে হয় না। অনুমতি ছাড়াই এমনিতেই তারা বঙ্গভবনে চলে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে খুব কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি প্রফেসার ইয়াজউদ্দিন স্যারকে দেখেছি। দেখতে খুব নরম মনে হলেও তিনি যে দায়িত্ব পালনে এত ভীরু তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বর্তমানে কিছু কিছু অফিসার ও সৈনিক জনগণের সাথে এমন মাখামাখি শুরু করেছেন, মিডিয়ায় বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে চলছেন যা খুব দৃষ্টিকটু। এমনকি অভিজ্ঞ মহলের দৃষ্টিতে তা সেনাবাহিনীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অন্তরায়। ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের চাকরির কোড অব কন্ডাক্টের বাইরে জনগণ ভয় পাওয়ার চাইতে সম্মান করবে বলে মনে হয় না। টেলিভিশনের আনুকূল্যে অনেককে দেখলে মনে হয় ওনারা জাতির ত্রাণকর্তা। চাকরির সমস্ত নিয়ম-রীতি-নীতি উপেক্ষা করে এক একজন রাজনৈতিক নেতাদের মতো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন যা মূলত দেশ ও জনগণের জন্য সুখকর নয়। সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যরা নিরীহ জনগণকে পাখির মতগুলো করে মারছে, সেটার দিকে বিডিআর, সেনাবাহিনীর নজর দেয়ার সময় কোথায়; ওনারা নিজেদের কাজ রেখে তেল, আলু, পটল, লবণ সুলভ মূল্যে বিক্রিতে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজেদের প্রমোশন ও সুযোগ সুবিধা নিতে। কিছু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী সামরিক- বেসামরিক অফিসারের স্বার্থের কারণে দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা জনগণের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। দেশী- বিদেশী মিলে অন্যের বা নিজেদের স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে দেশকে নিয়ে যাচ্ছি গৃহযুদ্ধের দিকে। তারা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অংশ নেয় এবং নাক গলায়। অন্যদিকে বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের রাজনীতিবিদরা এতই দুর্বল যে কোনো বিদেশী আসতে দেখলে দৌড়ে তাদের কাছে চলে যান, নিজেরা নিজেদের ঝগড়াঝাটির বিচার মীমাংসার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হন। এতে তাদের নিজেদের লজ্জা না লাগলেও সাধারণ জনগণের লজ্জা লাগে। অতীতের কিছু ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে ধারণা করা যাবে জনগণ সেনাবাহিনীকে কীভাবে দেখে এবং কেন মনে মনে ঘৃণা করে।

কারা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারকে হত্যা করেছে? জেলে অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে কারা ? স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যিনি নিজের জীবনবাজি রেখে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তাকে কারা হত্যা করেছে? কে হত্যা করেছেনৌবাহিনীর প্রধান রিয়াল এডমিরাল মাহবুব আলী খানকে? বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সূর্য সন্তানদেরকে কারা হত্যা করেছে? জেনারেল এরশাদ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারকে বন্দুকের জোরে অবৈধভাবে সরিয়ে গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা

www.pathagar.com

ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপে দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নাসিম অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কেন জনগণের নির্বাচিত সরকারকে সরাতে চেয়েছিলেন? স্বাধীনতার পর এই অবৈধ কাজগুলো কারা করেছে? এরা কি জনগণ না জনগণের প্রতিনিধি, না রাজনৈতিক ব্যক্তি, না দেশের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চাভিলাষী কিছু উচ্ছৃঙ্খল অফিসার? বর্তমান অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আড়ালে এরা কারা?

বাংলার জনগণ চেয়েছিলো পাকিস্তানি বন্দুক ওয়ালাদের চোখ রাঙানো থেকে মুক্তি, উল্টো বাস্তবে দেখা গেলো কী? এক বন্দুকওয়ালার কাছ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, যাদেরকে নিজের অর্থে ভরণ-পোষণ করাই, যাদের নিজের ভাই- আত্মীয় বলে পরিচয় দিই– সেই সব বাঙালি বন্দুকওয়ালাদের কাছে নিরীহ জনগণ জিম্মি হয়ে গেল, জনগণের সমস্ত অধিকার, গণতন্ত্র, মুক্তভাবে চলার পথ, স্বাধীনভাবে কথা বলার পথ হল রুদ্ধ। বন্দুকের জোরে তারা বার বার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে। বাধাগ্রস্ত করেছে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা ও উন্নয়নের পথকে । দুর্নীতি উচ্ছেদের কথা বলে রাষ্ট্রের সমস্ত নিয়ম কানুনকে বার বার বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে এবং যারা এ সকল অবৈধ কাজ করেছে অতীতে তাদের হাতে হাতকড়া লাগানো হয়নি কেন? কারা ওদের সাথে পরবর্তীতে সমঝোতা করেছে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গত সরকারগুলোর সময় দুর্নীতি যে হয়নি, ধর্মীয় রাজনীতি প্রশ্রয় পায়নি বা পরিবারতন্ত্র যে কায়েম করা হয়নি তা আমি বলবো না। কিন্তু একটি অন্যায় দিয়ে আরেকটি অন্যায়ের প্রতিকার বা প্রতিবিধান করা যায় না। বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর আমলে সুবিধেভোগী ও ফায়দা হাসিলকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বর্তমান সরকারে রয়েছেন বলে শোনা যায়। এই লুণ্ঠন, দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমি হয়ত সর্বপ্রথম ব্যক্তিগতভাবে ১০ বছর থেকে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে ও দেশের টিভি, পত্রপত্রিকায় বাঙালি সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলে বেড়িয়েছি। প্রশাসন যন্ত্রের বাইরে থেকে যদি আমরা আঁচ করতে ও বুঝতে পারি, তাহলে অন্যদের বুঝতে অসুবিধা কোথায়? এবং কেন রাজনীতিবিদ বা দেশবাসীর বুঝতে এতো দেরী হলো। কারো কারো অভিযোগ বর্তমানে দুর্নীতির কথা বলে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। অন্যায়ভাবে বহুলোককে ভয় দেখিয়ে জেলে রাখা হয়েছে, বিচার করা হচ্ছে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে। নানান কাজের মাধ্যমে বিচার করলে বোঝা যায় বর্তমান সরকারও পক্ষপাতদুষ্ট আইনের সমস্ত শর্তকে পাশ কাটিয়ে ইচ্ছা মাফিক, বিদেশী মনিবদের খুশি করানোর জন্য নিজের দেশের নেতানেত্রী ও দেশকে ছোট করছে, রাজনীতিবিদদের কলঙ্কের কালিমা পরানোর চেষ্টা চলছে। কলঙ্কের তিলক পরিয়ে হয়তো দেখা যাবে একদিন তারা ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা

www.pathagar.com

দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছে নানা ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে, টাকা দাও না হয় ক্রস ফায়ারে ফেলে দেবো, টাকা দাও না হয় যৌথ বাহিনীর লিস্টে নাম লিখে দেবো। বিরুদ্ধে লিখলে বা বললে জেলে পুরে দেবো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এদেশের মালিক এখন জনগণ নয়, কতিপয় বিদেশী এজেন্ট ও সশস্ত্র ব্যক্তি । তারাই মালিক- মোক্তার। এদের জ্বালায় জনগণ অতিষ্ঠ। মাঝে মধ্যে দেশের জনগণের সাথে আলাপকালে জানা যায়, অন্যায়ভাবে রাজনীতিবিদ ও জনগণকে রিমান্ডের নামে থানায় ও ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। লঙ্ঘিত হচ্ছে এতে মানবাধিকার। ক্যান্টনমেন্টগুলো মনে হচ্ছে গুয়ানতানামো-বের মতো এক একটি টর্চার সেল। যেখানে অবৈধভাবে ইরাকের জনগণ ও মুসলমানকে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সারাবিশ্ব প্রতিবাদ করছে। দেশে রিমান্ডের নামে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে এবং স্বাভাবিক আইনের সুযোগ সুবিধা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অবৈধ কাজে যারা লিপ্ত তাদের মনে রাখতে হবে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নির্যাতনের কোনো ঘটনাই চাপা থাকে না। সম্প্রতি সেনা সমর্থিত পুতুল ফখরুদ্দীন সরকারের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ সম্পর্কে শেখ সেলিম, তারেক জিয়া প্রকাশ্য আদালতে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন। তারেক রহমান ও কোকোকে জেলে নেয়া হলো সুস্থ মানুষ হিসেবে। নানীর মরদেহ দেখতে আসলে তারেক ও কোকো দু'ভাইর অবস্থা দেখে দেশবাসী শুধু অবাক হয়নি, বরং ফখরুদ্দীন সরকারের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে দেশবাসী সামান্য ধারণা পেয়েছেন। এ সরকার কতো জঘণ্য যে তারেক দেশের অলস যুবসমাজকে উদ্যমী করেছেন,স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই তারেক রহমান বর্তমানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। অন্যদিকে কোকো হুইল চেয়ারে- এটা কিসের আলামত? দেশবাসীর অজানা নয়, কয়েক বছর পূর্বে সামান্য কর্মচারি এই ফখরুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জামাই-আদর করে বিদেশ থেকে এনে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর বানিয়েছিলেন। বাংলাদেশে আকাম-কুকাম করে পার পেলেও বিদেশে সম্ভব নয়। ড. ফখরুদ্দিন গভর্ণর থাকাকালে ওরিয়ন গ্রুপ যে দুর্নীতি করেছিলো তিনি তার বাইরে থেকে গেলেন কেমন করে? স্মর্তব্য, সিআইএ জেলের অত্যাচারের ঘটনাগুলো ধ্বংস করলেও মানুষের মনের ভিতর থেকে উধাও করতে পারেনি। বিচারকের হাত থেকে বুশ প্রশাসন কখনোই নিষ্কৃতি পাবে না। টেপ দেখলে প্রেসিডেন্ট বুশের থলের বিড়াল বেরিয়ে আসতে পারে ভেবে সিআইএ টেপ হয়তো ধ্বংস করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে হয়ত পার পাওয়া যাবে। কারণ বাংলাদেশে আইন ও বিচার চলে তো ইশারা বা বন্দুকের নলে। পৃথিবীতে কোনো স্বৈরশাসক অবৈধ পথে এসে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি, পারবেও না। জনগণের তাড়া খেতে

www.pathagar.com

হয়েছে আগে অথবা পরে। সত্যকে কখনো লুকানো যাবে না। তবে যারা অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন, সংবিধানকে বাক্সবন্দী করেছেন, জনগণকে ক্ষত- বিক্ষত করার চেষ্টা করছেন এবং সংসদকে পাশ কাটিয়ে বর্তমান সংবিধানকে পরিবর্তনের যে পরিকল্পনা করছেন– তাদেরকে একদিন জনগণের আদালতে দাঁড়াতে হবে, হলে আফসোসের কিছু থাকবেনা। তখন ভারত, প্রণব মুখ্যার্জি, পাকিস্তান, আইএসআই, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরব বিশ্বের প্রতিনিধি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ, ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীসহ কেউই তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না বলে দেশবাসীর ধারণা। তবে রাষ্ট-ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য হয়তো কোনো কোনো বেঈমান রাজনীতিক অবৈধ কাজের সাথে হাত মিলাতেও পারে। কাজেই সাধু সাবধান। আর দায় এড়াতে কেউ যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করলে জনগণ এবার হয়তো প্রতিহত করবে।

গুটিকতক মানুষের সীমাহীন লোভের কারণে বাংলাদেশে বার বার মিথ্যা ও কাল্পনিক অজুহাতে বন্দুকের জোরে অবৈধভাবে গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতা হাইজ্যাক করা হয়েছে। অতীতের অবৈধ স্বৈরাচারি এরশাদ সরকারের মতো বর্তমান বিদেশীদের মনোনীত আর্মি সমর্থিত ড. ফখরুদ্দীন সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উপর অন্যায়ভাবে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। অতীতের সরকারগুলোর মতো এরাও চায়না গরীব জনগণের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হোক, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকুক। কারণ তাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে নিরাপদে লেখা-পড়া করছে। তাই তারা চায় না দেশ স্বাবলম্বী হোক, দেশবাসী শিক্ষিত হোক। কারণ অশিক্ষিত জগণকে সহজে ঠকানো যায়। একটি বিষয়ের প্রতি জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে কোনো রাজনৈতিক দল গোপন আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে সেনাসমর্থিত ডঃ ফখরুদ্দীনের অবৈধ কাজগুলোকে সংসদে বৈধতাদানের সুযোগ না পায়। যে রাজনীতিবিদ ওইসব অবৈধ কাজে জড়িত থাকবে তাদেরকে ভোটের মাধ্যমে পরাজিত করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে চিরদিনের জন্য। গত সরকার নিজেদের ভেবে বিভিন্ন জায়গা থেকে কুড়িয়ে এনে যাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, দায়িত্ব দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তারাই একজোট হয়ে মীরজাফরের মতো দেশে- বিদেশে বসে রোড ম্যাপ তৈরি ও ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাইজ্যাক করেছে। দেশের ভিতরে ঐ সব বিদেশী স্বার্থসেবীরা সুন্দর সুন্দর কথা বলে সাধারণ জনগণকে সব সময় প্রতারিত করেছে ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করেছে এবং সরলতার সুযোগে আমাদের প্রতারিত করেছে ঐসব দুষ্ট লোকরা । ঐ সময় মনে হয়েছিলো বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা বাংলাদেশের মালিক, মোক্তার ও

www.pathagar.com

বিচারক। রাজনীতিবিদরা বড় বেশি সুযোগ দিয়েছেন ওদেরকে। রাজনীতিবিদগণ গঠনমূলক রাজনীতি করলে দেশে আজ এহেন পরিস্থিতি জন্ম নিতোনা। রাজনীতিবিদগণ দেশে সুশাসন চালু করলে জনতার মঞ্চ তৈরি হতো না। প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মচারিরা যারা অবৈধভাবে জনতার মঞ্চ তৈরি করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছেন, তখনকার সরকার ওদেরকে জেলে না ভরে জামাই আদর করে মন্ত্রীত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন- এতে বেসামরিক আমলারা উৎসাহিত হয়েছেন। রাজনীতিবদরা বিদেশীদের খুব বেশি সুযোগ দিয়েছে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। মিডিয়ার লোকরা প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে বেশি বাড়বাড়ি করেছে ওদেরকে নিয়ে। তাদেরকেও মিডিয়ায় প্রচার দিয়েছে। কাজেই সাংবাদিকদের দেশপ্রেম নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে দেশে। জনগণের সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই, নির্বাচনে দাঁড়ালে পরাজিত হওয়ার ভয়ে যারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না জানে তারা অন্যের অন্যায় ও অবৈধ কাজকে সঠিক বলে চালিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের ভাগাভাগিতে অংশ নিতে চাচ্ছে। দেশ ও জনগণ তাদের কাছে গৌণ।

একটি স্বাধীন দেশকে যেখানে নতুনভাবে সাজানোর কথা ছিলো, সেটা না করে সংবিধান রচনাকারীর দাবিদাররা মান্ধাতার আমলের ব্রিটিশ আইনকে বাঙালির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলো । যদি অন্যকে অনুসরণ বা অনুকরণ করার ইচ্ছা থেকেই থাকে তাহলে তখনকার সময়ের একটি আধুনিক দেশের সংবিধানের সাহায্য নেয়া যেতে পারতো। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা কখনও স্বাধীন ছিলো না এমন কি বর্তমানেও নয়। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও বিচারকগণ নিরপেক্ষ না থাকার কারণে বিচারের বাণী অনেক সময় নিভৃতে কাঁদে, অনিয়মই সেখানে নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় সরকারের সরাসরি নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে অনেক সময় মানুষ ন্যায্য বিচার পায়নি। দেশের কোর্ট দেখলে মনে হবে ভিতরে মানুষের মিছিল হচ্ছে। সরকারের বা ব্যক্তির ইশারায় যদি বিচারকার্য চলে তাহলে জনগণ ন্যায় বিচার পাবে কোথায়? শুধু সামরিক বা বেসামরিক আমলারা নয় বাংলাদেশে অনেক বিচারক আছেন যারা লোভ সংবরণ না করে অবৈধ কাজে হাত বাড়িয়ে ক্ষমতায় এসেছেন এবং ক্ষমতার ভাগাভাগির সুবিধা ভোগ করেছেন। এমন কি একাধিক বিচারক প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। নিজের স্বার্থের কারণে সমস্ত বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। আধুনিক বিশ্ব চলে একটা নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে, নীতি ও আদর্শের মধ্যে দিয়ে। ঐ সব দেশের পূর্ব পুরুষরা জনগণের জন্য তৈরি করে গেছেন কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সে আইন। রাষ্ট্র চালানোর জন্য প্রয়োজন একটি আধুনিক সংবিধান। সেই সংবিধানকে বাক্সবন্দী না করে অন্যরা আরো সমৃদ্ধ করে গেছেন; কিন্তু বাংলাদেশে সংবিধান থাকলেও কেউ

www.pathagar.com

মানে না বা সম্মান করে না। আর অনেকেই আছেন সংবিধানের কথা বলে নিজেদের অপকর্মগুলো ঢাকার চেষ্টা করেন। বর্তমান সরকারের সাথে দু' একজন বাকবাগিশ উকিল/ ব্যারিস্টার আছেন, যারা নিকট অতীতে কোর্ট ভেঙ্গেছেন, কোর্টকে আপমান করেছেন, নিজের মতো আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাড়া আর কী? কখনও কখনও খোলস পরিবর্তন করেন। যারা সময়ে অসময়ে সংবিধান নিয়ে নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, সত্যকে লুকিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকেন, দেশে কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টিতে অবৈধদের সাহায্য করেন এবং দেশে সংকট দেখলেই ব্রিফ কেইস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন– এসব সুযোগ সন্ধানী অতি চালাক লোকদের থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে। এদের কথা জনগণের সহজে আমলে না নেওয়াই ভালো। মিডিয়াগুলোর উচিত বয়স্ক ফেরীওয়ালাদের পৃষ্ঠপোষকতা না করা। যারা বিভিন্ন সময় অপরাধ ও অন্যায়ের সাথে জড়িত ছিল, তারা যতো বড়ই হোক না কেন, মিডিয়াগুলোর উচিত তাদেরকে পরিহার করা। তাদের কথা শুনে আর যাই হোক জনগণের কোনো উপকার হবেনা। মিডিয়াগুলোর উচিত নতুন করে মানুষ সৃষ্টি করা।

আমরা কেউ সমাজ বা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না। ক্ষমতা ও স্বার্থের মোহে এতোটাই পাগল থাকি যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে জোসের বশে বন্দুকের জোরে যা মন চায় তা করে বসি। ভবিষ্যতে কী হতে পারে বা পরিণাম কী হবে, দেশ বা জনগণের ভালো হবে না মন্দ হবে তা একবারও চিন্তা করি না। আমি যে কাজটি করছি বা করার চেষ্টা করেছি তা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কিনা। দেশ ও জনগণের স্বার্থের পূর্বে নিজের স্বার্থটা আমরা দেখি।

জনগণ কোনো সংকটে পড়লে সাধারণত আইনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। দেশের কোনো সংকট হলে বিচার বিভাগের আশ্রয় নেওয়া যায়। বিচার প্রার্থনা করা যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশে দেখা যায় পুলিশ বা আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হলো জনগণের বন্ধু, জনগণ বিপদে পড়লে পুলিশের আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের কাছে জনগণ নিরাপদ না থাকলেও আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে নিরাপদ। দেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে আইনের আশ্রয়ে তার সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তা না করে আমরা শুধু বাঁকা পথে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু বাংলাদেশে বাস্তবে দেখা যায় উল্টো; যারা আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাদের অধিকাংশই অসৎ, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আইনের বরখেলাপ করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে থাকেন। জনগণের ভোগান্তি বাড়ানো হয় আইনের অপব্যাখ্যা করে। দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে থানায় দালাল দিয়ে অথবা রাজনৈতিক দল দিয়ে মিথ্যা কেইস সাজানো হয়। চালানো হয়

www.pathagar.com

নির্যাতনের স্টিম রোলার। থানার কর্মকর্তারা নিজেদের মতো কেইস সাজায় , উৎকোচ গ্রহণে তারা সিদ্ধহস্ত। বাংলাদেশে যে কোনো কারণে নিরীহ জনগণকে হাতকড়া পরানো যায়। কিন্তু যারা আইনের লোক বা সরকারের কোনো উর্ধতন কর্মকর্তা তারা যতোবড় অপরাধ করুক বা অন্যায় করে আইন ভঙ্গ করুক তাদের হাতে হাতকড়া পরানোর কোনো ব্যবস্থা নেই বাংলাদেশে। সবার জন্য আইন সমান এটা যতো দিন দেশে নিশ্চিত না হবে ততোদিন আইনের বরখেলাপ দেশে চলতেই থাকবে। বাংলাদেশের আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে জনগণ কখনোই নিরাপদ নন। ১/১১ পূর্বে দেশে সমানে ধ্বংসের মহোৎসব চলছিলো; তখন কোনো শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সেনাবাহিনীর কোনো লোক হস্তক্ষেপ করেনি কেন? পিছনে কি কোনো রহস্য ছিল? ১/১১ এর পূর্বে যারা জাতীয় সম্পদ ধ্বংস ও প্রকাশ্যে সাধারণ জনগণকে পিঠিয়ে হত্যা করেছে, তাদের কাউকে হাত কড়া পরানো হয়নি কেন কিংবা তাদের কাউকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি কেন? বরং ঐ সময় ঢাকায় স্বচক্ষে দেখেছি পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা রাসেল স্কোয়ারে পিকেটারদের এক ধরনের বুদ্ধি আর রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কানে নীরবে ভিন্ন বুদ্ধি দিচ্ছেন। তাদের কাজ দেখে অবাক হলাম। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের এই সব দ্বিমুখী আচরণ কেন? তারা শুধু শুধু গাড়ি দিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে টহল দিয়েছেন, দেশের সম্পদ অপচয় করেছেন। না, দেশে এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য পূর্ব থেকেই কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ১/১১ এর সময় চক্রান্তকারীরা একটি মহলকে বুঝিয়েছিলো বাংলাদেশে এই অনিশ্চিত অবস্থা চলতে থাকলে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে কর্মরত ১০ হাজার সৈন্যকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। সৈন্যরা ফেরত আসলে দেশে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘের একজন উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে। আসলে তথ্যটি সত্য নয়। যদিও বা সৈন্যদের কোনো কারণে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়, অসুবিধা কোথায়? এই জনগণই তো নিজেরা ৪৫টাকা দরে চাউল খেয়ে সৈন্যদের তিন টাকা দরে চাউল কিনে ভরণ পোষণ চালিয়েছেন ইতিপূর্বে। সৈন্য পাঠিয়ে দেয়ার মিথ্যা অজুহাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অবৈধভাবে দখল করার প্রয়োজন ছিলই বা কী? জনগণের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আইএমএফ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো মোড়লের কথায় চলার জন্য নয়। স্বাধীন করা হয়েছিলো মানুষের ভালোভাবে থাকার জন্য, ভাগ্য উন্নয়নের জন্য, মুক্তভাবে চলাফেরা করার জন্য, স্বাধীনভাবে শ্বাস- প্রশ্বাস নেয়ার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পোলাও-কুরমা না খেয়ে অন্তত ডাল-ভাত খেয়ে সাধারণভাবে জীবন যাপন করার জন্য। স্বার্থান্বেষী মহলের রক্তচক্ষু দেখার জন্য নয়। অন্যের কৃপাদৃষ্টি বা আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বা মোড়লদের স্বার্থ রক্ষার জন্য

www.pathagar.com

নয়। ১৫ কোটি মানুষের অধিকার হরণ কখনো করা যাবে না। ইতিহাস এতোই নিষ্ঠুর যে যারা দুই নেত্রীর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন তাদের অনেকেই আজকে ক্ষমতার মসনদে। আর দুই নেত্রী জেলে। বিশ্ববেহায়া জেলের বাইরে; হায়রে বাংলাদেশ, হায়রে পরিণতি! ইতিহাস আমরা পাঠ করি কিন্তু কেউ শিক্ষা নেই না। লুঙ্গিপরা বাঙালির ইতিহাস ভালোভাবে পাঠ করুন এবং জেনে রাখুন। তাদের দুর্বল ভাবলে ভুল হবে।

ভাষা, কৃষ্টি, জনগণ, সংবিধান, স্বাধীনতা সবার ওপরে। তার ওপরে বাংলাদেশ। আমাদের অন্যের ধার করা সংবিধান থাকলেও সব সময় পাশ কাটিয়ে অবৈধ কাজগুলোকে বৈধভাবে চালানোর চেষ্টা করেছি। মুক্তিযুদ্ধের নানা যন্ত্রণা নিজে সচক্ষে দেখেছি। জীবনের বহু সময় ব্যয় করে বাংলাদেশের জন্য দেশে- বিদেশে পতাকা উড়িয়েছি, দেশের জন্য সুনাম অর্জন করেছি, জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়েছি। আমার জীবনের এই মহা মূল্যবান সময়কে কখনও ব্যর্থ হয়ে যেতে দিতে পারি না। আমি এদেশকে নিয়ে দূরে বসে অনেক স্বপ্ন দেখি, কিন্তু দেশে স্বপ্ন দেখানো লোকের বড় অভাব। বাংলাদেশের যাদেরকে বিশ্বাস করে আমরা নিজেদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম কাজ করার জন্য, নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে দেশকে ছোট করার মানসিকতা তাদের অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যা দেখে সব সময় অবাক হই। যার কারণে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের কথা বলে, প্রগতির কথা বলে দেশকে আমরা ধর্ষণ করেছি, নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখতে গিয়ে দেশকে আপন ভাবতে ও ভালোবাসতে শিখিনি। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যারা মূল্যবোধ নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলে থাকেন, লক্ষ করছি তাদের মধ্যে অবক্ষয় ও বিভ্রান্তি সবচেয়ে বেশি। সমাজে ঐক্যের পরিবর্তে চলেছে হিংসা- বিদ্বেষ- হিংস্রতা বেড়েই। একে অন্যকে ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠার পরিবর্তে মানুষ নিধনের বন্য প্রতিযোগিতা চলছে। অন্যায়ভাবে অবৈধভাবে অন্যের কাঁধে পা রেখে বড় হওয়ার প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যাচ্ছে সর্বত্র। সমাজে কোনো চেক এন্ড ব্যালান্স নেই। শিক্ষার পোষাকী রূপে দেহশোভনকারীরা তাদের জ্ঞানের দ্বারা সমাজের নিরীহ সাধারণ জনগণকে প্রতিনিয়ত শিক্ষার আড়ালে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণে যারা বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন নতুনদের কাছে ক্ষমতা দিয়ে তাদের এমনিতেই সরে যাওয়া উচিত ছিল; তা না করে তারাই কোনো না কোনোভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগির সাথে জড়িত ছিলেন বা আছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমরা সব সময় নিজের মতো করে লিখতে চাই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে বর্তমান সরকারও। দেশকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে অন্যদের মতো সস্তা কথা-বার্তা দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-

www.pathagar.com

বিপক্ষের কথা বলে সুযোগ সন্ধানীরা দেশের জনগণকে আবারও বিভক্ত করে দেশকে পিছিয়ে দিয়ে দেশের ক্ষতি করেছে। রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, যুব সমাজ ও নারীসম্প্রদায়কে কখনো গুরুত্ব দেয়নি অতীতের সরকারগুলো। দেশে বিদেশে সর্বত্র সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনে এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিপক্ক ও বৃদ্ধ রাজনীতিবিদরা এমনভাবে সব কিছুতে জেঁকে বসে আছেন, লাথি– উষ্ঠা না খাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সরি না। আমরা নতুনদের স্বাগত জানাই না, নতুনদের মধ্য থেকে লীডার তৈরি করিনা। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কি শুধু রাজনীতিবিদরাই দায়ী? এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনীতিবিদদের দায়ী করলে চলবে না। নাগরিক হিসেবে আমরা কেউ দায়িত্ব পালন করিনা। রাষ্ট্রে যে সব অপকর্ম চলছে আমরা সবাই কম বেশি দায়ী। ভুল-ত্রুটির পরেও রাজনীতিবিদদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে। তারা যে ভুল করেননি তা আমি বলব না। তবে যারা কাজ করেন তারাই কমবেশি ভুল করেন। এক সময় দেশ যখন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিলো তখনই দুই নেত্রী এদেশের হাল ধরেছিলেন। তাদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। তারপরেও দেশটিকে এগিয়ে নিয়েছেন। বোরকা পরিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের ললনাদের কিংবা পুরুষদের ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য লাইনে দাঁড় করাননি। তখনতো দেশে অনেকেই ছিলেন তারা কী করেছেন? সত্যি কথা বলতে কি দুই নেত্রীকে সামনে রেখেই সামরিক, বেসামরিক, আমলা, সুবিধাবাদী রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকসহ সবাই কমবেশি রাষ্ট্রের কোষাগারে হাত ঢুকিয়েছেন,অবৈধভাবে বড় হয়েছেন এবং অবাধে লুণ্ঠন করেছেন। দেশকে বড় না করে ওরা নিজেদের অন্যায়ভাবে বড় করেছেন। নিজে বড় হয়েছেন, অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থে বাচ্চাদের বিদেশে পাঠিয়ে বড় বড় ডিগ্রী নিয়েছেন এবং গাড়ি- বাড়ি করেছেন। নিয়েছেন প্রোমশন । দেশে যখন অন্যায় ও অবৈধ সম্পদের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে, ভালো কথা। আসুন শুধু চিহ্নিত কিছু রাজনীতিবিদ কেন আমার আপনার সবার একটা হিসাব হওয়া উচিত। যারা অন্যায়ভাবে নিজেদের বড় করেছেন স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত, তাদের হিসাব নেয়া বেশি দরকার। বড় বড় কথা বলে পার পাওয়া যাবে না। অথচ বড় বড় কথা বলে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাতে আমরা ওস্তাদ। আমরা ওস্তাদ সঠিক তথ্যের পরিবর্তে স্টান্টবাজিতে । এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভুল শুদ্ধের মধ্যদিয়ে এগিয়ে নিয়েছেন রাজনীতিবিদরাই, কোনো বন্দুকধারী বা সুবিধাবাদী তথাকথিত জনবিচ্ছিন্ন সুশীল সমাজ নয়– এমনকি বিদেশী ও তার এজেন্টরাও নয়।

বাংলাদেশে গত কয়েক বছরের সমস্ত কাজ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় এটা

www.pathagar.com

একটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। আমার ধারণা প্রথম দিকে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ কোনো কিছু না বুঝে খুশীতে গদগদ করলেও বর্তমানে দেশবাসী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন- মূলত বুভুক্ষু স্বার্থপর সুশীল সমাজ, বিদেশী ও দেশী চর, বিদেশী শক্তি দ্বারা দেশের মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী উচ্ছৃঙ্খল সেনা অফিসারের সমন্বয়ে বাংলাদেশে ঘটানো হয়েছে ১/১১। এই সব স্বার্থান্বেষীর কাছে সমাজ, দেশ, দেশের স্বার্থ, স্বাধীনতা, জনগণের অধিকার, মূল্যবোধ কখনো নিরাপদ নয়। জনগণের গুরুত্ব কম, গরীব খেটে খাওয়া জনগণের কথা তাদের কর্ণকুহরে কখনো পৌঁছে না। লোভী এই সব অবিমৃষ্যকারীদের কাছে দেশ ও জনগণের চাইতে নিজের এবং তাদের প্রভুদের স্বার্থ বড়।

যেখানে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণ নানা সমস্যায় জর্জরিত সেখানে প্রকৃত পক্ষে আসল সমস্যার দিকে কারো কোনো দৃষ্টি নেই, এমন কি রাজনীতিবিদদেরও। যে বিষয়গুলোর সাথে জনগণের বেঁচে থাকার কোনো সম্পর্ক নেই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবাই কমবেশি মাঠ গরম করেছি; মৃত মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করেছি এবং সময় নষ্ট করেছি। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর সরকারের নতুন চিন্তা–ভাবনা সম্পর্কে জনগণকে পরিচ্ছন্ন ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। জাতীয় সম্পদের অপচয় করে গরীব দেশে যখন একটি নির্বাচন হয়, সাধারণত জয়ী দল দেশ শাসন করে থাকে; আর বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে সংসদে ছায়া সরকার হিসেবে। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা থাকে নির্বাচনে হারলেই রাজনীতির পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে কিভাবে আটকানো বা বাধা দেয়া যায় তার আশ্রয় নেয়া। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিদের সংসদে যে সব বিষয় নিয়ে রাজনীতি করার কথা বা জনগণের সমস্যা নিয়ে কথা বলার কথা, সেটা না করে অধিকাংশ সময় অকাজে ও নেতা- নেত্রীর তোষামোদীতে ব্যস্ত থাকেন। জনপ্রতিনিধিদের যেখানে রাষ্ট্র চালনোর জন্য সংসদে যাবার কথা এবং জনগণের আশা আকাঙ্খার কথা তুলে ধরার কথা সেখানে তারা অশুভ রাজনীতির অজুহাত তুলে সংসদ বর্জন করেন। তারা ব্যস্ত থাকেন জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে হরতাল, হাতাহাতি , মারামারি, সংসদের ভিতর গালাগালি ও রাষ্ট্রের সম্পদ ধ্বংস নিয়ে। জনগণের স্বার্থ না দেখে নিজেদের স্বার্থের কারণে সংসদ সদস্য পদ রক্ষার জন্য বেতন ও সুযোগ- সুবিধা পাওয়ার জন্য সংসদে যান। স্বাধীনতার স্থপতি, স্বাধীনতার ঘোষক, বাঙালি না বাংলাদেশী, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের না বিপক্ষের, রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে যাবে আর কাকে আটকে রাখবে, এই প্রতিযোগিতায় জনপ্রতিনিধিরা ব্যস্ত। যেখানে যুব সমাজ চাকরি না পেয়ে দিশেহারা, জনগণের ভবিষ্যত অনিশ্চিত দেশে তাদের কথা ভাববার কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের

www.pathagar.com

আখের গুছিয়ে দেশের অভ্যন্তরে গন্ডগোল লাগিয়ে নিজেদের পরিবারকে নিরাপদে বিদেশে পাঠাতে। সবাই ব্যস্ত অবৈধ পথে অর্থ কামিয়ে অট্টালিকা গড়তে। অধিকাংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সকলকে নিয়ে বড় হওয়ার পরিবর্তে শুধু নিজে বড় হওয়ার মনোভাব। রাজনীতিবিদদের মধ্যে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণজনক কাজ লক্ষ্য করা যায়। জাতির মধ্যে জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা নেই। যে জাতির লেখাপড়া, বই পড়া বা পত্রিকা পড়ার প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যায় দেশে কিংবা বিদেশে, সবাই যার যার আখের গোছাতে ব্যস্ত, যুব সমাজ বেকার ও দিশেহারা সেখানে আমরা কীইবা আশা করতে পারি! দেশ, জনগণ গোল্লায় যাক, তাতে আমার কি। নিজেরা বড় হলেই ভালো। সৃষ্টির চাইতে ধ্বংসকে সহজে বেছে নেই আমরা ।

বাংলাদেশের জনগণের ভালোমন্দ যাদের তুলে ধরার কথা, তারাও নিজেদের স্বার্থের কারণে অন্যায়ের সাথে হাত মিলিয়ে চলছেন এবং নিজের স্বার্থে অন্যায়কে ন্যায় হিসাবে চালিয়ে দিচ্ছেন। সাংবাদিকতা পেশায় দেশে বলুন বা বিদেশে বলুন মেধাহীন, চরিত্রহীন ধান্ধালরাই জড়িয়ে পড়েছে। তারা নিজেদের পেশার কথা ভুলে গিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের ইন্ধন ও ইশারায় কাজ করে থাকেন। অনেক সময় পঁচা মালকে ভালো বলে চালিয়ে দেয়। পত্র-পত্রিকায় সঠিক তথ্যের পরিবর্তে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে যায়। যে কারণে পাঠক ও জনগণ অনেক সময় সঠিক তথ্য পায় না। জনগণ তাতে বিভ্রান্ত হয়। অনেকেই নিজেদের স্বার্থের কারণে পেশার স্বার্থকে বিক্রি করে দেন। দেশে বড় বড় মিডিয়া হাউজগুলো তৈরি হয়েছে অন্যায়ের মধ্য দিয়ে। কাজেই নিজেদের অন্যায়ে টান পড়বে জেনে, অন্যায়কারীদের কথা ভালোভাবে প্রচার করতে বা লিখতে পারে না। অনেক সময় সাংবাদিকরা অন্যায়ভাবে কলমের জোরে মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে প্রতিহিংসা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত পক্ষে আসল সাংবাদিকরা মানুষের কাছে সমাজের দর্পণ বলে পরিচিত এবং উপেক্ষিত- অসম্মানিত হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবীর কথাবার্তা, কাজ কর্ম দেখলে মনে হবে মাথায় সম্ভবত পচন ধরেছে। তারা রাজনৈতিকভাবে এতই বিভক্ত যে ঐসব বুদ্ধিজীবী সমাজের তথা দেশের কথা চিন্তা না করে রাজনৈতিক কর্মীর মতো বুদ্ধির সওদা করে বেড়ান। এরা এত বিভক্ত, স্বার্থপর ও দলাদলীতে বিশ্বাসী।

বর্তমান সরকারের কর্তাব্যক্তিরা জনগণকে নানাভাবে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন- চোর ধরেছি। এখন আপনাদের অবস্থার পরিবর্তন করবো। দেশের সম্পদ আর কেউ নিতে পারবে না। যদিও শোনা যায় তাদের কয়েকজনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে- চোর ধরতে গিয়ে, সাধারণ জনগণের অবস্থা আরো

www.pathagar.com

করুণ। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি স্তিমিত। সর্বক্ষেত্রেই স্থবিরতা, গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত এবং রাজনৈতিক অনিশ্চিয়তার কারণে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজতে বসেছে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিতে মানুষের নাভিশ্বাস। এক এক করে কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, লোক চাকরিচ্যুত হচ্ছে। বেড়েছে ঘুষ ও দুর্নীতি। বিদেশী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ শূন্যের কোঠায়। সরকার প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পকেটে হাত ঢুকানোর পথ খুঁজছে। আমরা প্রবাসীরা কমবেশি বার বার নিগৃহীত হয়েছি। দেশে সব সময় কিছু লোক কৃত্রিমভাবে নিজেদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। কখনো আমরা সমস্যার সমাধানে পৌঁছার চিন্তা করি না। দেশের মধ্যে কিছু এজেন্সী বা লোক রয়েছে যারা উভয় পক্ষকে জ্ঞান দান করে থাকেন। তারা নিজেদের কাজ রেখে, নানাভাবে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা সৃষ্টি করে চলছেন। একই ভাবে ১/১১ এবং অতীতের মতো বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষে এবং বিপক্ষের শক্তির কথা বলে দেশে নতুন করে কেওয়াস লাগিয়ে জাতিকে অন্যদিকে ব্যতিব্যস্ত রাখার মতলব আঁটছে। পরিকল্পিতভাবে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার মানসেই বিভিন্ন ইস্যু নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর উদ্ধারকারীরা নিরাপদে লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ পায় এবং গন্ডগোল লাগিয়ে আরো বেশিদিন ক্ষমতায় নিরাপদে টিকে থাকা যায়। বাংলাদেশে ১/১১ পূর্বে অথবা পরে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে মনে হয়েছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের টাকায় হৃষ্টপুষ্ট গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা হাসিল করছেন কাদের উদ্দেশ্য ? তারা কি সরকারকে সঠিক তথ্য সময় মতো দিয়েছেন? না ষড়যন্ত্রকারীকে? গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের প্রতি নজর রাখার জন্য অন্য একটি বিভাগ থাকা জরুরি বলে জনগণ মনে করেন। অতীতের কাজ দেখে মনে হয় তারা সব সময় সরকারের বিপক্ষের লোকদের রক্ষা ও সাহায্য করছে। দেশে ঘটে যাওয়া বড় বড় হত্যাকান্ড, বোমা হামলার কোনো উৎস সন্ধান, জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধে তাদের দায়িত্বহীনতাই লক্ষ করা যায়। নির্বাচিত সরকারকে যারা ল্যাং মারে তাদেরকে দেখা যায় ওদের সহায়তা করতে।

বিগত সরকারগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের ধোঁয়া তুলে মিথ্যা নাটক মঞ্চস্থ করে গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকটা ঢালাওভাবে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেউ কেউ চিন্তা করছেন জাতীয়তাবাদী আদর্শের দলকে ভেঙ্গে শেষ করে দিয়ে অন্যদলের হাত ধরে ক্ষমতায় সামরিকভাবে টিকে থাকবেন বা নিজেদের পছন্দ মতো লোকদের নিয়ে সরকার গঠন করবেন। এমনভাবে অপপ্রচার চালানো হয়েছে- রিলিফের টিন, বিস্কুট থেকে শুরু করে গম চুরি এবং পুকুর চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। বিগত সরকারগুলোর দুর্নাম রটাতে

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রকারীরা রাজনীতিবিদদের শূলে চড়িয়েছেন দেশকে সর্বক্ষেত্রে ক্ষত- বিক্ষত করার জন্য। স্বাধীনতার পরও একইভাবে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিলো। কৃত্রিমভাবে সাজানো এই সব অভিযোগ তুলে পরিকল্পিতভাবে রাজনীতিবিদদের সারা জীবনের অর্জনের উপর কালিমা লেপন করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কে চুরি করেনি? যদি ধানমন্ডি, গুলশান, নতুন ও পুরানো ডিওএইচএস, বারিধারা থেকে হিসাব নেয়া শুরু করা যায় তাহলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। অতীতের মতো বর্তমান সরকারের সাথে জড়িত অনেকেরই আত্মীয়- স্বজনরা সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজে ব্যতিব্যস্ত। কেউ কেইস দেয়ার ভয় দেখিয়ে, কেউ র‍্যাব এর গাড়ির ভয় দেখিয়ে, কেউবা বন্দুকের নল দেখিয়ে। বর্তমানে অর্থ কামানোর ধান্ধার পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিমাণও বেড়েছে। বর্তমান সরকারও পক্ষপাতিত্বের উর্ধে নয় বলে অনেকের ধারণা। বাজারে চাপা গুঞ্জন আছে যে অবৈধভাবে অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়ার পরও অনেকেই সরকারের সাথে দহরম মহরমের কারণে সব ধরনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন।

বাঙালিরা খুব সহজ সরল জাতি। এই সহজ সরল জাতির সরলতার সুযোগে অনেকেই ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করেছে। যারা নিমক খেয়েছে তারাই পরবর্তীকালে মালিকের সাথে মীরজাফরী করেছে। বর্তমানে তাদের সাথে কিছু নতুন সুযোগ সন্ধানী ফতোয়াবাজ ও সুবিধাবাদী তথাকথিত সুশীল সমাজ নামে একটি গ্রুপ যোগ দিয়েছে যাদের সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। দেশের স্বার্থে সবার আগে এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং জাতির সামনে প্রকাশ্যে এদের বিচার করতে হবে বলে অনেকের দাবি। কারা ছিলো, হালুয়ারুটির ভাগাভাগিতে? লুঙ্গি- গেঞ্জিপরা বাঙালিকে অর্বাচীন ও দুর্বল ভাববার কোনো কারণ নেই। এই লুঙ্গিপরা বাঙালির পুরো জীবনটাই সংগ্রামের। আন্দোলন- সংগ্রাম করে বীর বাঙালি তাদের অধিকার কড়ায়- গন্ডায় আদায় করে নিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস কমবেশি সবাই জানেন। এই জাতির সাথে সরলতার সুযোগে বার বার বেঈমানী করা হয়েছে। তারা জানে কিভাবে অধিকার আদায় করতে হয়। নিজের অধিকার আদায়ের জন্যে কি ভাবে রক্ত দিতে হয়? গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হয়? স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে হটাতে হয়? সুতরাং বিদেশীদের আশীর্বাদপুষ্টরা বাঙালিদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করুন। বিপদ আসলে বিদেশীরা পাশে দাঁড়াবে না। যদি দেশে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকতে চান তাহলে জাতির আমানতকে জনগণের কাছে হস্তান্তর করুন। বাঙালিরা রাস্তায় নেমে আসলে কেউ পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সকল বিদ্যালয়ে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের

www.pathagar.com

তীব্রতা বেড়েই চলছে। সুতরাং সম্মানে আঘাত আসার আগে জনগণের সম্পদ জনগণকে ফিরিয়ে দিয়ে মানে মানে কেটে পড়াই ভালো। বিদেশীরা সুযোগ বুঝে সবার সাথে থাকে। কেউ তাদের আপন নয়। তাদের কাছে ন্যায়- অন্যায় বলতে কিছু নেই। তাদের স্বার্থটাই আসল। তাদের এ, বি, সি প্ল্যান থাকে। তাদের স্বার্থের কারণে যদি কাউকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে হয় তারা তা করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

বাঙালির ভাগ্যাকাশে বর্তমানে অনেক কালো মেঘ। ক্ষণিকের মোহের পরিবর্তে সময় ও মানুষের মনের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই মেঘও একদিন কেটে যাবে হয়ত। এর জন্য জনগণকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। বাঙালির চেষ্টা ও রক্ত কখনো বৃথা যায়নি। আগামীতেও বৃথা যাবে না। বাংলাদেশে কিছু রাজনীতিবিদ আছেন, কখনও নির্বাচিত হতে পারেন না। দলে একাই নেতা, সমাজে বিশৃঙ্খলা করাই তাদের কাজ, ওদেরকে চিহ্নিত করতে হবে।

৩৭ বছর পর বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষের- বিপক্ষের শত্রু কারা – এইভাবে নিজেরা বিভক্ত না হয়ে বরং দেশের ভিতরে বিদেশী চর কারা, কোনো সংস্থাতে তাদের অবস্থান, কারা দেশের তথ্য পাচার করছে, প্রতিনিয়ত কাদের সাথে এদের ওঠাবসা ও আত্মীয়তা, তাদের মদের পার্টনার কারা, ঐসব পার্টিতে কারা কখন অংশগ্রহণ করে থাকে, কারা বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্য দ্রব সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে, কারা ঘনঘন এ্যাম্বাসীর ভিসা নিয়ে বিদেশ যাওয়া-আসা করে, কারা বিদেশী এ্যাম্বাসীগুলোতে ঘন ঘন দাওয়াত পায়, কোথায় তাদের অবস্থান– সবার আগে তাদেরকে চিহ্নিত করে নজরদারিতে আনতে হবে। তা না হলে অতীতের মতো বাঙালিকে আরো বেশি মূল্য দিতে হবে। বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি যেভাবে মোড় নিচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে নিরস্ত্র বাঙালি আর অস্ত্রে সুসজ্জিত বাঙালির মধ্যে একটি সংঘাত হবার সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে বললে হয়তো খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগামীতে আরো একটি জিনিস পরিষ্কার করতে হবে– বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাজনীতিবিদরা দেশ চালাবে নাকি সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চাভিলাষী-উচ্ছৃঙ্খল অফিসার দেশ চালাবে? নাকি বেসামরিক উচ্ছৃখল আমলা নাকি না বিদেশীদের প্রতিনিধি দেশ চালাবে? সৈনিকরা দেশকে রক্ষার পরিবর্তে জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করছে কি না, সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে কিনা তার একটা হিসাব নেয়ার সময় এসেছে। দশ বছর পর পর নানা অজুহাতে ক্যান্টেনমেন্ট থেকে কিছু ফেরেস্তার আবার অবির্ভাব হবে কি না- তা পরিষ্কার করতে হবে জাতির সামনে। একবিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক বিশ্বে সেনা শাসন কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। দেশ রক্ষার পরিবর্তে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভাগ বসাতে চাচ্ছে। তারা যে সুযোগ সুবিধা নেয় তাতে ভাগ বসানোর

www.pathagar.com

বাকি থাকলো কি। যদি কোন সৈনিকের রাজনীতি করতে হয় বা খায়েশ থাকে, তাহলে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে রাজনীতি করুন। তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায়ভাবে বন্দুক দিয়ে বা বন্দুকের জোরে সিভিলিয়ানদের আদলে দেশ শাসন করা যাবে না। সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ও গণতন্ত্রমনা কোনো মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। এমন কি আমি নিজে সৈনিক হয়েও নয়। ক্ষমতা লিপ্সুদের কাজে আমি নিজেও অনেক সময় লজ্জা পাই। জনগণের অর্থে পরিচালিত এক লাখ সেনা বাহিনীর কাছে জিম্মি থাকতে পারে না ১৫ কোটি বাঙালির স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ,অবাধ বিচরণ।

বিজয়ের সুফল বা আমানত বাংলার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হলে এবং বাংলায় আবার সুশাসনের সূর্য উদয় করতে হলে সবাইকে দলমত নির্বিশেষে কাজ করতে হবে, লোভ-লালসার পরিবর্ততে একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে অপশক্তির বিরুদ্ধে । গণতন্ত্রকে উদ্ধার করতে হবে। জনগণের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় যেকোন মূল্যে বিদেশী চরদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে, মানুষের অধিকার হরণকারীদের বিরুদ্ধে, বাক স্বাধীনতা লুন্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে, দেশকে অন্য দেশের করদরাজ্য যারা বানাতে চান,দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যারা বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, নিজের স্বার্থকে না দেখে দল- মত-ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সবাই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে। দেশ থাকলেই না আপনি রাজনীতি করবেন বা বড় কর্মকর্তা হবেন। দেশ যদি না থাকে তাহলে সকল অপশক্তিকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। যাতে করে মানুষ অবাধে চলাফেরা করতে পারে, অন্যায়ভাবে হাতকড়া লাগানো হবে না। কথা বলতে পারে, নিশ্বাস নিতে পারে, টাকা খরচ করতে পারে, মুক্তভাবে বাজার করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে, মুক্তভাবে কুরবানীর ঈদ করতে পারে, ছেলে মেয়েরা প্রেম করতে পারে, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে, মুক্তভাবে লিখতে পারবে। মানুষের মধ্যে যেখানে ভয়ভীতি থাকবে না। বিচার বিভাগ ইশারার পরির্বতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি থাকবে না, মানুষ ন্যায় বিচার পাবে, ক্রসফায়ারের ভয়ভীতি দেখানো হবে না। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হবে না, দেশের মানুষ মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে। জীবনকে পূর্বের ন্যায় মুক্তভাবে উপভোগ করবে।

অনেক দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের অভিমত-যারা স্বাধীন দেশকে নিজের স্বার্থে

www.pathagar.com

অন্যের দ্বারস্থ ও পরাধীন করতে চায়, যারা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সাময়িক বাধাগ্রস্ত করেছে, অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, যারা দেশের অগ্রগতি ও উন্নতিকে স্তিমিত করেছে, যারা জাতিকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করেছে, যারা সংবিধানকে অপমানিত করেছে, কৃত্রিমভাবে দেশে সংকট সৃষ্টি করে জনগণকে পিছিয়ে দিতে চায়, জনগণকে আবারও ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলে রেখেছে, অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদ ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছেন তাদের বিচার দেশের সাজানো কোর্টে না করে জনগণের কোর্টে প্রকাশ্যে করতে হবে। এবং এমন নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে বিচার করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কেউ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতা হাইজ্যাক করার সাহস না করে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেশ নেই। বর্তমান সরকার তাদের প্রভূদের খুশি করার জন্য ওদের প্রেসপ্রিপশন বাস্তবায়ন করে চলেছে। দেশের চাইতে তাদের কাছে বড় তাদের ক্ষমতায় বসানোর নেপথ্য কারিগর পরাশক্তির অধীশ্বরগণ। তাদেরকে চিহ্নিত করে পুরোপুরি দেশ থেকে নির্বাসিত করে প্রভূদের দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য এদেশে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে উন্মোচন করতে হবে মতলববাজদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনগণের সামনে প্রকাশ্যে। যাতে বাঙালিরা বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসগুলো আরো বেশি ঘটা করে পালন করতে পারে। দেশ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি দূর করে সবার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ । দলে দলে, ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে বিরোধ দূর করে দেশকে নতুনভাবে গড়তে হবে।

ক্ষমতালিপ্সুরা জনগণের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসেই নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করে জনগণের বারোটা বাজাতে থাকেন। ক্ষমতায় যারা যখনই থাকেন, বা ছিলেন বা আছেন তাদের এবং তাদের আত্মীয়- স্বজনের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে বারবার, ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না একমাত্র হতভাগ্য দেশবাসীর।

অনেকেই আছেন পিছনের শক্তির উৎসে ক্ষমতায় এসে অনেক চটকদার কথা বলেন। খুব সহজে পিছনের কথা ভুলে যান। সভা সমিতির বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কবি নজরুল ইসলামের কবিতার চয়ন ব্যবহার করে নিজেকে শিক্ষিত বা রুচিবান হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন। কিন্তু মনে রাখবেন বাঙালিরা বোকা নয়- ভেলকিবাজি সবাই বুঝে। কবিতার চয়ন বক্তব্যে ব্যবহার করলেই জনগণের মন ভরে না। জনগণের মন ভরে সস্তায় মোটা চাউলের ভাত পেট ভরে খেতে পারলে, নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারলে, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলে।

www.pathagar.com

আলিসান বাংলোতে বিশেষ বাহিনী বেষ্টিত ঘরে থেকে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষের মনের দুঃখের কথা, কষ্টের কথা বুঝা যায় না। শুধু মধুর মধুর কথা বলে জনগণকে ঠকানো যায়। দেশ চালাতে হলে, কাছ থেকে জনগণকে বুঝতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের মতো গুলশানে বসবাস করে কৃষকের উন্নয়নের কথা ভাবলে চলবে না, তাদেরকে বুঝতে হলে তাদের মনের কথা বুঝতে হবে, জানতে হবে অভাবের কথা। মনের গভীরে ঢুকতে হবে। তাদের কাতারে বসবাস করতে হবে। দেশের বর্তমান ত্রাণকর্তারা নিজেদেরকে যতোই স্মার্ট, আর নিজেদের জনপ্রিয় মনে করেন না কেন, নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং না করে একবার ভোটে এসে অংশগ্রহণ করুন এবং নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে নিজের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা নিন। জরুরী আইন দিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়, একবার জরুরী আইন তুলে দেখুন জনগণ কি করে। অন্যের আশ্রিত হিসেবে কাজ করে পর শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া যায় না। তাই ধরাকে সরাজ্ঞান করবেন না। বাঙালি কখনো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেনি। কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি হওয়া যতোটা সহজ, দেশ চালানো ততো সহজ নয়, অন্ততঃপক্ষে বাংলাদেশে। ১৫ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। চারিদিকে হাজারো সমস্যা, সেই সাথে রয়েছে দেশী বিদেশী চক্রান্ত, হিংসা-বিদ্বেষ রাজনৈতিক অস্থিরতা। শত সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশকে সামলানো এতো সহজ নয়। বড় বড় কথা বলা যায়, বাস্তবতা হলো ভিন্ন। নিজের যথেষ্ট দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি একদিন সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীকে দেশবাসী ধন্যবাদ জানাবে। বাংলাদেশের মতো একটি সমস্যা সংকুল দেশ চালানোর জন্য যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোনো রাষ্ট্রনায়ককেও দায়িত্ব দেয়া হয় তিনি বুঝবেন কতো ধানে কতো চাল। বড় বড় কথা বলা যতো সহজ, কাজ করা তত সহজ নয়। দূরে বসে শুধু সমালোচনাই করা যায়। বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু অতি ভয়ঙ্কর। তার মধ্যেই দুই নেত্রী বন্দুক ছাড়া নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে মহিলা হয়ে এবং একজনের ওপর অপর জনের বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিকভাবে দেশটি চালিয়েছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য জনগণের সহনীয় ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকায় মানুষকে কমবেশি খুশি রেখেছিলেন। এর জন্য একদিন বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবেন বলে বিশ্বাস। দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে তারা আজ পরিণত বয়সে অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। খালেদা- হাসিনা মীরজাফর, সুবিধাবাদী সুশীল সমাজ ও বেঈমানদের চিনতে ভুল করেছেন। কিন্তু জনগণ কখনও এদেরকে চিনতে ভুল করেনি। বেগম জিয়া আপনি যাদের আপন মনে করে কাছে ডেকেছেন, যাদেরকে নানান সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, বিদেশ থেকে এনে চাকরি দিয়েছেন, যাদেরকে বিশ্বাস করেছেন তারা আজ কোথায়? যাদের দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলেন তারাই আজ আপনাকে

www.pathagar.com

ছোবল মেরেছে। তারা জাতীয়তাবাদী আদর্শের চিহ্ন মুছে ফেলতে চাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ হবে বলে মনে হয়না।তাদের বিষাক্ত ছোবল ও ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ ক্ষত-বিক্ষত। রাষ্ট্রপরিচালনায় দুই নেত্রী ভুল করে থাকলে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর হিসেবে জনগণই তাদের মাফ করে দিবেন। তাতে আপনাদের আসে যায় কি? ক্ষমতাসীন ও তাদের দোসররাই দেশে- বিদেশে বসে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে দু'নেত্রীসহ রাজনীতিবিদদের জেলে পাঠিয়েছে। রোডম্যাপ তৈরি করেছে, এই রোডম্যাপ কোনো দেশে বসে কখন তৈরি করলেন তারা? এটা কি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র, না দেশের গুটিকতক সুবিধাবাদী ছাড়া এদেশের জনগণ তো কাউকে অভিযুক্ত করে উদ্ধারকারীদের কাছে বিচার চায়নি । যারা চুরি করেছেন বলে অভিযুক্ত ঐসব নেতারা আমাদেরই আপনজন। আপনাদের ও বিদেশীদের আপনজন নাও হতে পারে। বিনা বিচারে অনেক রাজনৈতিক নেতা আজ সেনাসমর্থিত ফখরুদ্দীন সরকারের পৈশাচিক ও অমানুষিক নির্যাতনের শিকার। পর্দার আড়াল থেকে যারাই দেশকে নিয়ে খেলাধুলা করুন না কেন ক্ষমতাসীন পুতুল ফখরুদ্দীন সরকারকেই তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। তবে দেশ ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হবে ফাইজলামী না করে যতো তাড়াতাড়ি নির্বাচনের আয়োজন করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তারপর জনগণই সিদ্ধান্ত নিবে দেশ কিভাবে চলবে? জনগণকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেদের লোক কে? আবার অতীতের মতো ভুল করলে বা হুজুগে চললে, চলবে না- এবারের লড়াই হোক চিরতরে অপশক্তি নিধনের লড়াই। লড়াই করে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে রাজনীতিবিদদের ভুলের কারণে আর ভবিষ্যতে জনগণকে মাশুল দিতে না হয়। ■

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Sayeed-ur-Rabb an acclaimed Journalist, writer & athlete. His most recent book is 'Thikana Album'. newspaper columnist. Rabb writes about national and international Affairs, Media, Sports & social issues, and has covered many different events. In 1984 served as a Pilot Officer in Bangladesh Airforce. Is a member of National Press Club WDC, executive member international Sub-committee. In 2008 elected as the President of America Bangladesh Press Club, Newyork, Secretary General Bangladesh Media Council of America. Sayeed-ur-Rabb is an ex-executive member of Fobana, President of Bangladesh League of America Newyork, President America Bangladesh chamber of Commerce in North America, Chief Co-ordinator of 2000 Fobana Convention held in Madison Square Garden Newyork. Chief Co-ordinator Bangladesh literary & culture convention in Newyork. 1998. Currently working as a president/C.O.O Thikana Newspaper (The widely circulated newspaper in North America) President of ANA. Studied Public Administration, Physical Education in Dhaka University. Bangladesh and Fitness Management at Newyork University.

Rabb glorious carrier was not only limited as a Scholar Student. But he become a renowed athlete of the university. For his outstanding contribution to Bangladesh National Sports, Dhaka University awarded him with its highest Sports Award "Dhaka University Blue". Was also awarded by different organizations for his outstanding contributions to literature, Sports, Journalism and Community services. In course of time become one of the well known journalist and one of the best athlete in the country for which he got a large number of national & international medals.

Rabb takes interest in photography, interviewing Famous Personalities, Collecting Autographs Visiting Historical Places and traveling around the world.

Rabb lives in Newyork City with his beloved wife Jolly, two daughters Sufana, Sarah & son Sami.

Jacket Illustration & Design by
Mazherul Alam Kislu
Fernando Aceves
(legendary Maxican Photographer)
Printed in Bangladesh

www.pathagar.com

Praise for

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'ঠিকানা' প্রকাশনা সংস্থার প্রেসিডেন্ট এবং সাংবাদিক সাঈদ-উর-রব তার একটি প্রবন্ধ সংকলন বের করতে যাচ্ছেন। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থ সামাজিক চলমান ঘটনা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে লেখা এবং ঠিকানায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সুবাদে বেশ কয়েকটি লেখাই আমার পাঠ করার সুযোগ হয়েছে। তার লেখা মুন্সিয়ানার গুনেই আমার ভাল লেগেছে।

সাঈদ-উর-রবের সব বক্তব্যের সঙ্গে সকলে সহমত প্রকাশ করবেন এমন কথা বলিনা। কিন্তু তার বক্তব্য উথাপনের যুক্তি, তথ্য এবং স্পষ্ট কথা বলার সাহস সকলকেই মুগ্ধ করবে। তার নিবন্ধ '১/১১ আশীর্বাদ না অভিশাপ' একটি অত্যন্ত যুক্তি ও তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যেভাবে ওয়ান ইলেভেনের আসল উদ্দেশ্য এবং ফখরুদ্দীন সরকারের আসল চরিত্র তুলে ধরেছেন, তা লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। তিনি ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হননি। লেখায় নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষকের মনোভাব দেখিয়েছেন।

'সংবিধান নয়, এখন অনিয়মই নিয়ম' শীর্ষক নিবন্ধে সাঈদ-উর-রব যদিও কতিপয় স্বার্থপর রাজনীতিবিদের কারণেই আজ বাংলাদেশ ক্ষতবিক্ষত বলে মন্তব্য করেছেন, বড় রাজনৈতিক দলের তীব্র সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কথাও নির্দ্বিধায় লিখেছেন যে, "আজ পর্যন্ত... সামরিক-বেসামরিক আমলা, ভদ্রবেশী সুশীল, অবৈধভাবে আয় উপার্জনকারী ব্যবসায়ী ধরা পড়েননি বা দুর্নীতির জন্য গ্রেফতার হননি। দুর্নীতির জন্য কোন সরকারই সামরিক আমলাকে হাতকড়া লাগাতে পারেনি।" ওয়ান-ইলেভেন-পরবর্তী তথাকথিত দুর্নীতিদমন অভিযান সত্ত্বেও কথাগুলো সত্য। ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সমস্যা, ইরাক ধ্বংসের দায়িত্ব কে নেবে, ইত্যাদি নিবন্ধেও সাঈদ-উর-রবের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ধারণা, তার বইটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

আবদুল গাফফার চৌধুরী
নিউইয়র্ক, ৩ মে ২০০৮।

লেখক সাঈদ-উর-রব শুধু বাংলাদেশের বিভিন্ন সংকট, সমস্যা, সমাধান ও জাতীয় অস্তিত্ব দৃঢ়ীকরণেই ভূমিকা রাখেননি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর সাবলীল বিচরণ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের আবহমান রাজনৈতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রকৃত প্রত্যয়, সংগ্রামী মানুষের জীবনবোধ ও সম্যক চেতনার উপলব্ধি তাঁর ভাবনায়- লেখা লেখিতে চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। অধিকাংশ রচনা অতীত ও সমসাময়িক বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে বিরচিত হলেও লেখক শুধু দেশ ও কালের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। সভ্যতার সু-উচ্চ লীলাভূমি আমেরিকা থেকে শুরু করে বর্তমানের উত্তাল পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখার মধ্যে। লেখকের প্রগাঢ় দেশপ্রেম, সমাজ সচেতনতা, বিশ্বের অসহায় মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ও দায়িত্ববোধই এই দুরূহ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকাল, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা জনজীবনের অসহনীয় দুর্ভোগ ও জীবন যন্ত্রণা তার বর্ণনায় বাংময় হয়ে উঠেছে।

মোজাম্মেল হেসেন মিঠু
কথা সাহিত্যিক, বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত ২০০৪।

সাঈদ-উর-রবের চিন্তা-চেতনায় সর্বদাই সজীব আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। বাংলাদেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের পাশাপাশি সমকালীন বিশ্বের নানাবিধ বৈষম্য ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনিয়মের কারণে সৃষ্ট সঙ্কটের বাস্তব এক চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে।

নাজমুল আহসান
সম্পাদক
সাপ্তাহিক পরিচয়, নিউইয়র্ক।

স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাঈদ-উর-রব তাঁর লেখনীতে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে অবস্থানরত বাঙালির মৌলিক ও বাস্তব সমস্যারাজী উপলব্ধি করে সত্য ও পক্ষপাতহীনভাবে সাহসীকতার সাথে তুলে ধরেছেন।

জুনায়েত আখতার
কবি, কলামিস্ট।